দেবোপম, পূতচরিত্র, পূজ্যপাদ, জ্যেষ্ঠতাত

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম উকীল

শ্রীযুক্ত হরিমোহন চক্রবর্ত্তী বি, এল

মহোদয়ের শ্রীপাদপদ্মে,

গ্রন্থকারের বহু যত্ন ও বহু পরিশ্রমের ফল

এই ক্ষুদ্র

রায়-পরিবার

গ্রন্থ

ভক্তি ও শ্রদ্ধার চিহ্ন স্বরূপ

অর্পিত হইল।

রায়-পরিবার

গার্হস্থ্য উপন্যাস।

'ললনা-সুহৃদ্' 'দম্পতী-সুহৃদ্' ইত্যাদি প্রণেতা

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তি-প্রণীত।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[illegible] নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোবিযা প্রেসে,

শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বাবা মুদ্রিত।

১৩০২।

রায়-পরিবার

গার্হস্থ্য উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তিনটী বৌ।

পবিত্র-সলিল ব্রহ্মপুত্র নদের একটী ক্ষুদ্রতর শাখার উপর গঙ্গাতীর একখানা ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে কালীকান্ত রায় নামক একজন মধ্যবিত্ত-অবস্থা-সম্পন্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাস। বৈশাখ মাস—বড় গরম পড়িয়াছে। এক দিন অপরাহ্নে, রায় মহাশয়ের অন্দর বাটীর একখানা ইষ্টকালয়ের ছাদের উপর বসিয়া পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া একটী রমণী কাঁথা শেলাই করিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আর একটী যুবতী তাহার নিকট গিয়া একটু ব্যস্ততা সহকারে, উচ্চৈঃস্বরে বলিল,

'দেখ বড়দিদি! এমন ক'রে ক'দিন পারা যায়? আজ রাঁধবে কে?'

'এখনো বেলা আছে, ভাবনা কি? তবে আজ কর্ত্তা-ঠাকুর বাড়ী আস্‌তে পারেন, একটু শিগ্‌গীর হ'লেই ভাল।' এই কথা বলিয়া রমণী হাতের ছুঁচ কাঁথাতে গাঁথিয়া রাখিয়া অপরার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল। বলিল,

'দেখ মেজ-বৌ, এক কাজ কত্তে পার? নইলে এর উপায় নাই।

মেজ-বৌ ব্যস্ততা সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি কাজ বড়দিদি?'

বড়-বৌ মেজ-বৌর অতি নিকটস্থ হইয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল,

'দেখ মেজ-বৌ! সংসারের প্রায় সকল কাজই আমরা করি, কিন্তু তবু আমাদের নাম নাই—পোড়া কপালের এম্নি গুণ, সুখ্যাতের বেলা ছোট-বৌর।'

মেজ-বৌ। ঐ দুঃখেই ত বলি। নইলে, আমরা ত বুড়ো হই নাই, কাজ কর্ম্ম যে জানি না, তাও নয়। যদি যশ থাকৃত, তবে এমন তিন্‌টে সংসারের কাজ একা করে দিতে পাত্তুম।

মেজ-বৌর বাক্যে বড-বৌ মনে মনে আনন্দিতা হইয়া বলিল,

'দেখ মেজ-বৌ। এর একটা কিছু ফিকির কত্তে হবে—যে করেই হউক, ছোট-বৌকে জব্দ করা চাই, নইলে আমাদের মান থাকে না। তোমাতে আমাতে যদি এক হয়ে কাজ করি তবে আর ক'দিন লাগে?

মেজ-বৌ। আমারও দিদি, তাই ইচ্ছে। আর দেখেছ দিদি। ক'দিন ধরে কি দেমাকটাই প্রকাশ কচ্ছে? ওর সোয়ামী কালেজে পড়ে, ইংরিজি জানে, কল্‌কেতায় থাকে, তাই বলে যেন মাটীতে পা দিতে চায় না—

মেজ-বৌর কথা শেষ না হইতেই বড-বৌ বলিল,

'আর, ওর কাপড় পরিষ্কার হওয়া চাই, বিছানা একটু ময়লা হ'লে চলে না, হপ্তা হপ্তা চিঠী আস্‌ছে, যেন কি একটা ভারি কাণ্ড।'

মেজ-বৌ। কিন্তু দিদি! কি করে জব্দ করবে? শ্বশুর, শাশুড়ী সকলেই যে ছোট-বৌর দিকে টেনে কথা কয়!

বড়-বৌ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, হাত নাড়িয়া ব্যস্ততা সহকারে বলিল, 'তা হউক না—আমার কথা শোন। ছোট-বৌ রেঁধে আস্‌বে, আর আমরা তার রাঁধা ভাত ব্যান্নুনে নুন মিশাইয়া দিব—তবেই তার রান্নার ব্যাখ্যানা বেরুবে। ভাতের হাঁড়িতে বালি ঢালিয়া দিব——'

মেজ-বৌ। আর তার আস্ত কাপড় রোদে শুকাইতে দিলে টানিয়া ছিঁড়িয়া দিব।

বড়-বৌ। আরও কত কল কৌশল আছে। যে যেমন তার সঙ্গে তেম্‌নি ব্যাভার না কল্লে কি হ'য়ে থাকে? কেমন পারবে ত!

মেজ-বৌ। কেন পারবো না?—কিন্তু দিদি! তোমায় সব বলে দিতে হবে, নইলে আমার বুদ্ধিতে কুলাবে না।

তার পর একটু হাসিয়া বলিল,

'সত্যি, বড় দিদি! আমার কিন্তু এত কৌশল মনে হয় নাই!'

বড়-বৌ। তার জন্যে ভাবনা কত্তে হবে না, যদি আমার কথামত কাজ কর, তবে আর চিন্তা নাই। কিন্তু মেজ-বৌ! এক কথা—এ সব কথা যেন কখনও প্রকাশ হয় না—সাবধান! তা হলে কিন্তু সর্ব্বনাশ হবে।

তার পর, সিঁড়ির দিকে পদধ্বনি শুনিয়া একটু চমকিত হইয়া ফুসফুস করিয়া বলিল, 'চুপ কর—ঐ আসছেন বুঝি!' কথা শেষ করিয়া বড-বৌ একটু দূরে গিয়া, অন্যদিকে চাহিয়া, চুল খুলিয়া আবার চুল বাঁধিতে লাগিল। মেজ-বৌ তদবস্থায় সিঁড়ির দিকে

চাহিয়া রহিল। মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনাবৃতা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া একটী সুন্দরী রমণী দুই বৎসরের একটা বালক কোলে করিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে ছাদের উপর আসিয়া বলিল,

'এই যে বড়-দিদি, এখানে। ননীগোপাল 'মা মা' ক'রে কাঁদ্‌ছিল। আমি সমস্ত বাড়ী খুঁজে তারপর ননীকে নিয়ে এখানে এলুম।' এই কথা বলিয়া সুন্দরী সস্নেহে দুই তিন বার ননীর গণ্ডদেশে মধুর চুম্বন করিল।

বড় বৌ চুলবাঁধা শেষ করিয়া ছোট-বৌর দিকে ফিরিয়া বলিল,

'বেশ করেছ বোন, আমি কাঁথা শেলাই বন্ধ করে, সবে উঠ্‌ছি, এখনি নীচে যেতুম। তা' খোকাকে এনেছ, বেশ করেছ।'

কথা সমাপ্ত করিয়া বড়-বৌ ননীকে আপন কোলে টানিয়া লইয়া স্তন্য পান করাইতে লাগিল। মেজ-বৌ চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ কোন কথা বলিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে ছোট-বৌ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিষণ্ণ বদনে বলিল,

'আমি এসেছি ব'লে তোমাদের কথা বন্ধ হ'ল কেন, বড় দিদি?—আমি চলে যাব?'

বড়-বৌ মুখ ভার করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিল,

'না, চলে যাবার দরকার কি? এ কি আর আমাদের কেনা ছাত্‌।' ছোট বৌ এই কথায় আরও দুঃখ পাইল। বলিল,

'বড়দিদি। আমি যদি কোন দোষ ক'রে থাকি, বল। তোমরা ত আমার পর নও। আমি সবে নূতন এসেছি। এখনও সংসারের কাজকর্ম্ম ভাল জানি না—তোমরা শিখিয়ে দিলে শিখ্‌তে পারি।—আমি কি তোমাদের একজন নই?'

ছোট-বৌর কাতরোক্তিতে কাহারও মন ভিজিল না। বড়-বৌ

স্বাভাবিক কর্কশ স্বরে বলিল, 'তা তুমি আমাদের একজন হ'তে যাবে কেন বোন্। তোমার সোয়ামী কালেজে পড়ে, তুমি লেখা পড়া জান, চিঠী পত্র লিখ্‌তে পার, পশমের কাজ কত্তে পার—'

মেজ-বৌ এই সুযোগ পরিত্যাগ না করিয়া বলিল, 'আমরা তোমায় কি শেখাতে পারি—বরং তোমার কাছে শিখ্‌তে পারি। আমরা কি এক অক্ষর লিখ্‌তে পারি, না তোমার মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক্‌তে পারি?'

ছোট-বৌ দুঃখিতা হইয়া বলিল, 'ঠাট্টা কর কেন, মেজ-দিদি!'

মেজ-বৌ বড-বৌকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'শুন্‌লে বডদিদি! এ ঠাট্টা হ'ল। তা তোমার সঙ্গে আমাদের মুক্ক্ মানুষের কথা কওয়াই ভার। আমরা ত ভাই শাস্তর টাস্তর পড়ি নাই।'

বড-বৌ মেজ-বৌর কথায় সায় দিয়া বলিল,

'এ আর ঠাট্টা কি?—আচ্ছা ছোট-বৌ! যদি রাগ না কর, তবে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—'

ছোট-বৌ। রাগ ক'র্‌ব কেন দিদি! আমার ভালর জন্যে বল্‌বে, তাতে আমি রাগ ক'র্‌ব কেন?

বড়-বৌ। বলি, মেয়েমানুষের অত লেখা পড়া করে লাভ কি? মেয়ে মানুষ ত আর খাতা লিখ্‌তে বসবে না, আপিসেও বেরুবে না।

মেজ-বৌ। ইস্কুল ক'রে ছেলেও পড়াবে না?

ছোট-বৌ দোষারোপ পরিত্যাগ করিয়া সরলভাবে বলিল,

'তা, লাভ লোকসান তত বুঝিতে পারি না, আমায় বলে, তাই অবসর পেলে দু এক পাতা পড়ি।—এতে ত কিছু ক্ষেতি দেখ্‌তে পাই না, দিদি?'

বড়-বৌ। ক্ষতি নাই কেন, বুঝ্‌লেই ক্ষতি। যে সময়টা বই নিয়ে থাক, সে সময়ে সংসারের কাজ কর্ম্ম দেখ্‌লে কি লাভ হয় না?

ছোট-বৌ। কাজের সময় ত আমি বই ছুঁই না। দুপুর বেলা কিম্বা রাত্রে যখন সকলে ঘুমিয়ে থাকে, তখন ইচ্ছা হয় দু পাতা পড়ি, না হয় ঘুমিয়ে থাকি। এতে কাজের কি বাধা হয়, দিদি?

বড়-বৌ একটু বিরক্তি সহকারে বলিল,

'তোমার কথায় আঁটা দায়। না বুঝ্‌লে কি ক'রে বুঝাব বোন্। এই দেখ দেখি, রাত্তিরে যে, আলো জ্বেলে বই পড়, এতে যে তেল খরচ হয়, সেটা কি লোকসান হয় না? তেল ত পয়সা দিয়ে আনতে হয়? ঘর করে খেতে গেলে, সব দিক্ দেখ্‌তে হয়। এমন করে সামিগ্‌গীরি লোকসান করলে কি সে ঘরে লক্ষ্মী থাকে?'

ছোট-বৌ। না হয় এখন থেকে আর তেল পুড়িয়ে বই পড়ব না। তোমরা আমায় যা বল্‌বে, আমি তাই ক'র্‌ব—আমি কি তোমাদের ছাড়া?' কিন্তু দিদি! তোমাদের পায়ে পড়ি—অমনতর করে তোমরা আমার উপর মুখ ভার করে থেক না, এতে আমার বড় দুঃখ হয়।

অতঃপর মেজ বৌ কি বলিতেছিল, এমন সময় নীচের আঙ্গিনা হইতে শব্দ হইল,

'বৌ! ছোট-বৌ! তোমরা সব কোথা গেলে?'

ছোট-বৌ 'মা ডাক্‌ছেন' বলিয়া দ্রুত পদে নীচে নামিল। বড় বৌ অবসর বুঝিয়া মেজ-বোর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল,

'দেখ্‌লে বোন। কেমন একচখো শাশুড়ী। এদিকে বলা হচ্ছে 'তোমরা সব কোথা গেলে' কিন্তু নামটী করবার বেলা ছোট-বৌর। যেন আমরা এ সংসারের কেউ না।'

অনেক ক্ষণ দুই জনে কি পরামর্শ চলিতে লাগিল। সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল—দুই জনে এক সঙ্গে নীচে নামিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কালীকান্ত রায়ের পারিবারিক অবস্থা।

রায় মহাশয়ের বয়স কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর। তিনি প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ এক জন খ্যাতনামা মহাজনের অধীনে মাসিক দশ টাকা বেতনে কাজ করিতেছেন। মহাজনের নাম উদ্ধবচন্দ্র পাল। গঙ্গাতীর গ্রামের দেড় ক্রোশ উত্তরে গণেশপুর বন্দর। এই বন্দরে উক্ত মহাজনের প্রধান গদি স্থাপিত। এখানে চারি পাঁচ জন মুহুরী আছে। রায় মহাশয় এই গদির সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী। এই গদিতে টাকা ধার দেওয়া, হুণ্ডী ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের কাজ হয়। রায় মহাশয় অতি সুপ্রকৃতিক ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি—মহাজনের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার সর্ব্বদা দৃষ্টি। মহাজন এজন্য তাঁহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেন ও ভালবাসেন। মহাজন নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ঋণগ্রহিতাকে কিছু কিছু 'দস্তরী' প্রদান করিতে হইবে—ইহা রায় মহাশয়ের প্রাপ্য ছিল। এ কারণে, বেতন কম হইলেও রায় মহাশয়ের প্রতি মাসে গড়ে পঞ্চাশ টাকার কম উপার্জ্জন হইত না। এতদুপরি, মহাজন তাঁহার

সততায় এত প্রীত ছিলেন যে, দোল, দুর্গোৎসব, বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি রায় মহাশয়ের বাড়ীর প্রত্যেক কার্য্যেই তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া যথোচিত সাহায্য প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিতেন। এ কারণে তাঁহার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া প্রতিমাসেই কিছু কিছু অর্থ সঞ্চিত হইত। রায় মহাশয় এই উদ্বৃত্ত টাকাগুলি সুদে খাটাইতেন। পঁচিশ বৎসরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সুদসহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উহা এখন বিশ সহস্র টাকায় পরিণত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সামান্য পৈত্রিক ভূসম্পত্তিও ছিল।

রায় মহাশয়ের পরিবারে এখন বালক বালিকা সহ ষোল সতর জন লোক—স্বয়ং কর্ত্তা, গিন্নি ঠাকুরাণী, তিন পুত্র, তিন পুত্রবধূ, দুই পৌত্র, তিনটী পৌত্রী, ভৃত্য ভজহরি, পরিচারিকা মঙ্গলা এবং কখন কখন আরও দুই এক জন অতিরিক্ত লোক থাকে। জ্যেষ্ঠপুত্র রামকমলের বয়স ত্রিশ অতিক্রম করিয়াছে; মধ্যম কৃষ্ণকমল তাহার তিন বৎসরের কনিষ্ঠ, কনিষ্ঠ স্বর্ণকমলের বয়স একুশ বৎসর। কালীকান্ত রায়ের শরীরের বর্ণ শ্যাম, মুখশ্রী ও গঠন সুন্দর, তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা কৃপাময়ী সময়ে সুন্দরী ছিলেন। রামকমল ও কৃষ্ণকমল পিতার বর্ণ ও অঙ্গ গঠন, আর স্বর্ণকমল পিতার গঠন ও জননীর গৌরকান্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। বড়-বৌ পঞ্চবিংশতি বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন, তিনটী সন্তানের মা হইয়াছেন, কিন্তু তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব বেশ আছে—দেখিলে উনিশ কুড়ি বৎসরের যুবতী বলিয়া ভ্রম হয়; শরীরের রং খুব পরিষ্কার না হইলেও কাল নহে, নাম তাহার মহামায়া। মেজ-বৌ মুক্তকেশী উনিশ বৎসরের যুবতী, দুটী বালিকার মা, শ্যামবর্ণা হইলেও কুরূপা নহেন। তাঁহার সুন্দর

মুখ, উজ্জ্বল চক্ষু, সুগঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তপদ, নিতম্ব চুম্বিত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি দেখিলে কেহই তাঁহাকে সুন্দরী না বলিয়া পারে না। ছোট-বৌ সুকুমারী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা। তাহার সুকুমার দেহ-তটিনীতে জোয়ার লাগিয়াছে, এখনও ভরে নাই, ভর ভর হইয়াছে। সুকুমারী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুগঠিতা, সুকেশা ও সুনয়না; তাহার উজ্জ্বল, দীপ্তিপূর্ণ, সুন্দর ও সরলতাব্যঞ্জক মুখশ্রী, স্নিগ্ধ, জ্যোতিপূর্ণ আয়তলোচন, নাতিদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশরাশি, সুগঠিন ও সুলক্ষণাক্রান্ত হস্ত, পদ ও অঙ্গগঠন ইত্যাদির সমাবেশে তাহাকে বাস্তবিকই বড় সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছে। রামকমলের একটী কন্যা—নবলক্ষ্মী, বয়স আট বৎসর; আর দুটী পুত্র—নন্দগোপাল, ননীগোপাল, বয়স যথাক্রমে, পাঁচ বৎসর ও দুই বৎসর। কৃষ্ণকমলের দুটী কন্যা সুশীলা, সরলা। সুশীলা চারি বৎসরের বালিকা, সরলা দেড় বৎসরের শিশু। এই পাঁচটী বালক, বালিকার মধ্যে কে অধিক সুন্দর তাহা বলা সহজ নহে। শরীরের রং প্রায় সকলেরই একরূপ—উজ্জ্বল শ্যাম, মুখের গঠনও একরূপ। তবে রামকমলের পুত্র, কন্যাগণ বয়সের তুলনায় ক্ষীণকায়; আর সুশীলা ও সরলা, একটু হৃষ্ট পুষ্ট। এইমাত্র প্রভেদ। ভৃত্য ভজহরির বয়স প্রায় চল্লিশ। মঙ্গলা বালবিধবা। শৈশব সময় হইতে এই পরিবারে প্রতিপালিতা হইয়া আসিতেছে। তাহার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর হইয়াছে।

কালীকান্ত রায়ের যখন প্রথম 'চাকরী' হয়, রামকমল তখন পাঁচ বৎসরের বালক। রায় মহাশয়ের হাতে তখন পয়সা ছিল না। পিতৃধন যাহা কিছু ছিল, চাকরী হইবার পূর্ব্বে কয়েক

বৎসরে তাহা ব্যয় করিয়া সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং রামকমলকে ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারিলেন না। বঙ্গবিদ্যালয়েও সে অধিক দিন যাতায়াত করে নাই। রায় মহাশয় নিজেই অবকাশ মত তাহাকে কিছু কিছু শিক্ষা দিতেন। সেই পিতৃদত্ত বিদ্যাবলে রামকমল এখন গনেশপুরের বন্দরে আর একজন মহাজনের গদিতে আট টাকা বেতনে মুহুরীগিরি করিতেছে। কৃষ্ণকমল ছয় বৎসরে সাতটী ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িয়া বিদ্যা শেষ করে। প্রতি বৎসর বার্ষিক পরীক্ষার পরই তাহার স্কুল পরিবর্ত্তন হইত, নতুবা যে তাহাকে চিরদিনই এক-শ্রেণীতে থাকিতে হয়। এইরূপে কৃষ্ণকমল দ্বিতীয়শ্রেণী পর্য্যন্ত গিয়াছিল। সে যে স্কুলে পড়িত, একজন ইংরেজ স্কুলপরিদর্শক সেই স্কুল দেখিতে আসিলেন। কৃষ্ণকমলের সৌভাগ্যক্রমে তাহার উপরই প্রশ্ন হইল। তাহার উত্তর শুনিয়া সাহেব, তাঁহার সহচর ও শিক্ষকগণ অনেকক্ষণ হাসিলেন, তাহার নামটী জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যাইবার সময় কৃষ্ণকমলের হাত ধরিয়া তাহাকে পঞ্চমশ্রেণীতে লইয়া গিয়া তথায় বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেলেন। দ্বিতীয়শ্রেণী হইতে একবারে পঞ্চমশ্রেণীতে অবতীর্ণ হওয়ায় স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র, দপ্তরী, দ্বাররক্ষক সকলেই কৃষ্ণ-কমলের অগাধ বিদ্যার পরিচয় পাইল—সকলেই তাহার প্রতি বিদ্রূপকটাক্ষপাত করিতে লাগিল। কৃষ্ণকমলের বড় লজ্জা বোধ হইল। সে বাড়ীতে যাইয়া পিতার নিকট বলিল,

'আমাকে কম মাইনে দিতে বলে, আর পুরানো-বই পড়্‌তে বলে—আমি পড়্‌ব না।'

সেই অবধি তাহার বিদ্যা শেষ হইল। এখন সে গঙ্গাতীর

গ্রামের পাঠশালার গুরুমহাশয়রূপে মাসে চারি পাঁচ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। কনিষ্ঠ স্বর্ণকমল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার একটী কালেজে পাঠ করিতেছে।

কালীকান্ত রায় গঙ্গাতীর গ্রামের একজন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁহার বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়। 'চাকরী' প্রাপ্তির পূর্ব্বে তিনি দুঃখ-দারিদ্র্য-পীড়িত হইয়া ও পৈতৃক দোল, দুর্গোৎসব কিছুই ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার বাড়ী দুইখণ্ডে বিভক্ত। অন্দরবাটী ও বহির্ব্বাটী। অন্দরবাটী, ইষ্টকনির্ম্মিত জীর্ণ প্রাচীর বেষ্টিত। বহির্ব্বাটীতে চারি খানা সুন্দর, সুদৃঢ় চৌ-চালা গৃহ। অন্দরবাটীতে দুই খানা ক্ষুদ্র ইষ্টকালয়—প্রত্যেক ইষ্টকালয়ে দুটী কক্ষ ও একটী বারান্দা; একখানা বৃহৎ চৌ-চালা গৃহ; আর একখানা ইষ্টকালয়ের প্রাচীর পর্য্যন্ত হইয়া রহিয়াছে। চৌ-চালা গৃহের পশ্চাদ্ভাগে চারিখানা ক্ষুদ্র গৃহ, রন্ধনশালা, মঙ্গলার গৃহ, ঢেঁকি ঘর ইত্যাদি। রায় মহাশয় তিন পুত্রের জন্য তিনখানা ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন—তবে, একখানা এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে বটে। সম্প্রতি একখানা ইষ্টকালয়ে রামকমল সপরিবারে বাস করিতেছে; আর এক খানার এক প্রকোষ্ঠে কৃষ্ণকমল, অপর প্রকোষ্ঠে, বাড়ী আসিলে, স্বর্ণকমল শয়ন করে। স্বয়ং রায় মহাশয় প্রথমাবধি ঐ চৌ-চালা গৃহেই বাস করিয়া আসিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুকুমারী ও গিরিবালা।

আষাঢ় মাস—অবিরাম বৃষ্টি হইতেছে। চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা সুকুমারী, অপরাহ্ণে, ননীগোপালকে ক্রোড়ে লইয়া আপন শয়ন-কক্ষের একখানা দীর্ঘ কাষ্ঠাসনে বসিয়া একখানি পত্র পাঠ করিতেছে। ননীগোপাল স্থিরনেত্রে পত্রের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। পত্র পাঠ করিতে করিতে সুকুমারী তিন চারি বার ননীর মুখচুম্বন করিল। এখন সময় বড় চৌ-চালা গৃহ হইতে শব্দ হইল,

'ছোট বৌ—ছোট বৌ'

সুকুমারী ব্যস্ততা সহকারে 'যাই মা' বলিয়া পত্রখানা হস্তে লইয়াই শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, 'কেন, মা।'

গিন্নি কৃপাময়ী ছোট বৌকে দেখিয়া বলিলেন,

'রাত দিন, চব্বিশ ঘণ্টা ছেলেটাকে কোলে করে থাক, তোমার কোমর ব্যথা হয় না? কাল তোমার বাপের বাড়ী থেকে আম সন্দেশ এসেছে, এ পর্য্যন্ত একটুও মুখে দেওনি। এই আম সন্দেশ নাও, খাও দেখি।' বলিয়া একখানা পিতলের থালায় কয়েকটী আম ও সাত আটটী সন্দেশ তাহাকে দিলেন। সুকুমারী 'খাব এখন' বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, গিন্নি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,

'ঐ ত তোমার দোষ। আর 'খাব এখন' কথায় কাজ নাই, এখনি আমার সাম্‌নে বসে খেতে হবে। সকলে খেয়েছে, শুধু তুমিই বাকি।'

সরলা সুকুমারী লজ্জাবনতমুখী হইয়া ঈষৎ হাসিল। গিন্নি তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

'আমার সাম্‌নে খাবে, তাতে লজ্জা কি, মা। এখানে বসে না খাও, তোমার ঘরে নিয়ে যাও। শীগ্‌গির শীগ্‌গির খেয়ে এসো—আমার পাকা চুল বেছে দিতে হবে, যাও মা লক্ষ্মী! শীগ্‌গির খেয়ে এসো।—ঐ পত্রখানা কার, মা! স্বর্ণকমলের বুঝি—বাছা ভাল আছে ত?'

তাহার হস্তে যে স্বামীর পত্র রহিয়াছে, তাহা সুকুমারীর এখন মনে হইল। লজ্জায় তাহার সুন্দর মুখ খানা রক্তিমাভ হইয়া উঠিল, কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল, হঠাৎ সে কোন কথা বলিতে পারিল না। গিন্নি তাহার অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন,

'লজ্জা কি মা।—স্বর্ণকমল ভাল আছে ত?'

এইবার সুকুমারী কোনরূপে অস্ফুট স্বরে বলিল 'হাঁ মা।'

লজ্জায় সুকুমারী শাশুড়ীর নিকট আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না, আম সন্দেশের থালাটী গ্রহণ করিয়া নিজ কক্ষে গেল। সন্দেশের থালাটী ও পত্রখানা তাকের উপর রাখিয়া ননীগোপালের গণ্ডদেশে চুম্বন করিতে লাগিল। ননী ঐ থালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল 'আমি হাবো।' সুকুমারী তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া বলিল 'তুমি হাবে? না, তোমায় খেতে দিব না।' বলিয়া পুনরপি তাহার মুখচুম্বন করিল। তার পর একখানা সন্দেশ ভাঙ্গিয়া একটু একটু করিয়া ননীর ক্ষুদ্রমুখে গুঁজিয়া দিতে লাগিল। একখানা ছুরী দ্বারা একটা আমের খোসা ছাড়াইয়া তাহাও একটু একটু করিয়া কাটিয়া ননীকে খাওয়াইতে লাগিল। এমন সময় দ্বারদেশে একটু শব্দ হইল—সুকুমারীর

চক্ষু সেই দিকে গেল। একটী অষ্টাদশবর্ষীয়া সুন্দরী যুবতী ঈষৎ হাসিতে হাসিতে সুকুমারীর কক্ষে প্রবেশ করিল। সুকুমারী তাহাকে দেখিয়া প্রীতপ্রফুল্লবদনে, বলিল,

'এস ভাই, তোমার কথাই ভাবছিলুম।'

যুবতী সুকুমারীর পার্শ্বে বসিয়া হাসিয়া বলিলেন,—

'বলি, আমার কথা ভাবছিলে, না—নন্দরাণী-মা-যশোদা হয়ে, সাধের ননীগোপালকে ননী খাওয়াচ্ছিলে?'

এখানে যুবতীর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইহার নাম গিরিবালা। গিরিবালা কালীকান্ত রায়ের জ্ঞাতি কন্যা—তাহার পিত্রালয়ও গঙ্গাতীর গ্রামে, রায় বাড়ী হইতে তাহার পিতৃ-গৃহ অল্প ব্যবধান। গিরিবালার পিতার অবস্থা ভাল নহে, কিন্তু সে চন্দনবাগ গ্রামের জমীদার রাধাকান্ত লাহিড়ীর পুত্রবধূ। রাধাকান্তের পুত্রের নাম দীনেশচন্দ্র। দীনেশচন্দ্র স্বর্ণকমলের সমপাঠী ও পরমসুহৃদ্। সুকুমারীর পিত্রালয়ও চন্দনবাগ গ্রামে—গিরিবালার স্বামী গৃহের পশ্চাদ্ভাগেই। সুকুমারী বাল্যকাল হইতে দীনেশবাবুকে 'দাদা' বলিয়া ডাকে। দীনেশবাবু, সুকুমারীর চরিত্র মাধুর্য্য বশতঃ তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। চন্দনবাগ গ্রামেই গিরির সহিত সুকুমারীর প্রথম পরিচয় ও সৌহৃদ্য স্থাপিত হয়। গিরিবালা যেমন সুন্দরী, তেমন বুদ্ধিমতী। স্বামীর অনুগ্রহ, চেষ্টায় সে একটু লেখাপড়াও শিখিয়াছে। কীর্ত্তিবাসের 'রামায়ণ', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত,' ইত্যাদি গ্রন্থ সে পড়িতে ও বুঝিতে পারে। সম্প্রতি সে স্বামীর গৃহ হইতে পিত্রালয়ে আসিয়াছে।

সুকুমারী ঈষৎ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল,

'কবে এলে, ভাই ?'

'এই ত আজ চার দিন।'

'এর মধ্যে এক দিন আমায় দেখ্‌তে এলে না !'

'রোজ আস্‌ব ভাবি, কিন্তু ভাই, দিন রাত বৃষ্টি—এক পা বেরুবার যো নাই।' তার পর বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল 'এই দেখ ! ফের বৃষ্টি নাব্‌ল ! বাড়ী যাব কি করে, ভাই ?'

'এখানেই আজ থাক না, কেন ?—সেখানকার সকলে ভাল আছে, ত ?'

'হাঁ, সকলেই ভাল আছে।'

'দীনেশ দাদা ভাল আছেন ?'

গিরিবালা সুন্দর মুখে মধুর হাসি হাসিয়া, সুকুমারীর গণ্ডদ্বয় টিপিয়া দিয়া বলিল, 'খপ্‌ করে, অত বড় নামটা নিয়ে ফেল্‌লে ?'

সুকুমারী হাসিয়া বলিল, 'নামটা কি অনেক বড় ?'

গিরিবালা যেন একটু ব্যস্ততা সহকারে বলিল,

'অনেক বড় না ?—দ য দীর্ঘ ঈ, দন্ত্য-নয়-একার, তালব্য-শ, চ, নয-দয়-র-ফলা—দেখ দেখি কত বড় !'

মৃদুহাসিনী সুকুমারী বলিল,

'তা বড় বৈ কি ? তিনি ভাল আছেন ত ?'

গিরি। ভাল মন্দ কেমন করে জান্‌ব ভাই ! কালেজ খুলেছে—সাত আট দিন হ'ল, কল্‌কেতায় চলে গ্যাছেন। যাবার বেলা বলে গেলেন 'সেখানে পৌছেই চিঠী লিখ্‌ব' ; কিন্তু, কৈ ?—আজও চিঠী পেলুম না ! তা, ওঁদের কি জান, বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে গেলে আর বৃন্দাবনের কথা মনে থাকে না।'

বলিয়া যুবতী একটু মৃদু হাসি হাসিল।

সুকুমারী। সবে আট দিন হয়েছে—এখনো চিঠী আস্‌বার সময় বয়ে যায় নাই।

গিরিবালা ব্যস্ততা সহকারে বলিল,

‘কেন?—হিসাব কর না কেন, পথে এক দিন, সেখানে পৌঁছে একটু সুস্থির হ’তে দু’দিন ই ধর। ডাকে চিঠী আস্‌তে দুদিন।—হলো, পাচ দিন। আজ আট দিন হ’লো, তবু পত্র আস্‌ছে না। লিখ্‌লে এত দিন দু’খানা পত্র আস্‌তে পারে। যাক্ সে কথা। বলি, তোমার তিনি গেলেন কবে?

সুকুমারী লজ্জাবনতমুখী হইয়া বলিল,

‘তাও আজ সাত আট দিন।’

গিরি। চিঠী পত্র পেয়েছ, না সিন্নি মান্‌তে হবে?

সুকুমারী স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা, সে সহসা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না—একটু হাসিল মাত্র।

গিরিবালা সেই হাসিতেই উত্তর বুঝিতে পারিয়া বলিল,

‘বুঝিছি—ই, বুঝেছি। আপনার কাজ গুছিয়ে, পরকে বলা হচ্ছে যে, এখনো পত্র আসবার সময় বয়ে যায় নাই। বটেই তো। কেন, আমরা বুড়ো হয়েছি বলে বুঝি?—তা বুড়ো হয়েছি বলে কি সোহাগ কত্তে ভুলে গিয়েছি? তা—পত্র খানা আমায় এখনি দেখাতে হচ্ছে।’

সুকুমারী লজ্জাবনতমুখী হইল—লজ্জা হইলেই তাহার সুন্দর মুখখানা লাল হইয়া উঠিত। গিরিবালার কথায় যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, ‘তুমি বুড়ো হলে কবে ভাই!’

গিরিবালা কালবিলম্ব না করিয়া উত্তর করিল,

‘কেন এই আট দিন ধরে। মেয়ে মানুষ স্বামী কাছে

থাক্‌লেই যুবতী, স্বামী দূরে গেলেই বুড়ী—তা বয়স যতই হউক না। তুমি যে এই চৌদ্দ বছরের সুন্দর ছুঁড়ী, তুমিও ত এখন বুড়ী হয়েছ।' বলিয়া যুবতী সুকুমারীর চিবুক ধরিয়া মাথাটী নাড়িয়া দিয়া বলিল,

'তা—যাউক, এখন পত্রখানা দেখাবে কি না বল।'

সুকুমারী। দেখ্‌তে চাও দেখ্‌বে, কিন্তু তার আগে একটা কাজ কত্তে হবে—

গিরি। বল, পত্রখানা দেখাবে, একটা ছেড়ে দশটা কাজ করব এখন।

'আচ্ছা, দেখাব। এখন একটু জলযোগ কর দেখি।' বলিয়া সুকুমারী সেই আম সন্দেশের থালাটী গিরিবালার সম্মুখে রাখিল। গিরিবালা তাহা দেখিয়া বলিল,

এখন আমি খেতে পারব না, ভাই।'

সুকুমারী। গরীবের বাড়ী খেলেই বড় মানুসের জাত যায় না। খেতেই হবে। বলিয়া সুকুমারী মৃদু হাসি হাসিল।

গিরিবালা এবার একটু গম্ভীর হইয়া বলিল,

'ওসব কথা বল্‌বে, তবে একা সব খেয়ে ফেল্‌ব।'

সুকুমারী। অত অনুগ্রহ হবে না।

গিরিবালা। না, ঠাট্টা নয়। এত কে খাবে?

সুকুমারী। তুমি খাবে, আমি খাব, ননী খাবে—এ আর বেশী কি?

'আচ্ছা, খাও তবে', বলিয়া যুবতী একটা সন্দেশ ভাঙ্গিয়া আধ-খানা জোর করিয়া সুকুমারীর মুখে গুঁজিয়া দিল, একটু ননীর মুখে দিল, আর বাকিটুকু আপন গালে দিল। সুকুমারী ননীকে

গিরিবালার নিকট রাখিয়া জল আনিতে গেল। কাকীমাকে না দেখিয়া ননী কাঁদিয়া ফেলিল। সুকুমারী জল রাখিয়া ননীকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিল—তাহার মুখে সন্দেশের টুকরা দিতে লাগিল, তাহার কান্না থামিল। সুকুমারী খাইতেছে না দেখিয়া গিরিবালা বলিল,

'হিসেবের বেলা তিন জনে খাবে, এখন খাও না কেন ?'

'এই খাচ্ছি' বলিয়া সুকুমারী পুনরায় ননীর মুখে সন্দেশ ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল। গিরি মুখভঙ্গী করিয়া বলিল,

'দেখ ওসব চালাকিতে কুল্‌বে না—খাবে ত খাও, নইলে আমি সব বাইরে ফেলে দিচ্ছি।'

অগত্যা সুকুমারী একটী সন্দেশ ও একটা আম উদরসাৎ করিল। এদিকে মহামায়ার কর্ণে ননী গোপালের ক্রন্দনধ্বনি পৌঁছিয়াছিল। সে দ্রুতপদে সুকুমারীর কক্ষে আসিয়া, কোন কথা না বলিয়া, তাহার কোল হইতে ননীকে যেন ক্রোধের সহিত, বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইল। তার পর ননীর গালে, পৃষ্ঠে, বেশ কয়েকটী উত্তম মধ্যম প্রদান করিতে করিতে সক্রোধে বলিল,

'কেন রে। হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া ছেলে। এই গু না খেলেই কি নয় ?—গু খাবে—আর কান্না জুড়ে দেবে।'

কথা সমাপ্ত করিয়া মহামায়া ননীর গাল দুটী সজোরে টিপিয়া দিল। হতভাগা ননী সুকুমারীর দিকে চাহিয়া 'কাকী মা, কাকী মা' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বড়-বৌর রাগ ইহাতে আরও বৃদ্ধি হইল। ফের 'কাকী মা' বল্‌বি, তবে তোকে মেরে ফেল্‌ব।' বলিয়া সে পুনরায় শিশুটীকে মারিতে লাগিল।

সুকুমারী ননীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল, দেখিতে দেখিতে বড়-বৌ আপন পুত্র লইয়া অদৃশ্য হইল। সুকুমারীর চক্ষে একবিন্দু অশ্রু দেখা দিল। গিরিবালা অবাক্ হইয়া বলিল,

'ই কি আশ্চর্য্য কাণ্ড গা? এমন ত কোথাও দেখি নাই।'

সুকুমারী কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল,

'দেখ দেখি ভাই, আমার কি দোষ? কেন বৃথা ছেলেটাকে মেরে খুন কর্‌লে?'

যুবতী একটু চিন্তা করিয়া বলিল,

'তোমার দোষ—'পরের পুত্রে পুত্রবতী মা যশোমতী' হতে যাচ্ছিলে। তুমি ভালবেসে ছেলেটাকে মার খাওয়ালে। আর যেখানে সেখানে, না বুঝে সুঝে, অমনতর করে ভালবাসা দেখিও না।'

'দু-বছরের শিশু, ওকে বিনা দোষে কি মারটাই মার্‌লে' বলিয়া সুকুমারী বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চক্ষু ঢাকিল। যুবতী তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিল,

'ভবিষ্যতে একটু বুঝে সুঝে চলো, গতিক বড় ভাল নয়।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গিরিবালার সমালোচনা।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। গিন্নি কৃপাময়ী আবার ডাকিলেন,

'ছোট-বৌ, অ-ছোট বৌ'।

সুকুমারী মলিনমুখে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট যাইয়া তাঁহার পাকা চুল বাছিবার যোগাড় করিতে লাগিল। গিন্নি বলিলেন,

'আমার মাথায় আজ পাকা চুল বড় নাই—আজ থাক্। বলি, হয়েছে কি?'

গিরিবালা আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিল। সুকুমারী চক্ষে বস্ত্র দিয়া বালিকার ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। গিন্নি তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,

'তুমি কাঁদ্‌ছ কেন—এ আর তোমার দোষ কি?'

তার পর গিরিবালাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

'ওদের ব্যাভারটা দেখে আমি অবাক হয়েছি, ওরা ভেবেছে কি? প্রতি কাজে আমায় যেমন করে জ্বালাতন কর্‌ছে, তা আর বলব কি?'

এইরূপ আরও দুই চারিটী কথার পর গিরিবালা বিদায় গ্রহণ করিতে চাহিল, কিন্তু গিন্নি তাঁহাতে সম্মতি দিলেন না, বলিলেন,

'এখনো একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছে—ভিজে ভিজে, কোথা যাবে? আজ এখানেই থাক—আমি তোমাদের বাড়ীতে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

গিরিবালা অগত্যা স্বীকৃতা হইল—সুকুমারী হাতে আকাশ পাইল। পুনরায় দুজনে মিলিয়া সুকুমারীর শয়ন কক্ষে গেল।

এদিকে মহামায়া অতি উচ্চৈঃস্বরে একে একে সুকুমারী, গিরিবালা, শ্বশ্রূঠাকুরাণী, সুকুমারীর চৌদ্দপুরুষ, স্বর্ণকমল, দীনেশচন্দ্র প্রভৃতি ইংরেজীওয়ালাগণের আঠারপুরুষ, আর লেখাপড়াজানা মেয়েদের একুশ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়া ফেলিল। গিন্নিঠাকুরাণী কত বারণ করিলেন—কত অনুনয় বিনয় করিলেন, অগত্যা দীনেশচন্দ্র, গিরিবালার নামোল্লেখ করিতে কত নিষেধ করিলেন, কিন্তু বড়-বৌ মহামায়া সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। অবশেষে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিতে লাগিল,

'এত অত্যাচার আমার সহ্য হয় না—একটু সন্দেশের জন্য পরের ছেলেকে মারিবার 'ওরা কে?' ইত্যাদি কথা বলিয়া রামকমলের চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়া পতি-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। এইরূপে অনেকক্ষণ ঝড় বহিয়া রাত্রি দশটার পর থামিল! সুকুমারী ও গিরিবালা একত্র আহার করিয়া শয়নকক্ষে গেল। যুবতী পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল,

'বাপ রে! বাঘিনী আর কি! মাগীর কি গলাটা দেখেছ?'

ভয়বিহ্বলা সুকুমারী গিরিবালার হস্ত ধরিয়া বলিল,

'তুমি থাম ভাই, ওদের কথায় কাজ নাই, আবার এখনি লঙ্কাকাণ্ড হয়ে যাবে।'

যুবতী অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল,

'লঙ্কাকাণ্ড হ'য়ে যায়, রাবণ বধ করব—তার আর ভাবনা কি? মেগো ভাতারের হাতে পড়েছেন, তাই রক্ষে—'

সুকুমারী। 'তুমি ভাই একদিন দেখ্‌লে—এমন ত রোজ হয়। **আমার** বড ভয় করে।' তার পর সুকুমারী গিরিবালার মন অন্য বিষয়ে ধাবিত করিবার জন্য বলিল,

'থাক্ ও সব কথা—এখন চিঠী দেখ্‌বে এস।'

সুকুমারী পত্রখানা আনিয়া গিরিবালার হস্তে দিল, যুবতী সস্মিতবদনে প্রদীপের নিকটবর্ত্তী হইয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিল। পাঠ সমাপ্তি করিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিল,

'সেই এক-ই কথা,—দ্বেষ হিংসা করো না, শ্বশুর শাশুড়ীকে ভক্তি করিবে, উচ্চ কথা কহিও না, বিবাদ বিসম্বাদ করো না, ওদের ছেলে মেয়েগুলিকে আপন সন্তানের ন্যায় ভালবাসিবে। এক কালেজেরই পড়ো কি না!'

অতঃপর সুকুমারীর পরিহিত বস্ত্রের প্রতি যুবতীর দৃষ্টি পড়িল। তাহার পরিধানে একখানা নূতন ঢাকাই-সাড়ী, তাহার একাংশ ছিন্ন। যুবতী তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য সহকারে বলিল—'একি এ! এমন সুন্দর নূতন কাপড় খানা ছিঁড়্‌লে কি করে?'

সুকুমারী। 'আমি ছিড়িনি—কাল বন্দুরে শুকুতে দিয়েছিলুম—' গিরিবালা তাহার কথা সম্পূর্ণ না হইতেই বলিল,

'বন্দুরের তেজে ছিঁড়ে গ্যাছে বুঝি। আমি এখন সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি। পাড়ায় যা শুনেছি, তা সত্যি বটে—এ সব ওদেরই কাজ।' তার পর কাপড় খানা ধরিয়া ছিন্ন স্থান দেখিয়া বলিল, 'টেনে না ছিঁড়লে কখনও এমন ভাবে ছিঁড়্‌তে পারে না—কি হিংসুটে গা!' সরলা সুকুমারী আপনার স্বাভাবিক মিষ্ট স্বরে বলিল, 'হয়ত কোন অবুঝ ছেলে ছিঁড়েছে! ওরা ছিঁড়বে কেন, এতে ওদের লাভ কি?'

গিরিবালা। ঐ ত তোমার বুদ্ধি! কেবল লাভের জন্যই কি মানুষ সব কাজ করে? এই যে, এখন বৃথা এত লোকের শ্রাদ্ধটা কর্‌লে, এতে কি লাভ হলো? জান এ সব বুদ্ধির দোষ,

রেখা প্রতিভাত হইতেছে। কত বিরহিণী আজ আশায় বুক বাঁধিয়া পথপানে চাহিয়া আছে। কত দুঃখ-দারিদ্র্যপীড়িত বৃদ্ধ-জনক জননী আজ প্রবাসবাসী উপার্জ্জনশীল পুত্রের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। কত ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত বালক বালিকা, যুবক, যুবতী আজ নববস্ত্রে অঙ্গশোভা-বর্দ্ধন করিতে পারিবে ভরসায়, আনন্দিত হইতেছে। সকলেই আজ আশায় উৎসাহিত, আনন্দে উৎফুল্ল। এমন সুখের দিন বুঝি বঙ্গে বড় ঘটে না— এমন জাতীয় জীবনের প্রদর্শনী বুঝি আর দেখিতে পাই না। কিন্তু সুখ দুঃখ অবিমিশ্র। কেবল সুখের, বা কেবল দুঃখের রাজ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যে কারণে একের হৃদয়ে আনন্দ-সুধা ঢালিয়া দিতেছে, ভিন্ন-অবস্থাপন্ন আর এক ব্যক্তি আবার সেই কারণেই বিষদাহনে দগ্ধ হইতেছে। ইহাই পৃথিবীর নিয়ম। পুরাতন রাজার মৃত্যু হইল—নূতন রাজা রাজ্য পাইলেন। এই রাজ্যপ্রাপ্তি উপলক্ষে কত উৎসবানন্দ, নৃত্য গীত, রঙ্গ রস, ভোজ তামাসা চলিতে লাগিল, কত সহস্র লোকের আনন্দ প্রস্রবণ বহিতে লাগিল; ঠিক সেই সময়ে, সেই মুহূর্ত্তে, সেই কারণে কত শত যুবক, স্ত্রীপুত্র কন্যাকে অন্ন বস্ত্র ও ভালবাসার কাঙ্গাল করিয়া চলিয়া গেল, কত শত সহস্র লোক অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল, 'হা হতস্মি' রবে আকাশ পূর্ণ হইল। আবার, আরও কত লোক ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল, তাহাদের জন্য কেহ হাসিলও না, কাঁদিল না। কিন্তু হাসি কান্না নিরর্থক হউক, আর সার্থক হউক, পৃথিবীর সহিত উহাদের জন্ম, পৃথিবীর সহিত উহাদের লয়—পূর্ব্বে বা পরে নহে। সুতরাং উহা উপেক্ষার জিনিষ নহে।

পূজার আর আট দিন মাত্র বাকি আছে। বৃদ্ধ কালীকান্ত রায় গণেশপুরের বন্দর হইতে বাড়ী আসিয়া সায়াহ্ন-ভোজন কার্য্য সম্পাদন করিয়া অন্দরবাটীর বড় চৌচালা গৃহের তক্তাপোষের উপর বসিয়া পান চিবাইতেছেন, গিন্নি কৃপাময়ী পাখা দ্বারা বাতাস করিয়া মসা তাড়াইতেছেন। গিন্নি ধীরে ধীরে পূজার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিলেন,

'আজকের রাবে অধিবাস, এখন পর্য্যন্ত যে কোন যোগাড়ই কল্লে না। কি করবে না করবে, তাও বল্‌ছ না—'

রায় মহাশয় বিরক্তি সহকারে বলিলেন,

'বলব আমার মাথা আর মুণ্ডু। আমার কিছু ভাল লাগে না— যা হবার হবে।'

গিন্নি। ভাল ত লাগবে না—তা ত বুঝি। কিন্তু তা বল্লেই ত হবে না—মান অপমান সবই তোমার। যত দিন বেঁচে আছ, ভালতে মন্দতে ত তোমাকেই পাবে। ওদের চেনে কে? বাইরের লোকে ত আর ভিতরকার খবর বুঝ্‌বে না।

কর্ত্তা। দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা বিবাদ বিসম্বাদ।—এতে কি আর মানুষ থাক্‌তে পারে?

গিন্নি। আজকাল যেন আরও বেড়ে উঠেছে। এখন আর কাককে গ্রাহ্য নাই। যার স্ত্রী সে শাসন না কল্লে কি হয়ে থাকে? তা ওরা শাসন করবে দূরে থাক্, বরং উশ্‌কিয়ে দেয়।

রায় মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,

'ঐ কুষ্মাণ্ড দুটা আমায় হাড়ে হাড়ে পুড়িয়ে মারবে। হয়ে মরে গেলে উৎপাত যেত। বড়টা হয়েছে টাকা টাকা করে পাগল। কার সর্ব্বনাশ করে টাকা কর্‌বে তাই হয়েছে ওর ভাবনা। ওর

অদৃষ্টে জেল আছে, তা আমি ঠিক দিয়ে রেখেছি। আপন ভাই—আমি বর্ত্তমানেই ওদেব ঠকাবাব ফিকিব কচ্ছে। কি ভয়ানক অর্থলোভ। আব মেজেটা একটা গণ্ডমূর্খ, হিতাহিত জ্ঞান নাই, বৌ যা বলে দেবে, তাই ওব বেদ। হতভাগা আবাব একটা ইস্কুল কবে পাড়াব ছেলেদেব মাথা খাচ্ছেন। এদেব যা বলা যাবে তা বিপবীত কববে, প্রতি কথায় তর্ক কববে, এমন ছেলে থাকাব চেযে না থাকা ভাল।'

গিন্নি। তা, আবাব বৌ দুটী জুটেছে তেম্‌নি। দিন বাত ঝগড়া কব্‌বে—আব ছোট-বৌর হিংসায মব্‌বে।

কর্ত্তা। 'যেমন দেব তেমন দেবী', বৌদেব দোষ কি? মেযে মানুষ মোমেব পুতুল—বুদ্ধি থাক্‌লে ওদের যেমন কবে ইচ্ছা তেমন কবে ভেঙ্গে চুরে গড়ে নেওযা যায়। ভাল স্বামীর হাতে পড়্‌লে এবাই হয়ত ভাল হ'তে পাব্‌ত।

গিন্নি। ভাল লোকের মেয়ে হ'লে, স্বভাব আপ্‌নি ভাল হয। দেখ দেখি ছোট-বৌ-মা আমাব কেমন লক্ষ্মী।

কর্ত্তা। যেমন স্বর্ণকমল, তেমন ছোট-বৌ। এদেব দেখ্‌লে আমাব চক্ষু জুড়ায, সব কষ্ট ভুলে যাই। কেমন মিষ্টি কথা, নবম স্বভাব; হাজাব হউক লেখা পড়া শিখেছে, না হবে কেন। ছোট-বৌ-মা যখন প্রথম বই পড়তে লাগ্‌ল, তখন স্বর্ণকমলেব উপব আমাব একটু বাগ হ'যেছিল। এখন দেখ্‌ছি যাবা বই পড়ে—লেখা পড়া জানে, তাবাই ভাল।

গিন্নি। ছোট-বৌব বড় বুদ্ধি, হাঁ না কব্‌তে মনের কথা বুঝে ফেলে। কেমন সবল মন, বড়-বৌ, মেজ-বৌ ওব হিংসায় মবে, সর্ব্বদা ওকে গালাগালি দেয়, দুর্ব্বাক্য বলে, মেমসাহেব বলে, কত

ঠাট্টা করে, তবু কারু প্রতি ওর রাগ নাই। যে যা বলে তাই করে—কাজ ছাড়া থাকে না, তবু কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! আজ চার বছর হ'ল স্বর্ণকমলের বে হয়েছে, এর মধ্যে ছোট-বৌ এক দিন কারু নামে একটী কথা বলে নাই। এমন লক্ষ্মী মেয়ে আমি আর ত্রিজগতে দেখি নাই। কথা বল্লে যেন মধু বরিষণ হয়—প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। যাতনা সহ্য কত্তে না পাল্লে চুপটী করে কাঁদে, তবু একটী কথা কয় না।

কর্ত্তা। ছোট-বৌমা এ সংসারের লক্ষ্মী, ভগবানের আশীর্ব্বাদে স্বর্ণকমল বেঁচে থাক্‌লে আমর মান সম্ভ্রম বজায় থাকবে। নইলে এ ভিটেতে ঘুঘু চরবে।

গিন্নি। সাট্—বাছারা বেঁচে থাক্। ছোট-বৌ ওদের কি কু-দৃষ্টিতেই পড়েছে। বাছা আমার বেঁধে আসে, আর বড়-বৌ, মেজ-বৌ কিনা সেই রাঁধা বেন্নুনে নুন মিশিয়ে দেয়! আর আস্ত কাপড় টেনে ছিঁড়ে দেয়! এমন কীর্ত্তি কোথাও শুনি নাই। আবার একথা মুখে বল্লে বড-বৌ, মেজ-বৌ গর্জ্জে উঠেন, আর রামকমল কৃষ্ণকমল স্ত্রীর পক্ষ হ'য়ে ছোট-বৌকে আর আমাকে মিথ্যাবাদী বলেন, যা-ইচ্ছা তাই গালাগালি দেন।

রায় মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,

'আর সে সব কথা আমায় রোজ রোজ বলো না। ও সব কথা শুন্‌লে আমি ভবিষ্যৎ ভেবে অস্থির হই। হতভাগাদের ইচ্ছে—আমি বর্ত্তমানেই পৃথক হয়।'

গিন্নি কৃপাময়ী দুঃখিত অন্তঃকরণে বলিলেন,

'থাক্ সে সব কথা। বলি পূজার কি কর্‌বে?

কর্ত্তা। আর আর বছর যেরকম হয়, এবারও তেম্‌নি হবে।

আমাব ইচ্ছা পূজাব পব কাশীধামে চলে যাই। আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। এসব দেখে শুনে দুশ্চিন্তায় আমার শরীর, মন দিন দিন খারাপ হচ্ছে। আব অধিক কাল বাঁচব না। মান থাকতে পালানো ভাল। আর মান বা আছেই কোথা? ছেলে দুটা কথা শুনে না, বৌরা ও শ্বশুর শাশুড়ী বলে গ্রাহ্য করে না। এর পর আরও কত কি হবে?

গিন্নি কৃপামযী দুঃখিত অন্তরে বলিলেন,

'আব হবে কি, এখন ভগবান পার কল্লেই বাঁচি। কাশীধামের কথা যে বল্‌ছ, ছোট-বৌকে ছেড়ে কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে থাকতে পারব না। আর ওকে এখানে রেখে গেলে, ওরা গলা-টিপেই মেরে ফেল্‌বে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দম্পতী যুগল।

শীতের ছুটিতে স্বর্ণকমল আজ কিছু দীর্ঘকাল পরে বাড়ী আসিয়াছে। সুকুমারীর মনে আজ কত কল্পনা জল্পনা চলিতেছে। স্বর্ণকমলও সুকুমারীকে দেখিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু একে হিন্দু-পরিবার, তদুপরি বড়-বৌ ও মেজ-বৌর তীব্রবিদ্রূপের ভয়, সুতরাং দম্পতী যুগলকে অগত্যা বাধ্য হইয়া রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইতেছে। সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা আসিল, অন্ধকার গাঢ় হইল, সায়াহ্ন-কৃত্য সমাপন করিয়া পুরুষেরা বহির্ব্বাটীতে গেলেন, আর রমণীরা নিজ নিজ শয়নকক্ষের

আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। সুকুমারী পান চিবাইতে চিবাইতে শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, আলোটা উজ্জ্বল করিয়া, শয্যাপার্শ্বে বসিয়া স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। শয়ন-গৃহের একপ্রান্তে একখানা ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ টেবিল, তাহার নিকট একখানা চেয়ার। স্বর্ণকমল বাড়ী আসিলে এখানে বসিয়া লেখা-পড়া করে। টেবিলের উপর একটা ক্ষুদ্র ঘড়ী টিক্ টিক্ করিতেছে। সুকুমারীর চক্ষু ঘড়ার উপর পড়িল। অস্ফুটস্বরে 'দশটা বেজে গেল!' বলিয়া সে শয্যা হইতে উঠিয়া টেবিলের নিকটে গেল, আলোটা টেবিলের উপর রাখিল, তার পর চেয়ারে বসিয়া একখানা বাঙ্গালা পুস্তকের পাতা উল্টাইতে লাগিল। কোন পৃষ্ঠার এক ছত্র, কোন পৃষ্ঠার দুই ছত্র কোন পৃষ্ঠার শুধু পত্রাঙ্কটী পড়িয়া সে শতাধিক পৃষ্ঠা উল্টাইল, তবুও স্বর্ণকমল আসিল না। অতঃপর একটা পেন্সিল লইয়া একখানা সাদা কাগজে কত কি লিখিল, লিখিয়া কাটিল, আবার লিখিল। স্বর্ণকমল মৃদু পাদ-বিক্ষেপে গৃহে প্রবেশ করিয়া দরজার অর্গল বন্ধ করিল। অর্গলের শব্দে সুকুমারী চমকিয়া উঠিয়া ব্যস্ততা সহকারে বই, কাগজ, পেন্সিল ফেলিয়া রাখিয়া তক্তাপোষের নিকট গেল। স্বর্ণকমল দ্রুতগতিতে তাহার পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া স্বীয় হস্ত দ্বারা সুকুমারীর কোমল হস্ত দুখানি ধরিয়া সস্মিত বদনে বলিল,

'কোথা পালাচ্ছ?—হচ্ছিল কি?'

সুকুমারী লজ্জায় কথা বলিতে পারিল না। নিঃশব্দে তদবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। স্বর্ণকমল দক্ষিণ হস্তে স্ত্রীর সুকোমল গণ্ডদ্বয় টিপিয়া দিয়া বলিল,

'এখনো শোও নি?'

এবারও লজ্জাশীলা সুকুমারীর মুখে কথা ফুটিল না।

স্বর্ণকমল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার পত্রের উত্তর দেও নাই কেন?'

সুকুমারী সে কথায় উত্তর না দিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিল, 'এলে, তবু ভাল।'

সুকুমারীর বুকটা ধড়ফড় করিতে লাগিল। যেন কথা বলিয়া কি একটা অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে।

স্বর্ণকমল বলিল, 'কেন, অনেক দেরী হয়েছে নাকি?'

সুকুমারী সাহস আর একটু বাড়াইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'আমি ভাব্‌ছি, তুমি বুঝি ফের কল্‌কেতায় চলে গেলে।'

স্বর্ণকমল। কেন, রাত কটা বেজেছে?

সুকুমারী। কল্‌কেতার ঘড়ীতে এখনো সাতটা বাজে নাই।

অতঃপর স্বর্ণকমল আপন বাম হস্ত দ্বারা সুকুমারীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া স্ত্রীকে লইয়া টেবিলের নিকটবর্ত্তী হইয়া স্বয়ং চেয়ার খানিতে বসিল, সুকুমারী তাহার বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

স্বর্ণকমল। কল্‌কাতার ঘড়ী বুঝি বড় ধীরে চলে?

সুকুমারী। কল্‌কাতায় যারা থাকে, তাঁরাও বড় ধীরে চলে।

স্বর্ণকমল। 'কিসে বুঝ্‌লে?' বলিয়া পুনরায় তাহার গাল টিপিয়া দিল। সুকুমারী আজ অপূর্ব্ব সাহসে বুক বাঁধিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞের ন্যায় বলিতে লাগিল,

'তোমার বিলম্ব দেখে। বক্তৃতার বেলা বলা হয়, রাত্রি দশটার সময় শয়ন করা উচিত, আর সূর্য্য না উঠ্‌তে ওঠা উচিত। দেখ দেখি কটা বেজেছে?—হয় তোমাদের কল্‌কাতার ঘড়িতে এখনো সাতটা বাজে নি, নতুবা তোমরা যেরূপ বল, সেরূপ কাজ

কর না।' বলিতে বলিতে সেই পৌষ মাসের শীতেও সুকুমারীর কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল।

তৎপরে স্বর্ণকমল ঘড়ীর দিকে চাহিয়া একটু আশ্চর্য্য সহকারে বলিল, 'এই ঘড়ীটা চল্‌ছে।—এগারটা বাজে যে। রোজ চাবি দিতে নাকি?'

সুকুমারী অপ্রতিভ না হইয়া বলিল,

'তা কেন?—অমনি চলে।'

স্বর্ণকমল। হাতের গুণে বুঝি?—এতক্ষণ এখানে বসে কি কচ্ছিলে?

সুকুমারী। হরিঠাকুরকে ডাকছিলুম।

স্বর্ণকমল একটু হাসিয়া বলিল, 'এত ভক্তি কবে হলো?'

সুকুমারী। বিপদে পড়ে ভক্তি হয়।

স্বর্ণকমল। হঠাৎ এত বড় কি বিপদটা হলো?

সুকুমারী লজ্জা ত্যাগ করিয়া বলিল, 'তুমি খেয়ে দেয়ে কোথা চলে গেলে, আস্‌তে এত দেরী কচ্ছিলে, তাই ভাবনুম—'

স্বর্ণকমল স্ত্রীর কথা শেষ না হইতেই বলিল,

'তোমরা কি আমাদের জন্য ভাব?'

সুকুমারী একটু ব্যথিত হৃদয়ে বলিল,

'না তা কেন। তোমরা যেমন নিষ্ঠুর!'

স্বর্ণকমল সুকুমারীকে কোলে বসাইয়া সস্নেহে মুখচুম্বন করিল, সুকুমারীর একটু অনিচ্ছা সত্বেও তাহার অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দিয়া কবরী খুলিল, বেণী দ্বারা সুকুমারীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া প্রীতপ্রফুল্লমনে সুন্দরী স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া বলিল,

'নিষ্ঠুরতা এখনো কিছু করি নি। তুমি আমার জন্য যত না

ব্যস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে দেখ্‌বার জন্য তার চেয়ে ঢের বেশী ব্যস্ত হয়েছিলুম, কিন্তু কি করব? বাবা, বড় দাদা, মেজদাদা বসে রয়েছেন, তাঁদের ফেলে কি করে আসি? বাবা বল্লেন, 'আমার বৃদ্ধাবস্থা, কখন কি হয় বলা যায় না, এখন তোমরা তিন ভাই বাড়ীতে আছ, সব বুঝে শুনে নেও।' পারিবারিক বিবাদ বিস-ম্বাদ সম্বন্ধে আরও কত কথা বল্লেন। সে সব কথা কাল হবে। আজ ঢের রাত হয়েছে—চল শুইগে। রাত জাগ্‌লে অসুখ হবে। বেণীর মালায় তোমাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে! সাদা গলায় কাল মালা—বেশ মানিয়েছে!'

সুকুমারী লজ্জিতা হইয়া বলিল, 'ফের করে যাবে?'

স্বর্ণকমল একটু হাসিয়া বলিল, 'যদি বলি, কাল?'

সুকুমারী। তা, তোমাদের আশ্চয্য নাই! না—সত্যি, ক'দিনের ছুটী?

স্বর্ণ। অনেক দিনের———

সুকুমারী। তবু, শুন্‌তে কি আর দোষ আছে?

স্বর্ণকমল। প্রায় দু মাসের।

সুকুমারী একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিল,

'এবার তবে অনেক খবর জেনে যেতে পারবে।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

'কেন এমন হয়?'

স্বর্ণকমল প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া গঙ্গাতীরের বাধা রাস্তার উপর দিয়া একটু ভ্রমণ করে। তারপর সামান্য একটু জলযোগের পর কোন দিন কোন পুস্তকের দুই এক পাতা কিম্বা সংবাদ পত্র পাঠ করে, কোন দিন পিতা কিম্বা ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে সাংসারিক প্রসঙ্গে কথোপকথন করে। যথাসময়ে স্নান আহার করিয়া কোন দিন নিদ্রাগত হয়, কোন দিন বা পাড়ার ভদ্র যুবকগণের সহিত তাস বা পাসা খেলায় নিযুক্ত হয়। অপরাহ্নে প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনের বাড়ী বেড়াইতে যায়। তাহার সৌজন্য ও ভদ্রব্যবহারে সকলেই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট ও অনুরক্ত হইতে লাগিল।

সুকুমারী এখন আর বালিকা নহে। আপনার স্বাভাবিক লজ্জা একটু পরিত্যাগ করিয়া সে এখন স্বামীর সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে শিখিতেছে, স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে স্বামীর উপদেশ ও কথোপকথনের মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইতেছে; স্বামী হৃদয়ের গূঢ় স্থানে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনোগত ভাব টানিয়া বাহির করিতে শিক্ষিতা হইতেছে। এইরূপে, প্রেমের প্রতিদান হওয়ায় নবদম্পতীর দাম্পত্য-প্রেম ক্রমেই অধিকতর গাঢ় হইতেছে। সায়াহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া পতি পত্নী একত্র মিলিত হইয়া পরমানন্দে সদ্‌-গ্রন্থাদি পাঠ করে। সুশীলা সুকুমারী এপর্য্যন্ত স্বামীর নিকট পারিবারিক প্রসঙ্গে কোন কথাই বলে নাই। এ দিকে স্বর্ণ-

কমলের ছুটী প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—আর সাত আট দিন মাত্র বাকি। ভার্য্যা সুকুমারী দুই হস্তে স্বামীর দক্ষিণ হস্তখানা ধরিয়া—স্বামীর বুকে মাথাটী রাখিয়া, অতি ব্যথিত হৃদয়ে, অনিচ্ছা সত্বে, মৃদুস্বরে বলিল,

'তুমি ত আর দুদিন বাদে চলে যাবে, তখন আমার দশা কি হবে ভগবান জানেন ; আমার বড় ভয় হচ্ছে।'

স্বর্ণকমল ইতিমধ্যে পারিবারিক অবস্থা অনেকটা জানিতে পারিয়াছিল, সুকুমারীর উপরে যে অযথা অনেক প্রকারের অত্যাচার হয়, তাহাও তাহার কাণে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু তবুও স্ত্রীর আব্দারে প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে বিবেচনায়, সে সুকুমারীর কথার প্রত্যুত্তরে বলিল,

'এ তোমার অন্যায় কথা, আপনার বাড়ীতে থাক্বে, ভয় কি ?'

সুকুমারী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মলিনবদনে বলিল,

'হ'লে কি হয়, বড় দিদি, মেজ-দিদির যে আমি চক্ষুঃশূল হয়েছি।'

স্বর্ণকমল। হয়ে থাক ত সে তোমার নিজের দোষে, ব্যবহারের দোষে মিত্র শত্রু হয়, আবার সুব্যবহার দ্বারা পরম শত্রুকেও মিত্র করিয়া লওয়া যায়। তুমি হয়ত তাঁদের প্রতি ভাল ব্যবহার কর না, তাঁদের ছেলে মেয়েগুলিকে স্নেহ, যত্ন কর না, তাঁহাদের অজ্ঞতায় উপহাস কর, নতুবা কি বিনা কারণে, ঘরের লোক পর হ'তে পারে ?

সুকুমারী অপ্রস্তুত হইয়া বলিল,

'কৈ না। আমি ত কখনো তাঁদের প্রতি কোন রূপ তাচ্ছল্য

বা কুব্যবহার করি না, বরং প্রাণপণ করিয়া তাঁদের মন রক্ষা করিতে চেষ্টা করি। আমি বই পড়ি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকি, গায় ফুঁ দিয়ে চলি, মেমসাহেব হয়েছি, এইরূপ কত কথা বলে আমায় ঠাট্টা করে; পাড়ার মেয়েদের কাছে কত প্রকারে আমার নিন্দা করে। তবু আমি——'

স্বর্ণকমল সুকুমারীর কথা সম্পূর্ণ না হইতেই বলিল,

'তা বল্লেই বা, তাঁদের কথায় জবাব না দিলেই ত হয়।'

সুকুমারী। আমি কি সে কথায় জবাব দেই। জবাব দিলে কি আর রক্ষে আছে?

স্বর্ণকমল। সভা বুঝে কীর্ত্তন গাইতে হয়—যে, যে কথার মর্ম্ম না বুঝিতে পারিবে, তার কাছে সে কথা না বলাই বুদ্ধিমানের কাজ। মনে কর, একটা কৃষকের কাছে যদি বলা যায় যে, 'পৃথিবী গোল' কিম্বা 'পৃথিবীটা ঘুরিতেছে', সে তাহা কখনই বুঝিতে পারিবে না, বরং সে বক্তাকে পাগল মনে করিবে।

সুকুমারী ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিল,

'কেমন করে পৃথিবীটা ঘুরিতেছে, আমি তা ভুলে গিয়েছি—আমায় তা বুঝিয়ে দিতে হবে।'

স্বর্ণ। তা, হবে আর একদিন—লেখা পড়া শিক্ষার যে কত গুণ, ইহাতে মানুষের মন যে কত উন্নত হয়; আর পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন থাকা যে স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে কত প্রয়োজন, তাহা অনেক পুরুষ মানুষেই বুঝ্‌তে পারে না, তোমার বড়-দিদি, মেজ-দিদি বুঝিবে কি? যাহার যাহা বুঝিবার শক্তি নাই, তাহার সঙ্গে সে বিষয়ে বাক্যব্যয় করাই অন্যায়। তোমার বড়-দিদি, মেজ-দিদির যদি লেখাপড়ার ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপকারিতা বুঝিবার

শক্তি থাকিত, তবে আর তাঁহারা তোমাকে ঠাট্টা কত্তেন না—তাঁহারাও তোমার মত কত্তেন। সুতরাং এটা তাঁদের দোষ নয়, অজ্ঞতা। তোমার এ ঠাট্টায় বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া আপন কর্ত্তব্য পালন করা উচিত।

সুকুমারী। তাই ত করি। আমি ত কখনও এসব কথা নিয়ে তাঁহাদের সঙ্গে ঝগড়া করি না।

স্বর্ণ। তুমি কিছু না বল্‌লে কি তাঁরা গায় পড়ে এসে তোমার শত্রু হন ?

সুকুমারী হৃদয়ে একটু যাতনা পাইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিল, 'তা, কি ক'রব বল। তুমি যখন এত কথা পাড়লে তখন আজ দু একটী কথা বল্‌তে হবে। আমার বাক্স খুলে দেখ, একখানাও আস্তকাপড় পাবে না। আমি বদ্দুরে কাপড় শুকাতে দি, তাও কি আমার দোষে ছেঁড়া হয়ে থাকে ? আমার বই-গুলি দেখ, সবগুলির পাতা ছেঁড়া। এও কি আমার দোষ ? আর আমি কি প্রতিদিনই বাঁধিতে গিয়া ভুল করিয়া ঝোলে, তরকারীতে দুই তিন বার নুণ দেই ?—প্রতিদিনই কি আমি ভুল করিয়া শ্বশুর শাশুড়ীর খাওয়া নষ্ট করি।' বলিতে বলিতে সুকুমারীর চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া দুই বিন্দু জল পড়িল। সুকুমারী স্বামীর অলক্ষিতে চক্ষু মুছিয়া পুনরায় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, 'আমি যদি তাঁদের কোন কথার উত্তর দিই, তবে বলে, 'তুমি লেখাপড়া জান, তোমার সঙ্গে কি আমরা কথায় এঁটে উঠ্‌তে পারি।' যদি চুপ করে থাকি, তবে বলে, 'উনি আমাদের মুক্ষু মানুষের সঙ্গে কথা কইবেন কেন ? নিজে বিদ্বান লোক, সোয়ামী ইংরেজীওয়ালা—আমাদের মত ত নয় !'

আমি যদি শিগ্‌গীর করে বাঁধতে যাই, তবে বলে, 'আমরা ত আর বাঁধতে জানি না, ও বাঁধবে বৈ কি। আমাদের রান্না যে শ্বশুর শাশুড়ীর ভাল লাগে না। যদি তাঁহাদের অপেক্ষায় দেরী করি, তবে বলে—'ছোট-বৌ বাঁধবে কেন, ওর কত কাজ—বই পড়া, চিঠী লেখা, ছবি আঁকা। বড় লোকের ঝি, বড় ভাতারের মাগ, ওঁর ভাবনা কি?' যদি তাঁদের ছেলে মেয়েকে কোলে নি, তবে বলে, 'না থাক, পরের ছেলে কোলে করে কষ্ট পাবে কেন?' যদি কোলে না লই, তবে বলে, ছেলে মেয়েগুলি কেঁদে মরে গেলেও কেহ একটু ধরে না, এমন শক্রর পুরীতে বাস।' অতঃপর সুকুমারী আরও গম্ভীরস্বরে, বিষণ্ণবদনে বলিল, 'দেখ, ননীগোপালকে আমি একটু ভালবাসি, আজ তাকে কোলে নিতে চাইলুম, ননী আমার হাত ছাড়াইয়া বেজার হয়ে বল্লে, 'ছোট কাকী। আর তোমার কোলে যাব না।' আমি বল্লুম 'কেন রে ননীগোপাল।' সে উত্তর কল্লে, 'মা বারণ করেছে, তোমার কাছে গেলে মা মারবে।'

এই কথা বলিতে বলিতে আর এক ফোঁটা অশ্রু টস্ করিয়া স্বর্ণকমলের হাতে পড়িল। স্বর্ণকমল চকিতের ন্যায় প্রিয়তমা ভার্য্যার মুখপানে চাহিয়া বলিল,

'তুমি কাঁদছ সুকুমারি। ছি।'

প্রিয়তমের প্রিয়সম্ভাষণে সুকুমারীর কোমল হৃদয়ে তাড়িত সঞ্চালিত হইল, এবার সে সত্য সত্যই সরলা বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল। হৃদয়ের আবেগ ধারণ করিতে অপারগ হইয়া, সুকুমারী দুই হস্তে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল,

'তুমি বলিতেছ, ব্যবহারের দোষে মিত্র শত্রু হয়। তুমি আমার পরম গুরু—তুমি যাহা বলিবে, তাহাই আমার বেদবাক্য। আমি সুব্যবহার, কুব্যবহার বুঝি না, কি করিলে ইহারা আমার আপন ভগিনীর ন্যায় হইবেন, আমাকে বলিয়া দেও, আমি তাহাই করিব।'

স্বর্ণকমল সরলা সুকুমারীর সরল কথা শুনিয়া কিছু অপ্রতিভ হইল. মনে মনে তাহার সরলতার শত প্রশংসা করিল, কি উত্তর দিবে, সহসা স্থির করিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল। তারপর স্বর্ণকমল প্রেমভরে সুকুমারীকে ক্রোড়ে টানিয়া লইল, তাহার আলুলায়িত কুন্তল-রাশি গুছাইয়া দিল, স্বীয় বস্ত্রের অগ্রভাগ দ্বারা তাহার অশ্রু-জল মুছাইয়া দিয়া বলিল,

'সুকুমারি! আমি সত্যসত্যই ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি যে তাহাদের প্রতি অসঙ্গত ব্যবহার কর, ইহা আমার সহজে বিশ্বাস হয় না। কারণ ব্যতীতও কার্য্য হয় না, তবে কেন তাহারা এরূপ করে? এক কারণ হইতে পারে—হিংসা। মানুষের উন্নত অবস্থা দেখিলে পরশ্রীকাতর নীচ প্রকৃতি ব্যক্তিগণের গাত্রদাহ হয়। কিন্তু আমাদের অবস্থায় আর তাহাদের অবস্থায় বিশেষ কিছু প্রভেদ দেখিতেছি না; সুতরাং হিংসারও কারণ নাই। তবে কেন এমন হয়?'

সরলা সুকুমারী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, 'বল, আমি কি উপায় করিব?'

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মুক্তকেশীর মন্ত্রদান।

পরদিন রজনীতে মুক্তকেশী উপাধানে মস্তক রাখিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছে। কৃষ্ণকমল শয্যাপার্শ্বে বাক্‌শূন্য হইয়া বসিয়া আছে। কেহ কোন কথাটী কহিতেছে না। কিয়ৎকাল পর কৃষ্ণকমল অতি বিরক্তির সহিত বলিল,

'আজ আবার হ'লো কি? রোজ রোজ এত আমার ভাল লাগে না।'

মুক্তকেশী এবার আর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,

'এত অপমান আমার সহ্য হয় না, আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেও।

অভিমান হইলে মুক্তকেশী প্রতিদিনই স্বামীর নিকট এই কথা বলিত। কৃষ্ণকমল আজ আর সহ্য করিতে পারিল না, একটু ক্রোধ ও বিরক্তির সহিত বলিয়া ফেলিল,

'চলে গেলেই ত হয়, কে তোমায় বারণ কচ্ছে?'

মুক্তকেশীর কোমল প্রাণে বুঝি বড় ব্যথা লাগিল! সে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল,

'আমায় যারা দেখ্‌তে পারে না, তারা আমার সঙ্গে যেন কথা বলে না—তাদের মা বাপের দিব্বি! আমি এ শত্রুপুরীতে থাক্‌তে চাইনে, কালই বাপের বাড়ী চলে যাব।'

কৃষ্ণকমল বিরক্তি সহকারে বলিল,

'কাল কেন? এখনি যাও।'

'তবে এখনি যাচ্ছি' বলিয়া অশ্রুমুখী মুক্তকেশী অভিমান ভরে অতি দ্রুতবেগে শয্যার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণকমল সজোরে তাহরে দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ক্রোধের সহিত বলিল

'চুপকরে শুইয়ে থাক,—একটী কথা কইবে তবে আজ বিপদ ঘটাব—জেনো।'

ভয়ে, দুঃখে, অভিমানে অগত্যা মুক্তকেশী পুনরায় শয়ন করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উপাধান শিক্ত করিয়া ফেলিল। পতি বা অন্য কোন গুরুজন কর্ত্তৃক বিনাদোষে তিরস্কৃতা ও অপমানিতা হইলে সুশীলা রমণীগণ যেরূপ মর্ম্মব্যথা পাইয়া কাঁদিতে থাকে, মুক্তকেশী আজ ঠিক তেমনি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অর্দ্ধ দণ্ড এইরূপে কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণকমল মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল যে, নিশ্চয়ই মুক্তকেশীর উপর আজ কোনরূপ অত্যাচার হইয়া থাকিবে, নতুবা সে এতক্ষণ ধরিয়া কাঁদিত না। এই সত্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকমলের দয়ার সাগর উথলিয়া উঠিল! স্ত্রীর প্রতি একটু কাঠিন্য প্রদর্শন করিয়াছে বলিয়া মনে মনে একটু অনুতাপও হইল! তার পর, যেন পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্য করিবার জন্য, একটু নরম হইয়া দুর্ব্বলহৃদয় কৃষ্ণকমল রোরুদ্যমানা স্ত্রীর হস্ত ধরিয়া করুণাব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ হয়েছে কি?'

মুক্তকেশী সে কথার উত্তর প্রদান করিল না—স্বামীর হস্ত হইতে আপনার হস্ত মুক্ত করিয়া, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণকমলের হৃদয় গলিয়া গেল, মুক্তকেশীর প্রতি যে অত্যাচার

হইয়াছে, তদ্বিষয়ে তাহার আর কোন সন্দেহই রহিল না। স্ত্রীর আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া নরম হইয়া বলিল,

'কি হয়েছে, তা না বল্লে আমি কেমন করে এর প্রতিকার করি।' মুক্তকেশী এবার কাঁদিয়া বলিল,

'কিছু হয় নাই—কারো কিছু করেও কাজ নাই।'

মুক্তকেশীর ক্রন্দনের স্রোতঃ ক্রমে বাড়িতে লাগিল। কৃষ্ণকমল বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,

'একটী কথা বল--কি হয়েছে?'

'আমার যদি কেহ থাক্‌ত, তবে আর আমার এমন দশা হবে কেন?' বলিয়া মুক্তকেশী বালিশে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

'এদিকে ফিরে বল না, কি হয়েছে।' বলিয়া কৃষ্ণকমল স্ত্রীর হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। মুক্তকেশী উপাধান হইতে মস্তক নামাইয়া শুইল, কোন কথা কহিল না। কৃষ্ণকমল স্বীয় জানুদেশে স্ত্রীর মস্তক স্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে?'

মুক্তকেশী নিরুত্তরা। কৃষ্ণকমলের পুনরায় ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার উপক্রম হইল। সে বলিল, 'তবে বলবে না?'

আর বিলম্ব করা সঙ্গত নহে মনে করিয়া, মুক্তকেশী বলিল,

'এই শত্রুপুরীতে আমার দুঃখ যে না বুঝবে, তার কাছে বলে কি হবে? আর আমাদের কথায় কি কারো বিশ্বাস হবে?'

অশ্রুপাত সমভাবে চলিতে লাগিল।

কৃষ্ণ। বিশ্বাস হয় না হয়, সে আলাদা কথা। এখন বল কি হয়েছে?

মুক্তকেশী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চক্ষু ও নাসিকা মুছিয়া বলিল,

'আমরা লেখাপড়া জানিনে, একখানা কথাকে তিনখানা করে বল্‌তে পারব না, কেউ বিশ্বাসও করবে না, কারো কাছে কিছু বল্‌তেও চাইনে।'

কৃষ্ণকমল সত্য আবিষ্কারের জন্য ব্যগ্র হইয়া বলিল,

'কি হয়েছে ?'

'তোমার সোণার ভাই, সোণার ভাই-বৌ।'

'এরা কি করেছে।'

'করবে আর কি, আমায় তাড়াতে পাল্লে বাঁচেন।'

'কেন, তুমি এদের কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছ ?'

'তা, কেমন করে জান্‌ব। কাল তুমি বাড়ী ছিলে না, একা শুইয়ে রইলুম। কিছুকাল পরে ওদের ঘরে কাঁদা কাটা শুনে উঠলুম, উঠে দরজায় কাণ দিয়ে যে সব কথা শুন্‌লুম, তা বল্লে তোমার বিশ্বাস হবে না।'

'কি শুন্‌লে ? কে কি বল্লে ?'

ছোট-বৌ ঠাকুর-পোকে বল্লে, 'তোমার ছুটী ফুরিয়ে এল, এখন আমার দশা কি হবে ? এবার আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে।' ঠাকুর-পো বল্লে, 'তোমার ভয় কি ?' তার পর ছোট-বৌ বল্লে, 'মেজ-বৌ, বড়-বৌ আমার পেছু লেগেই আছে, কোন্ সময় কি সর্ব্বনাশ করে তার ঠিক নাই। আমি বই পড়ি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকি বলে পাড়ায় পাড়ায় আমার নিন্দে করে বেড়ায়, আমার বইগুলি ছিঁড়ে দেয়, বদ্দুরে কাপড় শুকুতে দিয়ে এলে সে কাপড় টেনে ছিঁড়ে দেয়, যাচ্ছেতাই গাল দেয়—'

কৃষ্ণকমল স্ত্রীর কথা শেষ না হইতেই ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, 'তা, স্বর্ণকমল কি বল্লে ?'

মুক্তকেশী। তিনি বল্লেন, 'তা নিন্দে করবেই ত। লেখা পড়ার মর্ম্ম ওরা বুঝবে কি—তাদের ভাতারেরাই বুঝতে পারে না।

কৃষ্ণকমল এ কথায় প্রথম একটু সন্দেহ করিয়া বলিল, 'স্বর্ণকমল ত এমন ছেলে নয় যে আমাদের গাল দেবে?'

মুক্ত। সাধে কি বলি? তোমার সোণার ভাই! মুখে একটু 'দাদা দাদা' বলে, আর আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাও, মনে কর, তোমাদের কত সম্মান করে। ওদের মুখে অমৃত, মনে বিষ, তা জেন। ওদের মনের কথা বুঝতে পার না, তবে এত ছেলে পড়িয়ে মানুষ কর কি করে?

কৃষ্ণকমল স্ত্রীর মুখে আত্ম-প্রশংসা শুনিয়া মনে মনে আনন্দিত হইয়া বলিল, 'ওদের ঐ রকমই বটে! বিষকুম্ভ পয়োমুখঃ। ইংরেজী পড়লে ঐ রকম হয়ে থাকে।'

মুক্তকেশী আশ্বস্ত হইয়া বক্তৃতা ধরিল, 'এখন মনে কচ্ছ, ছোট ভাই ইংরেজী পড়ে ন্যাবক হয়ে জজীয়তী পাবে, আর কত সুখে থাকবে। সে গুড়ে বালি জেন। ঐ মুখেই যত মিষ্টি কথা, কাজের বেলা দেখবে ঠিক বিপরীত। ওরা তোমাদের মত পাড়াগেঁয়ে মুক্খু নয়, ওদের মাগ্‌ই সর্ব্বস্ব। মাগ্‌ যা বল্‌বে, তাই ওদের বেদের মোন্তর। বিপদের সময় যে একটী পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে, তা মনে করো না। বাপ্‌ রে। কথা গুলো মনে হলে এখনও আমার গা কেঁপে উঠে।'

কৃষ্ণকমল। স্বর্ণকমল আর কি বল্লে?

মুক্তকেশী। বল্লে, 'তোমার কাপড় ছিঁড়ে দেয় এত বড় আস্পর্দ্ধা। তুমি ওদের কাপড় ছিঁড়ে দিতে পার না?' তার পর ছোট-বৌ হেসে হেসে বল্লে, 'তা, আমি কি আর ছাড়ি?

কাউকে দেখ্‌তে না পেলেই ওদের কাপড় ছিঁড়ে টুক্‌রা টুক্‌রা করে দি।'

স্ত্রীর কথা শুনিয়া কৃষ্ণকমল মস্তক নাড়িতে লাগিল, মুক্তকেশী পুনরায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিতে লাগিল,

'তুমি ত মনে কর আমার নিজের দোষেই এত কাপড় লাগে, আমার কথা বিশ্বাস কর না। বল দেখি, এমন তর কল্লে আমার কি দোষ?'

কৃষ্ণকমল পূর্ব্ববৎ মস্তক নাড়িয়া বলিতে লাগিল,

'তাই ত, আজ আমি সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি। বছরে ছ জোড়া, সাত জোড়া কাপড় দেওয়া হয়, তবু নেকড়া বই পর না, তার উপর আবার আমার কাপড় দু চারি খানা না দিলে তোমার চলে না! মিছামিছি এমন শত্রুতা কল্লে, তোমার দোষ কি? বাবা ত এ বিষয়ে কত কথা বলেন। শীঘ্রই এর একটা কিছু কত্তে হবে। তার পর?'

মুক্ত। তার পর ঠাকুরপো বল্লে, 'শুধু কাপড় ছিঁড়ে দিলে ওদের আক্কেল হবে না। যেমন মুক্ষু ভাতার, হিংসুটে মাগ, ওদের তেমনি আচ্ছা করে জুতিয়ে না দিলে হবে না।

কৃষ্ণকমল এবার গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল,

'এত বড় কথা। দু পাতা ইংরেজী পড়ে যাকে তাকে মুক্ষু বলা, আর জুতো মারা! বসো, মজা দেখাচ্ছি।'

মুক্তকেশী এবার পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বলিল,

'আমাদের ভাতার মুক্ষু থাকে আর পণ্ডিত থাকে, তাঁতে ওর মাথা ব্যথা হলো কেন? আমরা কি ওর খাই, না ওর পরি? না, ওর কোন প্রত্যাশা রাখি? সোয়ামী খেতে দেয় খাব,

না হয় উপস্ করে থাক্‌ব। এমনতর করে আমাদের সোয়ামী তুলে গালাগালি দেবার ওরা কে?

কৃষ্ণকমল। দু পাতা ইংরেজী পড়ে এত অহঙ্কার। আমার কত ছাত্র বড় বড় চাকরী পেয়েছে। আমায় দেখ্‌লে তারা এখনও মাটিতে পড়ে প্রণাম করে, আর ও কি না, মায়ের পেটের ভাই হয়ে এসব কথা বলে? আচ্ছা, দেখা যাবে।

মুক্তকেশী নাসিকা ও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'সুধু কি এই? আরও কত কি বল্লে। আমি সরল মানুষ, সব কথা মনে রাখ্‌তে পারি না। আর তা শুনেই বা কি হবে?'

কৃষ্ণ। কাঁদা কাটার কথা বলছিলে—বৌ কাঁদলে কেন?

মুক্ত। তুমি নাকি ছোট-বৌকে করে জুতো মার্ত্তে চেয়েছিলে, তাই কাঁদল।

কৃষ্ণকমল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'ছি! ছি! ছি! আমার নামে এসব মিথ্যা কথা! যত সব ছোট লোকের মেয়ে—'

মুক্ত। সোণার ছোট-বৌ, ছোট লোকের মেয়ে হ'তে যাবে কেন। তুমি ত আমার কথা শুন্‌বে না, মনে কর আমি সব মিথ্যে বলি। যাই ভাব, তা নিশ্চয় জেনো, প্রাণ গেলেও তোমার কাছে মিথ্যে বলব না।

কৃষ্ণ। এতদিন আমি তোমার কথায় তত কাণ দি নাই, ভিতরে ভিতরে এত কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে, তাও জান্‌তে পারি নাই! আজ তুমি আমার বড় উপকার কল্লে। শীঘ্রই এর একটা কিছু করে ছাড়ব।

মুক্ত। তুমি কি আর তা পারবে? রাত পোহালেই তোমার বুদ্ধি বিগ্‌ড়ে যাবে। একবার 'দাদা' বল্লেই সব ভুলে যাবে।'

কৃষ্ণ। আর না—আর মিষ্টি কথায় ভুলি না—আমি সব বুঝতে পেরেছি।

মুক্তকেশীর জয় হইল। সে মনে মনে নিজ বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল। ভবিষ্যতে কোন্ কৌশলে সেনাপতিকে যুদ্ধে পাঠাইবে, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। পর দিন প্রাতঃকালে একবার বড-দিদির সহিত বিশেষ পরামর্শ আঁটিতে হইবে, সিদ্ধান্ত করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পিতা পুত্র।

কালীকান্ত রায় মহাশয় বড সদাশয় ব্যক্তি। সদ্ব্যয়, সাধু-ব্যবহার, সজ্জনানুরাগ ও ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য গঙ্গাতীর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে রায়মহাশয়ের বিশেষ খ্যাতি। তিনি বিপন্নগণের পরম সুহৃদ্। পিতৃ-মাতৃ-দায়গ্রস্ত, গৃহদগ্ধ বা দুঃখ-দারিদ্র্যপীডিত ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়া কখনও একবারে বিমুখ হয় না। আপন শক্তি, সামর্থ্যানুসারে তিনি সকলকেই সাহায্য করিয়া উপকৃত করেন, পরোপকারব্রত পালনে তাঁহার অপার আনন্দ। কখন কোন প্রকারে পরের উপকার করিতে পারিলে তাঁহার গম্ভীর মুখ প্রফুল্ল মূর্ত্তি ধারণ করে। এই পুণ্যব্রত পালনে তাঁহার অনেক সময় শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, কিন্তু এই ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া তিনি কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করেন না। গ্রাম্যবিবাদ বিসম্বাদে রায়

মহাশয় মধ্যস্থ হইয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত, প্রায় আদালতের সিদ্ধান্তের ন্যায় প্রামাণ্য। কেহই তাঁহার আদেশ লঙ্ঘনে সাহসী হয় না। স্বাভাবিক বুদ্ধি, সাংসারিক অভিজ্ঞতা, ও লোক-চরিত্রপরিজ্ঞান বলে তিনি সকল বিষয়েই সুপরামর্শ দাতা। মোকদ্দমাকারিগণ, বিবাহ প্রদানেচ্ছু স্থূলবুদ্ধি পিতা, কিম্বা বিধবা জননী, উইল-করণেচ্ছু সঙ্গতিপন্ন বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেই রায় মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসে। ইহার উপর, রায় মহাশয় সদ্বংশজাত ও ধনবল সম্পন্ন। সুতরাং ঐ অঞ্চলের মধ্যে তিনি একজন গণ্য মান্য ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইলেন।

এই সর্ব্বত্রব্যাপী সম্মান সঞ্চিত অর্থবল, সচ্চরিত্রা অনুরক্তা প্রিয়তমা ভার্য্যা এবং সন্তান সন্ততিগণ ও তাঁহাকে সুখী করিতে পারিল না। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে কালিমা পড়িয়াছে, তিনি সুখেও সুখ বোধ করিতে পারিতেছেন না। আহারে তৃপ্তি নাই, নিদ্রায় শান্তি নাই। পারিবারিক বিবাদ বিসম্বাদে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। রায়-পরিবারের ঝগড়া বিবাদ না দেখিয়া, একটী দিনও সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করেন না। বড়-বৌ মহামায়া ও মেজ-বৌ মুক্তকেশী কোন দিন শ্বশ্রূঠাকুরাণীর উদ্দেশ্যে, কোন দিন সুকুমারী বা স্বর্ণকমলের উদ্দেশ্যে, কোন দিন পরস্পরে, আর কোন দিন বা নিরুদ্দেশ্যে ঝগড়া করিয়া থাকে। রামকমল জানিয়া শুনিয়াও ইহাতে বরং প্রশ্রয় দেয়! তাহার বিশ্বাস, ঝগড়া যত গাঢ় হইবে, তত শীঘ্র ভ্রাতৃ-বিরোধ উপস্থিত হইবে, তত শীঘ্র পরস্পর পৃথকান্ন হইবার সুযোগ ঘটিবে। আর একবার পৃথকান্ন

খানায় অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে স্বর্ণকমলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। স্বর্ণকমল আসিয়া পিতৃ-মুখ হইয়া বৈঠকখানার একপ্রান্তে বসিল। কিয়ৎক্ষণ পর রায়-মহাশয় একটী উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,

'স্বর্ণকমল! তোমার ছুটী ফুরাইয়া আসিল, তুমি আর দু দিন বাদে চলে যাবে। তোমাকে রোজই একটা কথা বল্‌ব ভাবি, কিন্তু বলা হয় না। পাঠ্যাবস্থায় সংসারের চিন্তা প্রবেশ কল্লে পাঠের ব্যাঘাত হয়, কিন্তু কি কর্‌ব, না বল্লেও চলে না, তাই বল্‌তে হচ্ছে। সংসারের অবস্থা ত দেখ্‌ছ, এর কি কর্‌বে?

স্বর্ণকমল মাটীর দিকে চাহিয়া বলিল,

'আপনি যা কর্‌বেন, তাই হবে, আমরা আর কি কর্‌ব?',

পিতা। আমার ভগ্ন-শরীর, বয়সও হয়েছে—ক-দিন আর বাঁচব। তোমার দাদাদের কাণ্ড দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়েছি।

স্বর্ণকমল উৎকর্ণ হইয়া পিতৃ-বাক্য শুনিতে লাগিল, কোন উত্তর প্রদান করিল না। রায়-মহাশয় বলিলেন,

'পিতা বলে মান্য করা দূরে থাক্, বয়ঃবৃদ্ধ বলেও একটু সম্মান করে না। যা বল্‌ব, তার বিপরীত কর্‌বে, যেন আমি ওদের চির-শত্রু! হিতাহিত জ্ঞান নাই, যা-ইচ্ছে তাই করে। এ পরিবারের সম্মান যে বজায় থাক্‌বে, এমন বোধ হয় না।' বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ আরও গম্ভীর হইল। 'তুমি অধিকাংশ সময় কলিকাতায় থাক, সংসারের খবর রাখ না, কিন্তু যে অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সকল কথাই তোমার এখন কিছু কিছু জানা উচিত।'

তারপর একটু থামিয়া আবার বলিলেন, 'তোমার বড়দাদা রামকমল বড় কুটিল, স্বার্থপর আর অর্থপিশাচ। অর্থের জন্য সে না কত্তে পারে, এমন কাজ নাই। এই লোভে ওর সর্ব্বনাশ হবে। আমি অনেক বলিয়াছি, কিন্তু তাহাতে ওর সুমতি হইল না——'

স্বর্ণকমল ধীরে ধীরে বলিল,

'হয়ত কিছুদিন বাদে, ঐ দোষটুকু সেরে যাবে।'

পিতা। ঐ দোষ 'টুকু' বলছো। না, না। ইহা ক্ষুদ্র দোষ নহে। হতভাগা লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছে। আমি সে দিন উহাকে বলিলাম যে, এরূপ করা তোমার উচিত হচ্ছে না—যা কিছু করেছ সংসারে দাও, নতুবা ইহাতে ভ্রাতৃ-বিরোধ উপস্থিত হতে পারে। উত্তরে সে বল্লে, 'কৈ না। আমার কাছে টাকা কোথা থেকে আসবে?' আমি শুনে অবাক। এখন থেকেই সে তার পথ দেখ্ছে, ভাইদের ঠকাবার ফিকির কচ্ছে। এরূপ দুর্বুদ্ধি হ'লে কি সে সংসারে লক্ষ্মী থাকে? অর্থ লোভে যে আপনার ভাই বোনকে ঠকাতে পারে, সে সব কত্তে পারে। এরূপ কুটিল, অর্থলোভী মানুষ কখনও সংসারে সুখী হ'তে পারে না। আর জেনো, যে পরকে ঠকাবার উপায় খুঁজে বেড়ায়, সে আজ হউক, কাল্‌ হউক, নিজেই প্রতারিত হয়।

স্বর্ণকমল পিতার বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিল, একটী ছোট নিশ্বাস ত্যাগ করিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না। রায়-মহাশয় বলিতে লাগিলেন,

'আর মেজ কৃষ্ণকমল, সে ত গণ্ডমূর্খ। ভাল মন্দ, বোধ নাই, বৌমা যা বলে দেবে, তাই ওর বেদের মোন্তর। এরা

দুভাই আমার সোণার সংসারে অলক্ষ্মী প্রবেশ করিয়েছে। এদের যদি বুদ্ধি থাক্‌ত, তবে বৌ-মারা এরূপ কত্তে পাত্ত না, আমার সংসারও এমন হতো না। জান্‌বে, যে বাড়ীতে মেয়েমানুষের শাসন নাই, সে বাড়ীতে লক্ষ্মীও নাই। মেয়েমানুষ শাসনে থাক্‌লে দেবীতুল্য হয়, আর শাসন-বহির্ভূত হলে নরকের কীটের চেয়ে অধম হয়। ইহারা তাহা বুঝিল না—ইহার ফলও এক দিন ভুগিতে হবে। আর শাসন করবে কি, ভগবান এদের সে বুদ্ধি আর ক্ষমতা দেন নাই। ফলতঃ, বৌ-মাদের চরিত্রে আমি মর্ম্মাহত হইতেছি, আমার আর এক মুহূর্ত্ত এ সংসারে বাস কত্তে ইচ্ছা হয় না। আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, আর পারি না। প্রতিদিন চক্ষের সাম্‌নে সব দেখ্‌তে পাচ্ছ—আমি আর বল্‌ব কি?' বলিতে বলিতে তাঁহার মূর্ত্তি অধিকতর বিষণ্ণ হইল।—'যাক সে কথা—আজ যাহা বলিলাম, মনে রাখিও, মানুষ চিনিতে চেষ্টা কর, নতুবা পদে পদে বিপদে পড়িবে। আমার মান সম্ভ্রম—যাহা কিছু আছে তাহা বজায় রাখিবার ভার তোমার উপর অর্পণ করিলাম। তোমরা সব বুঝে, সুঝে নাও, আমরা কাশী ধামে চলে যাই।'

স্বর্ণকমল পিতৃ-বাক্য শুনিয়া দুঃখিত হইল। রায়-মহাশয় যে মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইতেছেন, তাহা বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না। কৃষ্ণকমল পাঠশালা হইতে আসিল, দেখিতে দেখিতে রামকমলও আসিল। পিতৃ-আজ্ঞা ক্রমে তাহারা স্বর্ণকমলের পার্শ্বে বসিল। অতঃপর রায়-মহাশয় সংসার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া উপসংহারে বলিলেন,

'তোমাদের তিন ভাইকে আর একবার বলিতেছি, পারি-

বারিক বিবাদ বিসম্বাদ যাহাতে আর না হয়, তাহা কর। নিজ নিজ স্ত্রীকে শাসন কর, আর যেন আমাকে প্রতিদিন গলাবাজি না শুনিতে হয়। আমার বাড়ীর ঝগড়া মিটাইতে পাড়ার লোক আসিবে, ইহা আমার অসহ্য। যদি তোমরা ইহা না পার, আমাকে স্পষ্ট বলিয়া দাও, বাড়ী ঘর পরিত্যাগ করিয়া যেথানে ইচ্ছা চলিয়া যাই।' বলিতে বলিতে রায় মহাশয়ের চক্ষু অশ্রু-পূর্ণ হইল, তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না। স্বর্ণকমল যাতনা পাইল। রামকমল, তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির সময় নিকট-বর্ত্তী হইয়াছে ভাবিয়া, মনে মনে আনন্দিত হইল। কৃষ্ণকমলের মনে কোনরূপ ভাবই হইল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

তিন ভাই—কৃষ্ণকমলের মন্ত্রপ্রযোগ।

সংসারের অবস্থা সম্বন্ধে স্বর্ণকমলের এখন অনেক জ্ঞান জন্মিযাছে। এখন আর তাহার পূর্ব্ববৎ উদাসীনতা নাই। কিরূপে ভ্রাতৃ-গণের মধ্যে পুনরায় সদ্ভাব ও প্রকৃত ভালবাসা জন্মিতে পারে, ভ্রাতৃ-বধূদ্বয়ের কুশিক্ষা ও হিংসামূলক কুপ্রবৃত্তি দূরীভূত হয়, কলহস্রোতঃ হ্রাস হয়, পারিবারিক-সম্মান ও সুনাম পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার অন্তরে এই চিন্তা প্রবেশ করিল। বড়দাদা, মেজদাদার উপর তাহার অতুল ভক্তি। তাহারা যে স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য একে অন্যকে প্রতারণা করিতে পারে, কিম্বা জানিয়া শুনিয়া আপন আপন স্ত্রীর জঘন্য ব্যবহারে প্রশ্রয় দিতে পারে, এই ধারণা তাহার পূর্ব্বে ছিল না। নানারূপ কার্য্য দেখিয়া,

এখন তাহার পূর্ব্ব-বিশ্বাস শিথিল হইয়া গেল। এতদিন তাহাদিগকে যে চক্ষে দেখিয়া আসিতেছে, এখন আর চেষ্টা করিয়াও সে চক্ষে দেখিতে পারেন না। তাহাদের কথা মনে হইলে বন্যার জলের ন্যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কথা তাহার মনে আসিয়া পড়ে, আর সে স্থির থাকিতে পারে না। বড় দাদা রামকমল তাহাদিগকে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে একটী স্বতন্ত্র, গুপ্ত তহবিল রাখিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া স্বর্ণকমল মনঃকষ্ট পাইল। লুক্কায়িত ধন-লোভে তাহার কোন কষ্ট হইল না—রামকমলের ধন-লোভ ও হীন-প্রবৃত্তির কথা মনে করিয়া সে ব্যথিত হইল। কৃষ্ণকমল পারিবারিক কলহে স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সময় সময় পিতামাতাকেও অতি কটু ও মর্ম্ম পীড়াদায়ক বাক্য বলিয়া থাকে, এ কথাও স্বর্ণকমল জানিতে পারিয়াছে। ভ্রাতৃ-বধূদের চরিত্রও দিন দিন অতি নীচ ও ঘৃণিত হইয়া পড়িতেছে। এ সকল কারণে স্বর্ণকমল মনে মনে ব্যথিত হইল এবং পারিবারিক-ব্যাধি দূরীকরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, স্থির করিল।

পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত পিতাপুত্রে কথোপকথনের পাঁচ ছয় দিবস পরে, স্বর্ণকমল একদিন সুযোগ বুঝিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট পারিবারিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিল,

'সে দিন বাবা যা ব'লেছেন, সে বিষয়ে আমাদের একটু মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা, দুশ্চিন্তায় ও আমাদের কুব্যবহারে মনঃকষ্ট পাইয়া তিনি আরও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িতেছেন। তাঁর মনে যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয়, আমাদের প্রাণপণে সে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।'

রামকমল স্বভাবতঃ কঠিন-প্রাণ ও নির্ম্মম। অনাবশ্যক রূপে রূঢ় কথা বলিয়া কাহাকে মনঃকষ্ট প্রদান করিতে সে কখনও দ্বিধা বোধ করিত না। স্বর্ণকমলের কথায় সে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। মুখবিকৃতি করিয়া কর্কশ স্বরে বলিল,

'যেরূপ ইচ্ছা, কল্লেই ত হয়, অত বলাবলির প্রয়োজন কি ?—আমার এসব বাজে কথা ভাল লাগে না।'

স্বর্ণকমল অপ্রতিভ হইয়া বলিল, 'আমি কি কর্ত্তে পারি ? এ কাজ ত শুধু আমা হ'তে হ'তে পারে না। সকলে একমত হয়ে——' স্বর্ণকমলের কথা শেষ না হইতেই রামকমল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল,

'কার দোষে ঝগড়া বাধে তা তলিয়ে দেখ, তারপর শাসন কর্ত্তে যেও, অত এক-মত, দু-মত আমি বুঝি না।'

স্বর্ণকমল অবাক হইয়া কহিল, 'তাহা আমি একা দেখ্‌ব কেমন করে ?—আর দোষ সম্ভবতঃ কমবেশী সকলেরই আছে। এক জনের দোষে প্রায় ঝগড়া হয় না।'

স্বর্ণকমল সুকুমারীর দোষও একরূপ স্বীকার করিল দেখিয়া রামকমল মনে মনে প্রীত হইল, এবার সে মহামায়াকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী করিবার জন্য, নির্লজ্জের ন্যায় মুখভঙ্গী সহকারে, একটু তেজের সহিত বলিল,

'তা কেন হবে ?—একজনার দোষে কি ঝগড়া হতে পারে না ?—এ কি রকম কথা! তুমি দেখ্‌ছি সকলের ঘাড়েই দোষ চাপাতে চাও।'

স্বর্ণকমল বিরক্তির সহিত বলিল, 'দোষ চাপাচাপির কথা হচ্ছে না।' রামকমল পূর্ব্ববৎ তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল,

'দোষ চাপান বই আব কি? একজন আমাব ক্ষেতি কববে, কিম্বা আমাব অবুঝ ছেলেটি তোমাব সন্দেশটুকু মুখে দিল বলিযা তুমি তাকে মেবে খুন কববে, সেই দুঃখে দুটা কথা বল্লেই কি দোষ হবে?'

কৃষ্ণকমল এতক্ষণ চুপ কবিযাছিল। অনেকক্ষণ ধবিয়া সে মুক্তকেশী-প্রদত্ত শিক্ষাব ফল প্রসব কবিবাব জন্য ব্যস্ত ছিল। এইবাব অবসব বুঝিযা সে বলিল,

'আব এক জনেব আস্ত কাপড ছিঁডে দেবে, তাব উপব যা ইচ্ছে-তাই বল্‌বে, এতে কোন কথা বলেই ত' ঝগডা বেধে যায়।'

স্বর্ণকমলেব মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিযা পড়িবাব উপক্রম হইল। সে মনে মনে দুঃখিত হইযা বলিল,

'কে এসব কবে, তাব অনুসন্ধান কবে একটু শাসন কত্তেই ত বল্‌ছি।' কৃষ্ণকমল বামকমলেব মুখেব দিকে চাহিযা বলিল,

'তাব আব বলাবলি কি?—শাসন কল্লেই ত হয।'

রামকমল ভ্রূভঙ্গী করিযা বলিল, 'তা বৈ কি?'

স্বর্ণকমল বুঝিল যে, তাহাব দাদাদেব বিচাবে সুকুমাবীই সকল দোষেব আকব। মনে বড দুঃখ হইল। অগত্যা কাতব-কণ্ঠে বলিল, 'আন্দাজে কাকে শাসন কত্তে পাবা যায?'

কৃষ্ণকমল একটু ক্রোধের সহিত বলিল,

'আন্দাজে কি কবে হলো, কে এসব কবে, তাকি তুমি জান না?'

স্বর্ণকমল। 'কৈ, তা ত ঠিক জানি না।'

স্ত্রীবুদ্ধি-চালিত কৃষ্ণকমল বলিল,

'তা এখন জান্‌বে কেন! শিখিযে দেবার বেলা সবই জান!

তোমাদের ঐ রকমই, 'বিষকুম্ভ পয়োমুখঃ।' ইংরেজী পড়্‌লে ঐ রকমই হয়—মিথ্যা কথা বল্‌তে একটু আট্‌কায় না!

কৃষ্ণকমলের বাক্যে স্বর্ণকমলের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল, মর্ম্মযাতনায় তাহার প্রাণ পুড়িয়া যাইতে লাগিল। অভিমানে ও দুঃখে চক্ষু হইতে সত্যসত্যই অশ্রুধারা বহির্গত হইল। ভ্রাতৃদ্বয়ের অজ্ঞাতে স্বর্ণকমল বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিল। কিন্তু তাহার হৃদয়ের বেগ প্রশমিত হইল না। তাহাকে মিথ্যাবাদী, কপটাচারী ভাবিয়া কৃষ্ণকমল এরূপ ঘৃণিত ব্যবহার করিল দেখিয়া তাহার দারুণ ব্যথা লাগিল। সংসারে অনভিজ্ঞ, সরলপ্রকৃতিক, মর্ম্মপীড়িত যুবক কাতর কণ্ঠে পুনরায় বলিল,

'মেজদাদা! এরূপ কথা কেন বলিতেছ? আমি ত কখনও কোন মিথ্যা কথা বলি নাই, আর এ জীবনে কখন কাহাকে পরের কাপড় ছিঁড়িয়া দিতেও উপদেশ দেই নাই।'

স্বর্ণকমলের সরল কাতরোক্তি শ্রবণে কৃষ্ণকমলের অন্তঃকরণ একটু নরম হইল, মুক্তকেশীর কথার সত্যতা সম্বন্ধেও তাহার একটু সন্দেহ হইল, কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য মাত্র। মুক্তকেশী যে তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, 'একবার 'দাদা' বলিলেই তুমি সব ভুলিয়া যাইবে' সে কথাও তাহার মনে পড়িল। এখন একটু কঠিন হইতে না পারিলে, মুক্তকেশীর কথা সত্য হইবে, মুক্তকেশী তাহাকে দুর্ব্বলহৃদয় ও বোকা বলিয়া তিরস্কার করিবে, এই সমস্ত কথা প্রবল স্রোতের ন্যায় হুঁ হুঁ করিয়া তাহার মনে আঘাত করিতে লাগিল, কৃষ্ণকমল হৃদয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া চলিল। মুক্তকেশী ও মহামায়ার আড়ালে থাকিয়া পরের কথা

শুনিবার রোগ প্রবল ছিল। বহির্ব্বাটীতে বা যে কোন স্থানে যখন যে কথা হইত, তৎক্ষণাৎ তাহারা তাহা জানিতে পারিত, কৃষ্ণকমল ও রামকমল এ কথা জানিত। প্রলয়কারিণী-স্ত্রী-বুদ্ধি চালিত কৃষ্ণকমল মুক্তকেশীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্বর্ণকমলের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্দ্দয় হইয়া ক্রোধের সহিত বলিল,

'আর দাদা বলে কাজ নেই—আমি সব জানি! আর তোমাকে আর একটী কথা বলে দিচ্ছি, ঘরে বসে অমনতর করে আর 'জুতো জুতি' কর না। ফের ও সব কথা বল্‌বে ত রক্তবৃষ্টি হয়ে যাবে—আমার স্পষ্ট কথা।'

কৃষ্ণকমলের উক্তি শুনিয়া স্বর্ণকমল একবারে হতবুদ্ধি ও বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িল। কিয়ৎকাল তাহার বাক্য স্ফুরণ হইল না। কিরূপে তাহার দাদা এইরূপ ভ্রমপূর্ণ ধারণার বশবর্ত্তী হইল, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। অতঃপর ম্লানমুখে, কাতর-কণ্ঠে, অথচ একটু তেজের সহিত বলিল,

'মেজদাদা! তুমি হয়ত কোন কুলোকের কথা বিশ্বাস করিয়া আমাকে এসব কথা বলিতেছ। আমি কি এমনই নরাধম, পাষণ্ড। তোমার কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখ বোধ হইতেছে। দাদা। তোমার পায়ে পড়ি, বল, কে আমার নামে এসব ভয়ানক মিথ্যা কথা বলেছে।'

স্বর্ণকমল ব্যাকুলতার সহিত সত্য সত্যই কৃষ্ণকমলের পাদ-স্পর্শ করিল, তাহার সুন্দর মুখশ্রী রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কৃষ্ণ-কমল প্রাপ্তমন্ত্র প্রয়োগের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প। স্বর্ণকমলের কাতরকণ্ঠ নিঃসৃত সরলোক্তি শ্রবণে, তাহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হওয়া মাত্রই মুক্তকেশীর মূর্ত্তি তাহার মন-পটে অঙ্কিত হয়, আর তৎ-

ক্ষণাৎ সে, চকিতের ন্যায়, বলপূর্ব্বক হৃদয় হইতে দয়ার ভাব দূর করিয়া দিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। স্বর্ণকমলের হস্ত হইতে আপনার পা ছিন্ন করিয়া সে সক্রোধে বলিল,

'থাক্, আর ভালবাসায় কাজ নাই। দু'পাতা ইংরেজী পড়ে অত অহঙ্কার ভাল দেখায় না। অমন বিদ্যে অনেকের থাকে, তা বলে তারা যাকে তাকে অত জুতো মারে না, অমনতর কথাও কয় না।' তারপর একটু থামিয়া কৃষ্ণকমল আবার বলিল, 'আর বলা হচ্ছে কি না, আমরা মিথ্যাবাদীর কথা শুনে বল্‌ছি। তা, মিথ্যে বৈ কি, আমরা যা বলি সব মিথ্যে, উনি দুজনে যা বলেন তাই ঠিক।

স্বর্ণকমলের বুদ্ধি লোপ হইল, আশা ফুরাইল, আর কথা সরিল না। ভ্রাতৃদ্বয়ের মূর্খতা ও বুদ্ধিহীনতার বিষয় ভাবিয়া সে মনে মনে লজ্জিত ও দুঃখিত হইল। পুনরায় তাহার চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল। মনের অস্থিরতা একটু প্রশমিত করিয়া, অনিচ্ছার সহিত, অনন্যোপায় হইয়া, রামকমলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,

'বড় দাদা! তুমি ইহার বিচার কর, যদি আমি কোনরূপ দোষী হই, তুমি শাসন কর। এই মিথ্যা কলঙ্কে আমার প্রাণ পুড়িয়া যাইতেছে—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি বিচার কর।'

রামকমল তাহার স্বাভাবিক কঠিন কণ্ঠে বলিল, 'আমি এসব বিচারে টিচারে নেই। তোমাদের যা ইচ্ছে তাই কর।'

স্বর্ণকমল হতাশ হইয়া মনঃকষ্টে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল, কোন কথা কহিল না। কৃষ্ণকমল রামকমলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,

'দেখ্‌লে কেমন অহঙ্কার?'

গ্রন্থকারের নিবেদন।

র্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষায় লিখিত উপন্যাসের বড় একটা অভাব তবে, নিঃসঙ্কোচে আপন আপন ভাই ভগিনী, স্ত্রী পুত্র বা পিতা মাতার হস্তে প্রদান করা যাইতে পারে, বা সকলের াতে পাঠ করা যাইতে পারে, এরূপ উপন্যাস বড় অধিক নাই, থা বলিলে বোধ হয়, অন্যায় বলা হইবে না। এদিকে, শিক্ষা রের সঙ্গে সঙ্গে, স্ত্রীপুরুষ সকলেরই উপন্যাস পাঠের ত্তি বাড়িতেছে। ইহা বিবেচনা করিয়া, এই উপন্যাসপ্লাবিত সাহিত্যে আর একখানি নূতন উপন্যাস লইয়া উপস্থিত হইতে সী হইলাম। 'রায়-পরিবার' গার্হস্থ্য উপন্যাস। ইহাতে তরঞ্জিত বা অস্বাভাবিক কিছু নাই। বর্ত্তমান বঙ্গীয়সমাজে া ঘটিয়া থাকে, তাহারই একটি চিত্র এই পুস্তকে অঙ্কিত াছে। এই সামান্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া বঙ্গীয়সমাজ বিন্দুমাত্র াকৃত হইলেই আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক বোধ করিব।

হইয়া রায়-মহাশয়ের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে, সেই অমায়িকতা-ব্যঞ্জক গম্ভীর মুখ-শ্রীতে বিষণ্ণতার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে। পরগৃহের বিবাদ-ভঞ্জনে যিনি সিদ্ধ-হস্ত, নিজ গৃহে তাঁহার সিদ্ধ-হস্ততা বিফল হইল, তাঁহার সুকৌশল শান্তি স্থাপন করিতে পারিল না। যিনি সুমন্ত্রণাবলে অতি বিচক্ষণ রাজমন্ত্রীর ন্যায়, শত শত অশান্তি-পূর্ণ গৃহ-রাজ্যে শান্তি-স্থাপন করিয়াছেন, আজ স্বীয় গৃহে মন্ত্র-প্রয়োগ সময়ে তিনি সেই শান্তিপ্রদায়িনী মহামন্ত্র ভুলিয়া বসিয়াছেন! এই ভুলই পৃথিবীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।—সর্ব্বনাশই বা কেমন করিয়া বলিব? এই ভুলটুকু না থাকিলে যে, পৃথিবীর পৃথিবীত্ব থাকে না, কলির কলিত্ব থাকে না, সংসারীর সংসার-বোধ ও স্বার্থ-জ্ঞান থাকে না, পুনরায় সেই সত্যযুগ উপস্থিত হয়। তাই বুঝি অতি বিচক্ষণ-বুদ্ধি, প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণেরও সময় সময় এই ভুলটুকু দেখিতে পাই।

রায়মহাশয় স্বীয় পরিবারের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার সেই স্বাভাবিক কান্তি নাই—দিন দিন শরীর জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। সর্ব্বদাই মুখে চিন্তারেখা প্রতিভাত। প্রতি দণ্ডে ভৃত্যকে তামাক সাজিয়া আনিতে বলেন, ভজহরি তামাক সাজিয়া রাখিয়া যায়, কিন্তু তাঁহার হুঁকা ধরিতে মনে থাকে না, আগুন নিবিয়া যায়, আবার নূতন আগুন আসে, আবার নিবিয়া যায়! এই-রূপে দিনের পর দিন যাইতেছে, রায়-মহাশয় ভাবিয়া ভাবিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণ-কমলও মুক্তকেশীর কথোপকথনের দুই দিন পর, তিনি বৈঠক-

হইতে পারিলেই সে তাহার লুক্কায়িত ধন লইয়া সুখী হইতে পারিবে। মধ্যম কৃষ্ণকমল, অপেক্ষাকৃত সরলপ্রকৃতিক ও সহজ বিশ্বাসী। স্ত্রীপ্রদত্ত মন্ত্র লঙ্ঘন করিতে তাহার সাহস হয় না, কারণ তাহা হইলে মুক্তকেশী তাহাকে মূর্খ বলিয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। আর কৃষ্ণকমলের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সত্য সত্যই ছোট-বৌ এবং তাহার পক্ষ হইয়া তাহার জননী মুক্তকেশীর উপর অত্যাচার করেন এবং এরূপ অত্যাচার হয় বলিয়াই মুক্তকেশী ঝগড়া করিতে বাধ্য হয়। এজন্য সেও স্ত্রীকে শাসন করে না। এদিকে মহামায়া ও মুক্তকেশী 'এক-বুদ্ধি' হইয়াছে। বামকমলের যে কিছু অর্থ আছে, কৃষ্ণকমল ও মুক্তকেশী তাহা পরস্পর শুনিতে পাইত। মহামায়া মুক্তকেশীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিত যে, পৃথকান্ন হইলে এবং তাহাদের 'বুদ্ধিতে' থাকিলে, মুক্তকেশী সে ধন হইতে বঞ্চিতা হইবে না। মুক্তকেশী এ কথায় অবিশ্বাস করিত না, কৃষ্ণকমল ও বামকমলের মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইত। এ জন্য বামকমলও মহামায়ার ন্যায়, কৃষ্ণকমল মুক্তকেশীও পৃথকান্ন হইবার জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিল। কলহ-স্রোতঃ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। পূর্ব্বে রায়-মহাশয় বাড়ী থাকিলে বড় ঝগড়া হইত না, তাঁহার তিরস্কার ভয়ে একটু শান্তি থাকিত। এখন কেহ আর তাঁহাকে বড় গ্রাহ্য করে না তাঁহার সম্মুখে গলার স্বর পঞ্চমে চড়াইয়া ঝগড়া করিতে, কিম্বা সুকুমারী ও শ্বশ্রূঠাকুরাণী, এমন কি প্রয়োজনানুসারে স্বয়ং রায়মহাশয়কে পর্য্যন্ত গালাগালি করিতে বা দুর্ব্বাক্য বলিতে মহামায়া ও মুক্তকেশী ভীতা হইত না! মহামায়া বা মুক্তকেশীর একজন ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হইলেই অপর জন তাহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইত! স্বীয় পরিবারে হৃত-সম্মান

হইল। দীনেশচন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিয়া সহানুভূতি-সূচক স্বরে ধীরে ধীরে বলিল,

'এবার বাড়ীতে তত ভাল ছিলে না—তোমার চেহারা খুব খারাপ হয়েছে।'

স্বর্ণকমল একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,

'আর ভাল, মন্দ কি? মঙ্গলময় ঈশ্বরের সকল কার্য্যেই মঙ্গল। আমরা নাস্তিক, ঈশ্বরে ভক্তি-শূন্য, তাই তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনঃকষ্ট ভোগ করি।'

দীনেশচন্দ্র বুঝিল যে, স্বর্ণকমলের মনে কোন দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। বলিল, 'সুকুমারীর কোন অসুখ হয় নাই ত?'

স্বর্ণকমল বলিল, 'না,—'

দীনেশচন্দ্র জানিত যে স্বর্ণকমলের অন্তঃকরণ বড় কোমল, পিতা মাতার প্রতি তাহার অসীম ভক্তি, রামকমল কৃষ্ণকমলের পুত্র কন্যাগণের প্রতি, অকৃত্রিম স্নেহ। তাই জিজ্ঞাসা করিল, 'ননীগোপাল, সুশীলা, সরলা ভাল আছে?'

স্বর্ণ। হাঁ। কোন অসুখ দেখি নাই।

দী। তোমার বাবা, আর মা?

স্বর্ণ। শারীরিক কোন অসুখ দেখি নাই।

দী। মানসিক?

স্বর্ণ। মানসিক বড় যাতনা পাইতেছেন।

দী। কি যাতনা, ভাই?

স্বর্ণ। 'বলিতে দুঃখও হয়, লজ্জাও হয়। কিন্তু তোমাকে না বলিলেও মনে শান্তি পাই না।' বলিয়া স্বর্ণকমল থামিল।

দী। কি হয়েছে, আমায় খুলে বল। আমাকে পর ভেব না।

স্বর্ণকমল গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে পারিবারিক অবস্থা বলিতে আরম্ভ করিল। রামকমল, কৃষ্ণকমল ও ভ্রাতৃবধূগণের কুব্যবহার ও বিষবাক্যপ্রয়োগে কিরূপে বৃদ্ধ পিতা মাতা অপমানিত, লাঞ্ছিত, ও মনঃক্লিষ্ট হইতেছেন; কিরূপে শাসনবহির্ভূতা ভ্রাতৃ-বধূদ্বয়ের বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া সরলা সুকুমারী অশ্রুজলে ভাসিতেছে; কিরূপে শান্তি স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়া স্বর্ণকমল নিজে ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক ঘৃণা ও তাচ্ছল্যের সহিত ব্যবহৃত ও মিথ্যাবাদী, কুপরামর্শদাতা ইত্যাদি অভিধানে অভিহিত ও তিরস্কৃত হইয়াছে ইত্যাদি একে একে সকল কথা বলিয়া উপসংহার করিল,

'আর ভাই সুখ নাই,—তার বাড়ী যাইতে ইচ্ছা হয় না। পিতা মাতার বিষণ্ণ মূর্ত্তি আর চক্ষে জল দেখিলে আমার প্রাণ অস্থির হয়, তাঁহাদের কথা মনে হ'লে সেই অশান্তিপূর্ণ গৃহে যাইবার জন্যই আমার মন কাঁদিয়া উঠে।'

দী। কি জন্য এরা এরূপ কচ্ছে?

স্বর্ণ। তা, কি ক'রে জান্‌ব?

দী। প্রতিদিনই কি ঝগড়া হয়?

স্বর্ণ। প্রতিদিন কেন?—প্রতি মুহূর্ত্তে।

আনুপূর্ব্বিক সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দীনেশচন্দ্র সকল অবস্থা বুঝিল, স্বর্ণকমলের অবস্থা চিন্তা করিয়া দুঃখিত হইল। বলিল,

'এরূপ হইবারই কথা। বলিলে ভাই, দুঃখিত হবে, তোমার বড়দাদা, মেজদাদা নেহাত অশিক্ষিত। তার উপর আবার কখনও সভ্যসমাজে বেরোয় নি। চিরটা কাল ঐ পাড়া-

গেঁয়ে চাসাভুসোর সঙ্গে কথাবার্ত্তা, আলাপ ব্যবহার, মেশামিশি করে, উহাদের চরিত্র, ব্যবহারও অনেকটা ঐরূপ হয়ে গেছে, এরূপ নীচ সংসর্গে যারা সর্ব্বদা চলাফেরা করে, তাহাদের চরিত্রে মহত্ত্ব বা উদারতা থাকিবে কিরূপে? স্ত্রীকে উপদেশাদি প্রদান করিয়া কিরূপে শাসন রাখিতে হয়, তাহা ত তারা জানে না। আর স্ত্রীলোক উশৃঙ্খল, শাসনবহির্ভূত হইলে যে ভবিষ্যতে অমঙ্গল ঘটে, পুত্র পরিবারের ইহকাল পরকাল মাটী হয়, তাহা বুঝিবার শক্তি ইহাদের নাই।'

স্বর্ণকমল দুঃখিত হইয়া বলিল,

'ছেলেমেয়ে গুলির প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, তা শুন্‌লে তুমি অবাক হবে। ওদের পরের গাছের শশা, কুল, আম ইত্যাদি চুরী করে আন্‌তে শিখিয়ে দেয়—না আন্‌লে প্রহার করে। এক দিন আমি নন্দগোপালকে এজন্য একটু শাসন করেছিলুম, দুই একটী চড়ও মেরেছিলুম, এজন্য ভাই, বড় বৌ আমাকে দুই ঘণ্টা ক্রমাগত গালাগালি দিতে লাগ্‌লো। বল্লে, "আদর করে একটী জিনিষ দেবার বেলা ... না, পরের ছেলেকে মেরে খুন করবার বেলা অ ... ায।" আমি শুনে অপ্রস্তুত হলুম, বড়দাদাকে এ ... তনি গ্রাহ্য কল্লেন না।'

দীনেশচন্দ্র স্থিরভ ... 'তা ত হইবারই কথা। ভবিষ্যতে যা ব্যবসা ক' ... ়, পিতা মাতা সন্তানকে তা শিখিয়ে না দিলে যে ত ... ব্য কাজ করা হয় না। তুমি তাদের সৎকাজে বাধা দি ... গাল খাবে বৈকি! এর জন্য পরে যে কত কাঁদতে হবে, ততটুকু বুঝিবার শক্তি ওদের নাই। তোমার বড় দাদার কথা মনে হ'লে, এখনও আমার হাসি পায়।

গ্রীষ্মের ছুটীর সময় যখন আমি তোমাদের বাড়ী গিয়েছিলুম, আমার সঙ্গে কয়েকখানি সংবাদপত্র ছিল। আমি অবকাশ মত উহা পাঠ করিতাম। তাহা দেখিয়া তোমার বড়দাদা এক দিন আমায় গম্ভীর ভাবে বল্লেন, 'এসব পড়ে আপনার কি লাভ হয়?—কেন আপনারা এসব পয়সা ব্যয় করেন?' আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, 'দেশের খবর, অবস্থা ইত্যাদি জানিতে পারা যায়, বহুজ্ঞান জন্মে।' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, 'আমরা যে এসব পড়ি না, আমাদের কি ক্ষতি হয়? আর দেশ বিদেশের খবর জানা জানিতে লাভ কি? আপনার ঘরের অবস্থা জেনে শুনে কাজ কত্তে পাল্লেই হ'ল।' আমি মনে মনে হাসিলাম, কোন উত্তর প্রদান করিলাম না। এরূপ যার বুদ্ধি, সে আর পুত্র কন্যার কুকর্ম্মে শাসন করবে কি? বিনা পয়সায় শশাটা, কলাটা পাইলে সে বরং আরও পুত্র কন্যার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে।'

স্বর্ণ। হইতেছেও তাই। কাণ্ড দেখে আমার বুদ্ধি লোপ হচ্ছে। ভবিষ্যৎ ভেবে আমি আকুল হই। আর বাড়ীতে যেতেও ইচ্ছে হয় না।

দী। তোমার চেষ্টায় না। তুমি ঠিক বলিলে, উহারা বিপরীত বুঝি দাদার। স্ত্রীবুদ্ধি-পরিচালিত হ'য়ে, যখন এরূপ জ করতে আরম্ভ করেছে, তখন আর উপদেশে কোন ফ সুতরাং তোমার নিরস্ত হওয়াই উচিত। এই কুশিক্ষা ানগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত হ'য়ে যখন নিজ পিতামাতার বিরুদ্ধে রণ করিবে, পিতামাতার বুকে পাষাণ চাপাইতে চাহিবে, চৌর্য্য, লাম্পট্য ইত্যাদি অভিযোগে যখন রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবে—পিতামাতাকে অশেষ প্রকারে

রাম। তা আর দেখ্‌ব কি—আমার জানা-ই আছে। নিজের স্ত্রীকে শাসন কত্তে পারেন না—ভারি ত বিদ্যে!

রামকমল, কৃষ্ণকমল দুই ভ্রাতার প্রত্যেক বিষয়ে মতের মিল হইল। ধূর্ত্ত রামকমল মনে মনে ভাবিল যে, স্বর্ণকমল ও কৃষ্ণকমলে একটা ঝগড়া বাধাইয়া দিতে পারিলে, লোকের নিকট সে নির্দ্দোষী থাকিবে, শীঘ্র পৃথকান্ন হইবারও একটা সূত্র হইবে। কিন্তু সে মনে মনে জানিত যে, স্বর্ণকমল বুদ্ধিমান ও উদারপ্রকৃতি-বিশিষ্ট। তাহার নিকট তাহার কৌশল খাটিবে না। এ জন্য সে স্থূলবুদ্ধি কৃষ্ণকমলের ঘাড়ে চাপিল। কৃষ্ণকমল তাহার বাহ্যিক ভালবাসা ও সহানুভূতিতে মুগ্ধ হইল এবং তাহার উপদেশ ও পরামর্শানুসারে কলহস্রোতঃ বাড়াইতে লাগিল।

সেই দিন হইতে স্বর্ণকমলও তাহার আপন ক্ষমতা বুঝিল. মেজদাদার বুদ্ধির দৌড় কত তাহা বুঝিল, পাকা বাঁশ নোয়ান যে অসাধ্য তাহা বুঝিল, আর বুঝিল যে—বিনা কারণেও ঝগড়া বিবাদ হইতে পারে, মূর্খের পক্ষে সবই সম্ভব। পিতা ও সুকুমারীকে সকল কথা বলিল এবং রাম-পরিবারের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে চিন্তামগ্ন হইল। দেখিতে দেখিতে তাহার কলেজ খুলিবার দিন নিকটবর্ত্তী হইল। সুকুমারীকে নানারূপ সদুপদেশ প্রদান করিয়া, পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ ও ভ্রাতৃ-বধূ চরণে প্রণাম করিয়া সে কলিকাতা চলিয়া গেল। ভ্রাতৃ ও ভ্রাতৃ-বধূ চরণে প্রণাম করিতে এবার তাহার ভক্তি হয় নাই, সমাজের খাতিরে পদধূলি গ্রহণ করিয়াছিল মাত্র।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দুই বন্ধু।

স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্র সমপাঠী। সাত বৎসর এক বিদ্যালয়ে এক শ্রেণীতে পাঠ করিয়া, উভয়ে একই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এখনও এক সঙ্গেই পাঠ করিতেছে। ক্রমাগত সাত বৎসর একসঙ্গে বিদ্যালয়ে গমন, এক সঙ্গে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন, একসঙ্গে ভ্রমণ, ছুটীর সময় একত্র বাড়ী গমন হেতু বন্ধুত্ব ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়াছে। তারপর, স্বর্ণকমলের ভার্য্যা সুকুমারী দীনেশচন্দ্রের প্রতিবেশী কন্যা, গ্রাম-সম্পর্কে ভগিনী। সুকুমারী দীনেশচন্দ্রকে 'দাদা' বলিয়া ডাকে। এ দিকে, দীনেশচন্দ্রের প্রিয়তমা ভার্য্যা গিরিবালা স্বর্ণকমলের জ্ঞাতি-ভগিনী। উভয়ের অবস্থারও কতক সমতা আছে। দীনেশচন্দ্র সম্ভ্রান্ত বংশজাত, জমীদারপুত্র। স্বর্ণকমল দীনেশচন্দ্রের ন্যায় ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ না করিয়া থাকিলেও, দরিদ্রতা কাহাকে বলে, তাহা বড় জানিতে পারে নাই। উভয়ের বাড়ী উভয়ের যাতায়াতও ছিল। এই সমস্ত কারণে পরস্পর পরস্পরের প্রিয়-সুহৃদ হইয়াছে, এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর উভয়ে পটলডাঙ্গার এক বাসাবাড়ীতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছে।

স্বর্ণকমল কলিকাতা পৌঁছার পর দিন অপরাহ্ণে দুই বন্ধু এক সঙ্গে গড়ের মাঠে বেড়াইতে গেল। দীনেশচন্দ্র পারিবারিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। স্বর্ণকমলের সদাপ্রফুল্ল মুখ বিষণ্ণ

মিটে নাই। জামাতাকে নিজগৃহে আনিয়া স্বহস্তে, দরি৮-
শাকান্ন রাঁধিয়া খাওয়াইবেন স্থির করিলেন।

দীনেশচন্দ্র মনে মনে জানিতেন যে তাঁহাকে এবার এক-বার শ্বশুরালয়ে যাইতে হইবে। সে জন্য তিনি প্রস্তুতও হইতে-ছিলেন। এমন সময় শ্বশুর জামাতাকে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইতে আসিলেন। সেকেলে কোন সম্পন্ন লোক বোধ হয় এরূপ ভাবে শ্বশুরগৃহে যাওয়া অপমানজনক বোধ করিতেন। দীনেশচন্দ্র কিন্তু নিরাপত্যে শ্বশুরগৃহে গেলেন। দশটি টাকা প্রণামী প্রদান করিয়া শাশুড়ীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। শাশুড়ী একখানি ঢাকাই ধুতি, একখানি উড়ানি ও ঐ টাকা দশটি আশী-র্ব্বাদস্বরূপ প্রদান করিয়া দীনেশচন্দ্রের মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে হস্ত বুলাইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তেত্রিশ কোটী দেবতার নিকট জামাতার মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। এদিকে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে আজ আন-ন্দোৎসব হইল। গিরিবালার পিতা, মাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্র ও কনিষ্ঠা ভগিনী চারুশীলা প্রভৃতি সকলে আনন্দে মত্ত হইল। গিরিবালার সঙ্গে তাঁহার স্বামীর বাড়ী হইতে একজন ভৃত্য ও একজন পরিচারিকা আসিয়াছিল। উহারা তাহাদের 'বাবুকে' দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইল। দ্বিজেন্দ্র ও চারুশীলা আহ্লাদে অট্টহাসী হাসিয়া এক একবার দীনেশচন্দ্রের গায় গিয়া পড়িতে লাগিল। শাশুড়ী জামাতার ভোজ্য দ্রব্যাদি প্রাণপণ করিয়া রাঁধিলেন এবং গ্রাম্যসুলভ সকল প্রকার উৎকৃষ্ট আহারীয় সংগ্রহ করিলেন।

দীনেশচন্দ্র অতি পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করিলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন তাহার আহারের জন্য ইতিপূর্ব্বে কেহ এত যত্ন করে নাই। ভোজনান্তে দীনেশচন্দ্র শয্যাগৃহে গেলেন।

রাবনে আজই প্রথম খড়োঘরে শয়ন। দীনেশচন্দ্র শয়ন ভোজন কষ্টে অনভ্যস্ত বলিয়া, শাশুড়ী জামাতার ভোজনের সঙ্গে শয্যারও যথাসম্ভব সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সুপরিষ্কৃত গৃহে, একখানি সামান্য তক্তাপোষের উপর, একখানি অতি পরিষ্কার শয্যা বিস্তৃত হইয়াছিল। দীনেশচন্দ্র সেই তক্তাপোষে বসিয়া সতৃষ্ণনয়নে পত্নীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। গিরিবালা ক্ষিপ্রহস্তে ভোজন শেষ করিয়া, কতকগুলি পানের খিলি লইয়া, শয়ন ঘরে গেলেন, একটী পান স্বামীর মুখে বল পূর্ব্বক গুঁজিয়া দিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন,

'আজ আমাদের কি শুভ দিন!'

দীনেশচন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন, 'কেন?'

গিরি। অমাবশ্যায় পূর্ণচন্দ্রের উদয়, আবার 'কেন' কি? ঐ যে বলে, 'গরীবের দুয়ারে হাতী', এ যে ঠিক তাই।

দী। তুমি দেখি বেশ কবি হ'য়ে উঠেছ।

গিরিবালা মৃদু হাসি হাসিয়া কহিলেন,

'সেই সেতু আনিয়াছে হেথা, এ কনক লঙ্কাপুরে ধীর রঘুনাথে।'

দী। বেশ্ বেশ্। এ যে দ্বিতীয় মাইকেল।

গি। 'মণি মুক্তা রতন কি আছেরে জগতে,
যাহে নাহি তুচ্ছ করি, লভিতে সে ধন?'

দীনেশচন্দ্র পত্নীর চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন। গিরিবালা পুনরপি হাসিয়া কহিলেন,

'রাবণ শ্বশুর মোর মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে?'

দী। তোমার বিদ্যার জোর দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে—

কুশিক্ষার দোষ। আচ্ছা, আর পূর্ব্বে কখন তোমার আত্ম
ছেঁড়া পেয়েছ ?'

সুকুমারী। তা, অনেক দিন। আমি মনে করতুম অবুঝ ছেলেরা এ সব করে।

গিরিবালা। তুমি কি-ই বা না মনে কর। পুরুষদের মত ভাবলে কি চলে ? ওঁরা ভাবে, পৃথিবীময় বুঝি কেবল সীতা, সাবিত্রী। তাই বলে—কারু সঙ্গে ঝগড়া করো না, কারুকে কিছু বলো না; তা এ সব ছোট লোকের মেয়েগুলিকে মধ্যে মধ্যে দু একটা কথা না বললে যে এদের স্পর্দ্ধা আরও বেড়ে যায়। আর দেখেছ একটা কাণ্ড ভাই, ঝগড়াটে, হিংসুটে মাগীগুলির আবার তেমনি মূর্খ, গোঁয়ার স্বামী জোটে।

সুকুমারী ভীতা হইয়া বলিল, 'থাক্ এ সব কথা ভাই, চল শুইগে।' তার পর দরজায় অর্গল বন্ধ করিয়া, দীপটা নির্ব্বাণ করিয়া দিয়া যুবতীদ্বয় শয্যায় গেল। নানা বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে গিরিবালা সুকুমারীর কাণে কাণে বলিল,

'দেখ, চোর ধরে দিতে পারি ! কেউ দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছে !'

সুকুমারী সাধারণতঃ শান্তিপ্রিয়া। বলিল, 'দরকার কি ভাই ? যার যা ইচ্ছে করুক, আমাদের ত কিছু ক্ষেতি হচ্ছে না।'

সে কথা গিরিবালা শুনিয়াও শুনিল না। রঙ্গ দেখিবার জন্য একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিল,

'কে রে ! দরজায় ?—রসো'

এই কথা বলিবামাত্রই বাহিরে দ্রুত পাদবিক্ষেপের শব্দ শুনা গেল। গিরিবালা হাসিয়া বলিল,

শোন, পায়ের শব্দ—দৌড়ে পালাচ্ছেন। 'যে ঘরেতে ...ঙ্গা-বৌ সে ঘরেতে চুরী' হিংসুটে মাগীরা তোমার রূপটুকু চুরী কত্তে এসেছিল।'

গিরিবালা আজ সুকুমারীকে অনেক কথা বলিল, সংসার-শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক সদুপদেশ প্রদান করিল। পরদিন প্রাতঃ-কালে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া সে বিদায় গ্রহণ করিল। সুকু-মারী মলিন বদনে জিজ্ঞাসা করিল,

'আবার কবে আসবে?'

গিরিবালা। অবসর পেলে রোজই আস্‌ব।

সুকুমারী। সঙ্গে দাস, দাসী এসেছে—তোমার আবার অনবকাশ কি ভাই?

গিরিবালা সুকুমারীর সরলতা ও হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, 'আচ্ছা, রোজই আস্‌ব।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তা ও গিন্নি।

ভাদ্র মাস। দুর্গোৎসব নিকটবর্ত্তী। প্রবাসবাসী বাঙ্গালীর প্রাণ বাড়ী বাড়ী করিয়া নাচিয়া উঠিয়াছে। কেহ দেড় মাস, কেহ এক মাস, কেহ এক পক্ষ, আর কেহ বা এক সপ্তাহের ছুটীতেই বাড়ী ছুটিয়াছেন। রাস্তা, ঘাট, রেল, জাহাজ, হাট, বাজার ইত্যাদিতে লোকে লোকারণ্য। আনন্দময়ীর আগমন প্রতীক্ষায় বঙ্গদেশ আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ হইয়াছে। বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়া সকলেরই মুখে আজ আনন্দ

লাঞ্ছনা দিতে আরম্ভ করিবে, তখন উহাদের জ্ঞান জন্মিবে, আর তোমার কথা স্মরণ হইবে, ইহার পূর্ব্বে নহে।'

স্বর্ণ। সে সব চিন্তা এখন পরিত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি যে অত্যাচার হয়, তাহা নিবারণের কি উপায় করি? আর সুকুমারী—

দী। এর আর কি করবে, দেখা যাক্ কি হয়। সুকুমারীর পত্র এলেই সব জান্‌তে পারবে। মানুষের কি নীচ প্রবৃত্তি, কি জঘন্য রুচি, আমি বুঝে উঠ্‌তে পারি না। ঐ ত সব গুণের স্ত্রী। উহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনীর প্রতি কিরূপ কুব্যবহার করে। এদের কি একটু লজ্জাও হয় না?' স্বর্ণকমল গম্ভীর বদনে ঈষৎ হাসিয়া বলিল,

'লজ্জা?—লজ্জা, অনেককাল লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেছে। জ্যেষ্ঠ ভাই—পরম গুরু, তাঁদের বিরুদ্ধে কথা বলিতে হইতেছে, কি দুর্ভাগ্য! আমি পূর্ব্বে কখনও তাঁদের সঙ্গে অধিক কথা বলি নাই, সুতরাং তাঁদের প্রকৃতিও জানিতে পারি নাই, এবার দুই তিন দিন তাঁদের মুখে যে সব কথা শুনেছি, তাহা মনে হ'লে এখনও আমার দুঃখ ও লজ্জা হয়। জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের নিকট একরূপ কথা শুনিতে হইবে, তাহা আমি কখনও মনে করি নাই।'

দী। সে যা হউক, তুমি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হও। এখন হইতে তোমাকে একটুকু সাবধান হইয়া চলিতে হইবে, নতুবা বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে। জেনো, মূর্খ শত্রু বড় ভয়ঙ্কর, হিতাহিত জ্ঞান না থাকায় ইহারা সব করিতে পারে। কোন্ কার্য্যের কি ফল দাঁড়াবে, এবং ইহাতে তাহাদের কি অনিষ্ট হবে, কার্য্য আরম্ভ না করিয়া তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না। সুতরাং ইহাদের

পক্ষে কোন কার্য্য করাই অসম্ভব নহে। আর একটী কথা। সকল সময় ইহাদের প্রতি মহত্ত্ব প্রদর্শন করিও না, কারণ যে, 'মহত্ত্ব' উপলব্ধি করিতে না পারে, তাহার নিকট উহা ফেলিয়া লাভ কি? জ্ঞানী শত্রুর একটী অত্যাচার নীরবে সহ্য করিলে, সে নিজেই মনে মনে লজ্জিত হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়। কিন্তু মূর্খ শত্রুর অত্যাচার বিনা বাক্য ব্যয়ে সহ্য করিলে সে মনে করিবে যে, তোমার তাহার প্রতিকার করিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং সে ক্রমে অধিক অত্যাচারী হইবে। আমার এই কথা গুলি মনে রাখিও। তুমি যেরূপ প্রকৃতির লোক, সমস্ত পৃথিবীকে সেরূপ মনে করিলে পদে পদে বিড়ম্বিত হইবে, ইহা নিশ্চয় কথা।

স্বর্ণকমল একাগ্রমনে বন্ধুর কথা গুলি শুনিল। সংসার সম্বন্ধে তাহার পূর্ব্ব ধারণা পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বর্ণকমলের পত্র।

কলিকাতা আসিয়া কয়েক দিন পরে স্বর্ণকমল সুকুমারীর নিকট এই পত্রখানি লিখিল,—

প্রিয়তমা সুকুমারি!—তোমাদের কথা মনে হইলে আমি ব্যাকুল হইয়া পড়ি, পত্রে যে কি লিখিব তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। এ জন্য লিখি লিখি করিয়া এই কয় দিন পত্র লিখা ঘটিয়া উঠে নাই। হয়ত বৃদ্ধ পিতা মাতা কত যাতনা সহিতে-

ছেন, কত মনঃকষ্টে দিন যাপন করিতেছেন, আর তুমিই বা কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছ। এইরূপ অশান্তিপূর্ণ ভাবনায় দিবা রাত্রি, চব্বিশ ঘণ্টা আমার মন চঞ্চল থাকে। এখানে আসিয়া অবধি আমি একটী মুহূর্ত্তও তোমাদের কথা বিস্মৃত হইতে পারি নাই। এপর্য্যন্ত একখানা পুস্তকের দু'পাতা পড়িয়াছি বলিয়াও মনে হইতেছে না। পারিবারিক চিন্তার আমার পাঠের বড় অনিষ্ট হইতেছে, কিন্তু যাহা অনিবার্য্য তাহার জন্য বৃথা ভাবিয়া লাভ নাই। আশা করি ভগবানের অনুকম্পায় তোমরা নিরাপদে আছ—বিশেষ কোন পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটে নাই। গত ছুটীর সময় বাড়ার অবস্থা যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা মনে হইলে আমার বুদ্ধি লোপ হয় এবং এই অবস্থায় তোমাকে যে কি উপদেশ প্রদান করিব, কোন্ পথে চলিতে বলিব, তাহা আমি নিজেই স্থির করিতে পারি না। মানুষ যে এত অনুদার প্রকৃতি-বিশিষ্ট হইতে পারে, পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি-শূন্য হইয়া জনক জননীর প্রতি এরূপ জঘন্য ব্যবহার করিতে পারে, ভাতৃ স্নেহ ভুলিয়া যাইতে পারে, ইহা আমি কখনও বিশ্বাস করি নাই। ভদ্র বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েরা যে নীচ হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া, আপন আপন স্বামীকে এরূপ কুমতি প্রদান করিতে পারে, আর শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি এত ঘৃণা ও অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করিতে পারে, এ ধারণাও আমার ছিল না। আর, মানুষ যে সুব্যবহারকারীর প্রতি কুব্যবহার করিতে পারে, ভালবাসার প্রতিদানে নির্ম্মমতা প্রদান করিতে পারে, বিনয় নম্র বচনের প্রত্যুত্তরে রূঢ়ভাষা প্রয়োগ করিতে পারে, ইহাও আমার ধারণা ছিল না। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যেও যে জঘন্যতার অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি নাই, আপন

গৃহে—আপন ভ্রাতাতে, আপন ভ্রাতৃ বধূতে তাহা দেখিতে হইবে, ইহা ত আমার স্বপ্নের অগোচর ছিল!

যাক্—এসব কথা লিখিয়া কাজ নাই, কিন্তু আজ তোমাকে গুটি দুই কথা বলিতে হইতেছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে তোমাকে যেরূপ ভাবে উপদেশ দিয়াছি, এ পত্রে ঠিক সেরূপ উপদেশ দিতে পারিতেছি না, ইহা কপালের দোষ বটে। পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, তোমার বড় দিদি মেজ-দিদির বিরুদ্ধে কখনও কোনরূপ কুভাব হৃদয়ে ধারণ করিও না, তাহাদের প্রতি পূর্ব্ববৎ ভক্তি রাখিও, তাহাদের পুত্র কন্যাকে অন্তরে ভালবাসিও, কিন্তু এই ভক্তি ও ভালবাসা বাহিরে প্রকাশ করিও না। কারণ, তুমি যাহা সুভাবে অর্পণ করিবে, তাহা তাহারা কুভাবে গ্রহণ করিবে—কাজেই বিভ্রাট উপস্থিত হইতে পারে। তুমি ননীগোপালকে আদর করিয়া কোলে লইলে যদি এই অপরাধে অপগণ্ড শিশুর প্রহার যাতনা সহ্য করিতে হয়, কিম্বা মাতৃস্তনা পান করিতে গিয়া বুক পাতিয়া পদাঘাত লইতে হয়, তবে সে অবস্থায় তোমার আদর না করাই সঙ্গত। এইরূপ সকল বিষয়ে। সভা বুঝিয়া কীর্ত্তন গাইতে হয়। যে অমৃত পান করিবে না, তাহাকে বলপূর্ব্বক অমৃত পান করাইতে চাহিলে, সে উহা বিষবৎ দূরে নিক্ষেপ করিবে, ইহা সুনিশ্চিত। এ সম্বন্ধে তোমাকে আর অধিক কি উপদেশ দিব। কাহারও কথার উত্তর দিও না, কেহ তিরস্কার করিলে তাহা পুরস্কার জ্ঞানে নতমস্তকে গ্রহণ করিও, দুর্ব্বাক্য বলিলে আমার দিকে চাহিয়া তাহা নীরবে সহ্য করিও। এই পন্থা অবলম্বন করিলেই যে তুমি বিপদ সম্পূর্ণ রূপে এড়াইতে পারিবে, এখন সে বিশ্বাসও আমার নাই; ইহাতে বিভ্রাট কম হইবে মাত্র।

কারণ, আমার বিশ্বাস যে তুমি যদি তাহাদের কথার উত্তর না দাও, তবুও তাহারা সম্ভবতঃ নিজ নিজ স্বামীকে বুঝাইয়া দিবে যে তুমি তাহাদিগকে অনর্থক গালাগালি দেও, কিন্তু তুমি যদি তাহাদের একটী কথার উত্তর প্রদান কর, তবে তাহারা হয়ত বলিবে যে, তুমি তাহাদিগকে গালি দেও, প্রহার করিতে চাও, আর তাদের ছেলেমেয়েগুলিকে অভিসম্পাত কর, ইত্যাদি। তাই বলিতেছি যে, সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিবে—কাহারও কথার উত্তর প্রদান করিবে না।

বৃদ্ধ জনক জননীর সেবা শুশ্রূষার সম্পূর্ণ ভার তোমার উপর, ইহা যেন মনে থাকে। সকল কাজ ত্যাগ করিয়াও, যাহাতে তাহাদের সুখ শান্তি হয়, মানসিক যাতনা একটু দূর হয়, তাহা করিবে। আমাদের কাহারও অযত্ন ব্যবহারে যদি তাহারা মনঃক্লিষ্ট হইয়া একবিন্দু অশ্রুপাত করেন, তবে আমাদের সকলেরই ইহার প্রতিফল ভুগিতে হইবে। ইতিমধ্যে কোনরূপ দুর্ঘটনা হইয়া থাকিলে, বিস্তারিত রূপে লিখিয়া জানাইবে। আমার পাঠের ক্ষতি হইবে কিম্বা আমি মনঃকষ্ট ভোগ করিব ভাবিয়া আমার নিকট কোন কথা গোপন করিও না—এরূপ করিলে বরং আমার অধিক ক্ষতি হইবে। কারণ, সন্দেহের পীড়নে আমার হৃদয় হইতে শান্তি পলায়ন করিবে, কল্পনাকে সত্য মনে করিয়া আমি দিবারাত্রি মনাগুনে জ্বলিয়া মরিব। ইহা মনে রাখিয়া, যখন যাহা হয়, আমার নিকট তাহার যথাযথ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইবে—কোনরূপ দ্বিধা বোধ করিবে না। এ পত্রে আর অধিক কি লিখিব। আমার একটি অনুরোধ—অশ্রুপাত করিয়া

যাতনা ভোগ করিও না। তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সুকুমারীর উত্তর।

প্রিয়তম,——তোমার আশীর্ব্বাদ পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমার পত্র পাইলে যেন আমি হারানিধি কুড়াইয়া পাই— আমার শুষ্ক প্রাণে জল আসে। তোমার পত্র আসিলে আমার দুই তিন দিন পর্য্যন্ত কোন কষ্টই থাকে না, সকল কষ্ট ভুলিয়া যাই, বড়-দিদি মেজ-দিদির অযথা তিরস্কারেও তখন আমার বড় কষ্ট হয় না, তখন আমি সুখে আত্মহারা হই, মনে মনে কেবল সুখের চিত্র অঙ্কিত করি। কিন্তু আমি নিতান্ত হতভাগিনী, তাই যা ভাবি, তাহার বিপরীত ঘটে। ভগবান্ যখন দয়া করিয়া এই হতভাগিনীকে তোমার হাতে সঁপিয়া দিলেন, তখন তোমার হাসিমাখা মুখ দেখিয়া এবং তোমার পিতা মাতার সহাস্যবদনে স্নেহমাখা বচন শুনিয়া আমার মনে যে কত আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বলিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। তখন মনে করিয়াছিলাম, এমন সুখী পরিবার বুঝি বড় বিস্তর নাই। এখন যে তাঁহারা কেহ আমার প্রতি কর্কশ বাক্য বলেন, ইহা বলিতেছি না। এখন বরং তাঁহারা আমার প্রতি দয়া করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহের সহিত কথা কহেন, কিন্তু তাঁহাদের মুখে সেই হাসি আর নাই, সেই প্রফুল্লতা পলায়ন করিয়াছে। তাঁহারা এখন সদা বিষণ্ণ, সর্ব্বদা দুঃখিতচিত্ত। মায়ের চক্ষে কখন কখন অশ্রু-

জলও দেখিতে পাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, চক্ষু মুছিয়া 'কৈ মা? কাঁদব কেন, মা?' বলিয়া আমাকেই পুনরায় সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করেন, কোন কারণ বলেন না। তিনি বলুন আর না বলুন, আমি সব বুঝিতে পারি; কিন্তু বুঝিতে পারিয়াই বা লাভ কি? আমি ত তাঁহার দুঃখ দূর করিতে পারি না। মনের আবেগ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া বড়-দিদি বা মেজ-দিদিকে অনুনয় বিনয় করিয়া দুই একটী কথা বলিলে, তাঁহারা আরও নির্দ্দয়রূপে সকলকে গালাগালি করিতে থাকেন। আমাকে গালি দিলে মা কাঁদেন, তাহার কান্না দেখিলে আমিও অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারি না।

তোমাকে সকল কথা লিখিয়া জানাইতে লিখিয়াছ। কিন্তু কি লিখিব? দশটী অশুভ সংবাদের সঙ্গে যদি তোমাকে একটীও শুভ সংবাদ দিতে পারিতাম, তবে কোন কথা লিখিতে ভয় হইত না। কেবল বিবাদ, বিসম্বাদ ও অশ্রুপাতের সংবাদ লিখিয়া তোমার মনঃকষ্ট বাড়াইতে আমার ইচ্ছা হয় না। কিন্তু তুমি আমার দেবতা, প্রাণ গেলেও তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে আমার ইচ্ছা হয় না, যে দিন সেরূপ কু-ইচ্ছা হইবে, ভগবান করুন সে দিন যেন আমি মরিয়া যাই। আমার ইচ্ছা, অনিচ্ছা কি? তোমার ইচ্ছার আমার ইচ্ছা, তোমার অনিচ্ছায় আমার অনিচ্ছা; সুতরাং তুমি বাড়ী হইতে চলিয়া গেলে এপর্য্যন্ত যাহা যাহা হইয়াছে, তাহা লিখিয়া জানাইতেছি।

তুমি জান যে তোমাদের দেবুকাকার স্ত্রী গর্ভবতী। তাঁহার সাধভক্ষণ উপলক্ষে গত পরশ্ব আমাদের সকলের সে বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল। আমার তথায় যাইতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মায়ের আজ্ঞা

লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না; মা, বড়-দিদি, মেজ-দিদির সঙ্গে আমাকেও যাইতে হইল। তথা হইতে আসিয়া আমার পরিহিত বারাণশী সাড়ীখানা ছাদের উপর রৌদ্রে শুকাইতে দিলাম। অপরাহ্নে সাড়ীখানা আনিতে গিয়া দেখি যে, কাপড়ের লম্বাদিকে প্রায় তিন হাত স্থান ছেঁড়া। সত্য কথা বলিতে কি, নূতন সাড়ীখানার এই অবস্থা দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইল এবং মা দেখিলে কি বলিবেন ভাবিয়া একটু ভীতা হইলাম। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সাড়ীখানা ভাজ করিয়া নীচে নামিলাম এবং মায়ের অজ্ঞাতে তাহা বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিতেছিলাম, এমন সময় গিরিবালা পশ্চাৎদিক হইতে আসিয়া 'দেখি কাপড়খানা' বলিয়া, আমার হস্ত হইতে হঠাৎ তাহা টানিয়া নিল এবং কাপড়ের ছেঁড়া স্থান দেখিয়া একটু চমকিয়া বলিল, 'ই-কি? এমন সুন্দর কাপড়খানার কে এমন দশা ঘটাইল?' মা, গিরির কথা শুনিয়া নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি লা, গিরি?' গিরিবালা সাড়ীখানা দেখাইল। মা কতক্ষণ একবারে অবাক্ হইয়া রহিলেন; পরে ক্রোধে অধীরা হইয়া, কাহার নাম উল্লেখ না করিয়া কতক্ষণ নিরুদ্দেশে গালাগালি করিলেন। বড়-দিদি, মেজ-দিদি এজন্য মাকে যা-ইচ্ছা-তাই বলিতে লাগিলেন, মা নিজগৃহে যাইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তার পর ননীর বাবা ও সুশীলার বাবা বাড়ী আসিলে বড়-দিদি ও মেজ-দিদি কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত কি বলিলেন। অতঃপর তাঁহারা আমাকে লক্ষ্য করিয়া অশ্লীল ও অভদ্রোচিত ভাষায় কত গালাগালি দিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া মা উভয়কে লক্ষ্য করিয়া অতি দুঃখে কহিলেন, 'দেখ্ রামকমল, কৃষ্ণকমল! তোরা মানুষ হয়ে

ছোট বৌমাকে এসব কথা বলিস্, আর এরূপ ব্যাভার কচ্ছিস, তোদের কি লজ্জা হয় না? ছি! ছি! ছি! হ'য়ে মরে গেলে যে ছিল ভাল!' এই কথা শুনিয়া তাঁহারা চারি জনে গর্জ্জিয়া উঠিলেন এবং মাকে পূর্ব্বাপেক্ষা বিদ্রূপে বকিতে লাগিলেন এবং প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। মা পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন, গতিক ভাল নহে বুঝিয়া কর্ত্তাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তোমার বাবা এতক্ষণ নিমন্ত্রণবাড়ীতে বসিয়া ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন। সংবাদ পাইয়া বাটী আসিলেন। সকল অবস্থা জ্ঞাত হইয়া তিনি যেন হতজ্ঞান হইলেন, প্রায় আধ ঘণ্টা কোন কথা কহিলেন না। কিন্তু তোমার বড়-দাদা, মেজ-দাদা আর বড়-দিদি, মেজ-দিদি তখনও পূর্ব্ববৎ গালাগালি করিতেছিলেন। কর্ত্তা মহাশয় আর সহ্য করিতে না পারিয়া রাগত স্বরে বলিলেন, 'তোমরা চুপ করিবে কি?'

তাঁহার কথা শুনিয়া তোমার বড়দাদা তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, 'এরূপ করিলে কে চুপ করিতে পারে? ছোট বৌ যে যার তার নামে এসব মিথ্যে কথা বটায়, আর মা যে তার পক্ষ হয়ে, যাকে তাকে মিছামিছি গালাগালি দেয়, এর একটা উচিত বিচার কত্তে হয় করুন; নইলে কিন্তু পরে আমাদের কোন দোষ দিতে পারিবেন না। আমার স্পষ্ট কথা!' কর্ত্তা রাগতস্বরে বলিলেন, 'আমি আজ সত্য সত্যই ইহার বিচার করিব এবং যার দোষ দেখিব তাকে উচিত শাস্তি দিব, ইহা আমার প্রতিজ্ঞা।' ইহা বলিয়া তিনি বড়-দিদি ও মেজ-দিদিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কাপড় ছিঁড়িয়াছ? সত্য

করিয়া বল।' তাহারা অস্বীকার করিয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি নবলক্ষ্মী, নন্দগোপাল ও সুশীলাকে ডাকিয়া চক্ষু লাল করিয়া একে একে বলিলেন, 'কেন কাপড় ছিঁড়েছিস বল, নতুবা তোর হাড় গুঁড়ো করে দিব।' তাহার কথা শুনিয়া নন্দগোপাল কাঁদিতে লাগিল, কথা কহিল না; নবলক্ষ্মী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'আমার দোষ কি? মা বলেছে, তাই ছিঁড়েছি; আমায় মের না ঠাকুরদাদা; যতটুকু ছিঁড়েছি আমি তা শেলাই করে দিব।' আর সুশীলা কাঁদিয়া বলিল, 'আমি ত কাপড় ছিঁড়ি নাই, বাক্স জলে ফেলে দিয়েছি, তা এখনি তুলে দিব।' কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন্ বাক্স?' সুশীলা কহিল, 'কাকীমার গহনার বাক্স।' এই কথা শুনিয়া আমি অবাক হইলাম এবং নিমন্ত্রণ বাড়ী হইতে আসিয়া গহনা খুলিয়া যে ছোট টীনের বাক্সটীতে তাহা ভরিয়া তাকের উপর রাখিয়াছিলাম, তাহার তল্লাস করিলাম, কিন্তু তাহা পাইলাম না। সকলে তখনই সুশীলাকে সঙ্গে করিয়া পুকুরপাড় গেল, সুশীলা অঙ্গুলী দ্বারা যে স্থানে বাক্স ফেলিয়াছিল, তাহা দেখাইয়া দিল, কর্ত্তার আদেশে ভজহরি জলে নামিয়া ডুব দিয়া গহনার বাক্স তুলিল। কর্ত্তা এই সকল কাণ্ড দেখিয়া শুনিয়া ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন, নবলক্ষ্মী ও সুশীলাকে তিরস্কার করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিলেন এবং ননীগোপাল ও সুশীলার বাবাকে লক্ষ্য করিয়া বিকৃত স্বরে বলিলেন, 'এখন বুঝ্লে ত কার দোষ? আর চক্ষু থাক্‌তে অন্ধ হয়ে থেকো না। যদি মঙ্গল চাও তবে এই সব জঘন্য ব্যবহার দূর কর্‌তে চেষ্টা কর।' তার পর নবলক্ষ্মীর বাবা বলিলেন, 'এ আর বিচার কি হলো? প্রাণের

ভয়ে একটা কথা স্বীকার হয়েছে বলেই কি অপরাধ হলো?' সুশীলার বাবা এ কথায় মত দিলেন। কর্ত্তা ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উভয়কে তিরস্কার করিলেন। তাঁহারাও কর্ত্তার প্রতি যা-ইচ্ছে তাই বলিতে লাগিলেন। বড-দিদি, মেজ-দিদি, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। পর দিন প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া উভয়ে স্বামী ও সন্তানগণ সমভিব্যাহারে নিজ নিজ পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তোমার পিতা কাতর স্বরে কত বারণ করিলেন, সম্মানের দোহাই দিলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিলেন না, তাঁহাকে গালাগালি দিতে দিতে ও প্রাণ থাকিতে আর তাঁহার অন্নগ্রহণ করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, সকলে এক সময়ে চলিয়া গেলেন। সিন্দুক, পেটেরা, বাক্স, কাপড় ইত্যাদি—সমস্তই লইয়া গিয়াছেন। তোমার বাবা ও মা অতঃপর প্রায় বাক্‌শূন্য হইয়াছেন, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কথা কহেন না, সর্ব্বদা অশ্রুজলে ভাসিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্যকার এই দুর্ঘটনার আমিই মূল কারণ, আমি যদি বারানসীসাড়ীখানা ছিন্নাবস্থায় লুকাইয়া রাখিতাম, তবে এ বিভ্রাট ঘটিত না। আমাকে ক্ষমা করিও। এ সময়ে তুমি একবার বাড়ী আসিতে পারিলে বড় ভাল হয়। লিখিতে লিখিতে আমার হাত অবশ হইয়া পড়িয়াছে, আর অধিক লিখিতে পারিলাম না. কিন্তু তুমি আমাদের জন্য চিন্তা করিও না। শীঘ্র তোমাদের মঙ্গল লিখিয়া সুখী করিও। ইতি—

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিশেষ বিবরণ।

স্বর্ণকমল বাড়ী হইতে কলিকাতাযাত্রা সময় মনে করিয়াছিল যে, কলিকাতা গিয়া তিনি অপেক্ষাকৃত শান্তিলাভ করিতে পারিবে। কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে, তাহা হয় কৈ? স্বর্ণকমল অশান্তিপূর্ণ পিতৃভবন ছাড়িয়া আসিল বটে, কিন্তু অশান্তি তাহাকে ছাড়িল না। স্মৃতির তীক্ষ্ণ অসি প্রহারে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। জনক জননী কত লাঞ্ছনাই বা ভোগ করিতেছেন, সুকুমারী নীরবে অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত করিতেছে ইত্যাদি নানা কথা স্মরণ করিয়া সে মর্ম্ম যাতনা ভোগ করিতে লাগিল। সে আর এখন মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিতে পারে না, মনে রাখিলে আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে। তাহার দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী দীনেশচন্দ্রের নিকট মনের কথা কহিয়া ভার লঘু করে। সুকুমারীর নিকট পত্র লিখিয়া ক্ষণিক শান্তি উপভোগ করে। সুকুমারীর পত্র পাইয়া স্বর্ণকমল একেবারে বিকলচিত্ত হইয়া পড়িল, এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য তাহা সহসা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। অগত্যা শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্থিরনেত্রে ছাদের কড়ি ও বরগা গণিতে লাগিল। এমন সময় দীনেশচন্দ্র স্বর্ণকমলের নিকটস্থ হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “আজ একটী শুভ সংবাদ আছে।” স্বর্ণকমল দীনেশচন্দ্রের কথায় লক্ষ্য না করিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল, “ভাই দীনেশ! আমার আর কলিকাতা থাকা ঘটিয়া উঠিল না, এই পর্য্যন্তই বিদ্যা শেষ হইল।” স্বর্ণকমল

একটী উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় কহিল, "আমার দুই এক দিনের মধ্যেই বাড়ী যাইতে হইতেছে।" দীনেশচন্দ্র গিরিবালার পত্রে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে স্বর্ণকমলের মনস্তাপের কারণ জিজ্ঞাসু হইতে হইল না। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি বাড়ীর পত্র পেয়েছ?" স্বর্ণকমল সুকুমারীর পত্রখানা দীনেশচন্দ্রের হস্তে দিল, কোন কথা কহিল না। দীনেশচন্দ্র পত্রখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বলিলেন, "স্বর্ণকমল! এই দুঃসময়েও সুকুমারীর চরিত্রটী ভাবিয়া আমি সুখী হইতেছি—এমন সুরমণী যদি বঙ্গে অধিক থাকিত, তবে আর বুঝি বাঙ্গালীর কোন দুঃখ থাকিত না।" স্বর্ণকমল দীনেশচন্দ্রের মুখপানে চাহিল, দীনেশ বলিতে লাগিলেন, 'দেখ উহার সাধের কাপড়খানা ছিঁড়িয়া অব্যবহার্য্য করিল, গহনার বাক্সটী জলে ফেলিয়া দিল, তবুও কিন্তু সে সেদিনকার ঘটনার জন্য আপনাকেই দোষী ভাবিতেছে। এমন সহৃদয়া, কোমলপ্রাণা রমণী আমি আর দেখি নাই। আর একটী কথা আছে। আমি জানি সে কথা বলিলে তোমার বক্ষে শেল বিদ্ধ হইবে কিন্তু এ অবস্থায় আর তাহা গোপন করাও আমি কর্ত্তব্য মনে করিতেছি না। সুকুমারী যাহা লিখিয়াছে, ঘটনা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে, কিন্তু তুমি দুঃখিত হইবে ভাবিয়া সে সব কথা লেখে নাই। তুমি ব্যস্ত হইও না, আমি যথাযথ বলিতেছি।"

দীনেশচন্দ্রের কথাগুলি শুনিয়া স্বর্ণকমলের মস্তক ঘুরিতে লাগিল, চিন্তাশক্তি রহিত হইল, চক্ষু দৃষ্টিশূন্য হইল, হত্যাপরাধে অভিযুক্ত, নির্দ্দোষী ব্যক্তির বিচারকের আজ্ঞা প্রকাশের

অব্যবহিত পূর্ব্বে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় ব্যাকুলতা জন্মে, স্বর্ণকমলের মনেও তদ্রূপ একটা অসহ্য যাতনা উপস্থিত হইল—এক মুহূর্ত্ত পরে হয়ত কি নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিতে হইবে ভাবিয়া সে ক্ষিপ্তবৎ চঞ্চল হইল, বলিল, 'কি হয়েছে ভাই! শীঘ্র বলিয়া ফেল।' দীনেশচন্দ্র স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন, "অত ব্যস্ত হইও না। স্থির হইয়া শোন! কে কাপড় ছিঁড়িয়াছে ইহা লইয়া প্রথমতঃ বাদানুবাদ হয়। তারপর তোমার পিতা বাড়ী আসিয়া যখন একটা মোকদ্দমার দোষী অনুসন্ধান করিতে গিয়া দুটী আসামী বাহির করিলেন, তখন তোমার মা, বড়-বৌ ও মেজ-বৌকে খুব বকিতে লাগিলেন। অবশ্যই বৌ-রাও শাশুড়ীকে ষোড়যোপচারে বেশ পূজা করিলেন। তোমার বড-দাদা, মেজ-দাদা চুপ্টী করিয়া দাড়াইয়া রহিলেন, পিতার বিচারে দোষ দেওয়া ব্যতীত কথাটী কহিলেন না। এইরূপে বিবাদ ক্রমে চড়িতে লাগিল। রায় মহাশয়ের তিরস্কারে তোমার মা থামিলেন—বৌরা থামিলেন না, বরং আরও গর্জ্জিয়া উঠিলেন এবং শ্বশুর শাশুড়ীকে অতি অশ্লীল, অশ্রাব্যভাষায় গালাগালি করিলেন। তোমার মা মনোদুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন। শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ক্রন্দন দর্শনে সুকুমারী অতি ম্লানচিত্ত হইয়া বড়-বৌর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, 'বড-দিদি! মা কাঁদিতেছেন। তোমার পায় পড়ি, আর তাঁহাকে অমন করিয়া গালাগালি দিও না—তাঁহার ত কোন দোষ নাই!' সুকুমারীর কথা শেষ না হইতেই বড-বৌ পা ছাড়াইবার ভাণ করিয়া সুকুমারীর বক্ষে সজোরে লাথি মারিয়া বলিলেন, 'যাও—অত ভালবাসায় আর কাজ নাই। গোড়া কেটে আগায় জল ঢাল্‌তে হবে

না।' মহামায়ার পদাঘাতে সুকুমারী দালানের সিঁড়ির মধ্যে পড়িয়া গেল, মাথায় আঘাত পাইল, দরদর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।" বলিতে বলিতে দীনেশচন্দ্রের চক্ষু ঘোলা হইল, মুখ বিবর্ণ হইল। স্বর্ণকমল এ পর্য্যন্ত শুনিয়া পুনরপি বালিসে মাথা রাখিয়া উদ্ধনেত্র হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন, কোন কথা কহিল না। দীনেশচন্দ্র একটু থামিয়া পুনর্বায় বলিতে লাগিলেন,—

'তখন গিরিবালা নিকটে ছিল; সুকুমারীর এ অবস্থা দেখিয়া সে তোমার মা ও বাবাকে ডাকিল। তাঁহারা আসিয়া সুকুমারীর মাথা জল দিয়া ধোয়াইল এবং ক্ষত স্থানে ভিজা নেক্‌ড়া বাঁধিয়া দিল। সুকুমারীর এ অবস্থা দেখিয়াও তোমার বড়দাদা স্ত্রীকে একটী কথা কহিলেন না দেখিয়া, তোমার পিতা আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না—তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া বড় পুত্রদ্বয়কে তীব্র ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে বলিলেন। পুত্রদ্বয় কড়া জবাব দিয়া সেই রাত্রেই গৃহত্যাগের পরামর্শ করিতে লাগিলেন—কালবিলম্ব না করিয়া লণ্ঠনহস্ত হইয়া নৌকার অন্বেষণে বাহির হইলেন। সে রাত্রে তাহাদের কাহারও আহার হইল না। বড় বৌ, মেজ বৌ সমস্ত রাত্রি আলো জ্বালিয়া পুঁটলী বাঁধিতে লাগিল। নবলক্ষ্মী, সুশীলা, ননীগোপাল প্রভৃতি আহার চাহিয়া প্রচুর প্রহার পাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইল। রাঁধা ভাত বেন্নুন পড়িয়া রহিল। তোমার পিতা, মাতা ও সুকুমারী অনাহারে রাত্রি কাটাইল। শিশুদিগকে অনাহারী রাখিয়া তাঁহারা কোন্ প্রাণে আহার করিবেন? পর

দিন প্রাতঃকালে, তোমার পিতা মাতা ও সুকুমারীকে গালাগালি করিতে করিতে তাহারা নৌকায় উঠিল। ছেলেমেয়েগুলি যাইতে চাহিল না, তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে টানিয়া লইয়া গেল। ননীগোপাল সুকুমারীর দিকে চাহিয়া, 'কাকী মা' 'কাকী মা' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

'আমার আবার শুভ সংবাদ ?'

স্বর্ণকমল একটী অতি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি কবে পত্র পাইয়াছ ?'

দীনেশ। এই ত আজ ভোরের ডাকে।

স্বর্ণ। গিরি কার কাছে শুনিয়া লিখিয়াছে ?

দীনেশ। শুনে নয়, তখন সে তোমাদের বাড়ীতে ছিল।

স্বর্ণকমল একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'হা ঠিক, সুকুমারীর পত্রে গিরির নামোল্লেখ আছে বটে, সুকুমারী কি খুব গুরুতর আঘাত পেয়েছে ?'

দীনেশ। না, কোন চিন্তার কারণ নাই। ঘা প্রায় শুকিয়েছে, ফুলা আর বেদনাও অনেক কমেছে।

স্বর্ণ। কিসে বুঝলে ?

দীনেশ। পত্রে তাহাও লিখেছে। আর সুকুমারী ভাল না হইলে তোমার নিকট স্বহস্তে পত্র লিখ্‌তে পার্‌ত না। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

শেষ কথায় স্বর্ণকমল আশ্বস্ত হইল। দীনেশচন্দ্র স্বর্ণকমলকে একটু দুঃখের ভাবনা ভাবিবার অবকাশ দেওয়া কর্ত্তব্য মনে

করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। সে দিন স্বর্ণকমল কালেজে গেল না। দীনেশচন্দ্র কালেজ হইতে বাসায় আসিয়াই স্বর্ণকমলের নিকট গেলেন, উভয়ে একসঙ্গে একটু জলযোগ করিলেন। কিছু কাল বিশ্রামের পর উভয়ে একত্র সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতে চলিলেন। প্রথমতঃ স্বর্ণকমল একটু আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু দীনেশচন্দ্রের অনুরোধ এড়াইতে পারিল না। চলিতে চলিতে যুবকদ্বয় গোলদিঘীর উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তথায় বালক ও যুবকগণ দলে দলে বেড়াইতেছে, হো হো করিয়া হাসিতেছে, ছুটাছুটী করিতেছে, বসিয়া গল্প করিতেছে, একদল বালক কপাটী খেলিতেছে। যুবকদ্বয়ের তখন সেই হাসাহাসি, ছুটাছুটী, কোলাহল ভাল লাগিল না। তখন তাহারা উদ্যানের উত্তরাংশ পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত জনশূন্য দক্ষিণাংশের একখানা প্রস্তরাসনের উপর গিয়া বসিলেন। অন্য দুই এক কথার পর, দীনেশচন্দ্র ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে কি, বাড়ী যাওয়াই স্থির করিলে ?'

স্বর্ণ। হাঁ—বাড়ী যাওয়া, আর পাঠত্যাগ। এ সময়ে আমি পিতা মাতার সম্মুখে না থাকিলে তাঁহাদের দুঃখের অবধি থাকিবে না। পিতা মাতার দুঃখ যদি দূর করিতে না পারিলাম, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটা পরীক্ষা পাস করিলেই বা কি মহত্ত্ব বাড়িবে, বল।

দীনেশচন্দ্র জানিতেন, স্বর্ণকমল চিন্তা না করিয়া কোন কথা কহেন না, তাহার সংকল্প পরিবর্ত্তিত করাও সহজসাধ্য নহে। সুতরাং পাঠত্যাগ সম্বন্ধে আপততঃ কোন কথা না বলিয়া বলিলেন, 'সে কথা পরে হবে, বাড়ী কি কালই যাইবে ?'

স্বর্ণ। কালই যাইব। আর বিলম্ব করিতে পারি না। আজ দুপুর বেলা বাবার এক পত্র পাইয়াছি। তিনি অতি শীঘ্র বাড়ী যাইতে বলিয়াছেন। তাঁহারা হয়ত এখন কত কষ্ট পাইতেছেন!

দীনেশ। কষ্ট ত হইবারই কথা। তোমারও সকল আশা আজ ফুরাইল। এত দিন মনে করিয়াছিলে যে, তিন ভ্রাতা একসঙ্গে থাকিয়া কত সুখী হইতে পারিবে, একান্নভুক্ত হিন্দু-পরিবার যে কিরূপ সুখের নিকেতন হইতে পারে, তাহার আদর্শ প্রদর্শন করিবে। এতদিন কেবল শূন্যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিলে।

স্বর্ণ। দাদারা যে এরূপ হইবেন, তাহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।

দীনেশ। সমস্ত পৃথিবীর লোককে তোমার মত সরল প্রকৃতি উদারচেতা ভাবিও না, ভাবিলে প্রতারিত, বিপদগ্রস্ত হইবে। আর, একান্নভুক্ত-পরিবারে বাসের আশা ত্যাগ কর, নতুবা প্রতিদিন এইরূপ ঘটনা ঘটিবে। তোমার দাদাদের পৃথকান্ন হইবার একান্ত অভিলাষ; সে সাধ পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহারা এইরূপই করিবে।

স্বর্ণ। পিতা মাতা বর্ত্তমানে ইহা অসম্ভব। এরূপ কথা শুনিলে তাঁহারা দুঃখে অভিভূত হইবেন।

দীনেশ। কিন্তু কি করিবে, আর যে উপায় নাই, প্রতিদিন এইরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে, পৃথগন্ন হইয়া শান্তি পাইলে, আমি তাহাই শ্রেয়ঃ মনে করি। কারণ এই রোগের যে আর অন্য ঔষধ নাই। তুমি বাড়ী যাইয়া পিতা মাতাকে বুঝাইয়া বল, দাদাদের খবর পাঠাও, পৃথকান্ন হইয়া পিতা মাতা ও সুকুমারীকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস কর।

স্বর্ণকমল ধীরে ধীরে বলিল,

'বাবা, মা ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিয়া আসিতে চাহিবেন না।'

দী। পরিত্যাগ নহে—অধিকাংশ সময় কলিকাতা থাকিবেন মাত্র; পূজার সময় দুই এক মাস বাড়ী গিয়া থাকিয়া আসিবেন। কালী গঙ্গার নিকট থাকিতে তাঁহারা সম্ভবতঃ আপত্তি করিবেন না।

স্বর্ণ। দাদারা হয় ত আর এ বাড়ীতে আসিবেন না—যাইবার সময় প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন।

দীনেশচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,

'এ প্রতিজ্ঞার জন্য চিন্তা করিও না। এমন শুভ সংবাদ পাইলে তাঁহারা ছুটিয়া আসিবেন।'

স্বর্ণকমল মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। দীনেশচন্দ্রের উপদেশ এখন তাহার অন্যায় বোধ হইল না। ভাবিল—এই পন্থা অবলম্বন করিলে যদি শান্তি স্থাপিত হয়, তবে মন্দ কি ? ভবিষ্যৎ শান্তির আশায় স্বর্ণকমলের হৃদয় অনেক আশ্বস্ত হইল।

দীনেশচন্দ্র কহিলেন, 'আর দুশ্চিন্তা করিয়া মনঃকষ্ট ভোগ করিও না—আমি যাহা বলিলাম, তাহাই উৎকৃষ্ট উপায়। বাড়ী যাইয়া সেরূপ কাজ কর।' স্বর্ণকমল কোন কথা কহিল না। দীনেশচন্দ্র অবসর বুঝিয়া পুনরায় বলিলেন,

'আর একটী শুভ সংবাদ আছে, সে সংবাদ সুকুমারী তোমাকে লিখে নাই।'

স্বর্ণকমল কহিল, 'আমার আবার শুভ সংবাদ।'

দীনেশচন্দ্র কহিলেন, 'হাঁ শুভ সংবাদই বটে—সুকুমারী গর্ভবতী। তোমার পিতামাতার ইহাতে আনন্দের সীমা থাকিবে

না। এই দুঃখের সময়ও ইহাতে তাঁহাদের মন অনেক শান্তি-পূর্ণ থাকিবে।'

পিতামাতার আনন্দ হইবে ভাবিয়া স্বর্ণকমলও মনে মনে প্রফুল্ল হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

লজ্জাবনতমুখী সুন্দরী।

পরদিন স্বর্ণকমল বাড়ী চলিয়া গেল। বাড়ী গিয়া জানিল, পিতাঠাকুর চারি পাঁচ দিন ধরিয়া জ্বররোগাক্রান্ত হইয়াছেন। জ্বরে বিরাম নাই। বৃত্তান্ত শুনিয়া স্বর্ণকমল ব্যস্ত হইল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, এ পর্য্যন্ত জলবিন্দুও গ্রহণ করে নাই। স্বর্ণকমলের মলিন, শুষ্ক মুখ দেখিয়া জননী তাহা বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

'আজ খাওয়া হয় নাই বুঝি ?'

জননীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল,

'আমার তত ক্ষুধা পায় নাই।' জননীর প্রাণে এ কথায় প্রবোধ হইল না—তিনি পুত্রের আহারের দ্রুত-বন্দোবস্তের জন্য ব্যস্ত হইলেন। স্বর্ণকমল আর কালবিলম্ব না করিয়া পিতৃগৃহের দিকে গেলেন। দেখিলেন শয্যাপার্শ্বে কবিরাজ রামধন গুপ্ত বসিয়া আছেন। স্বর্ণকমল গৃহে প্রবেশ করিতেছিল, কবিরাজ হস্তসঙ্কেত দ্বারা তাহাকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া বাহিরে গিয়া স্বর্ণকমলের পদধূলি গ্রহণ করতঃ ফুস্ ফুস্ করিয়া বলিলেন,

'আজ তিন দিবসের মধ্যে একটু'ও নিদ্রা হয় নাই—কত ঔষধ

প্রয়োগ করিয়াছি, কোন ফল হয় নাই। এখন বেশ সুনিদ্রা হইয়াছে, আপনি না জাগিলে জাগান উচিত নহে। আপনি কাল প্রত্যুষে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।'

স্বর্ণ। এখন কিরূপ অবস্থা ?

কবিরাজ। জ্বরে বিরাম নাই। কিন্তু যখন সুনিদ্রা হইয়াছে, তখন আর চিন্তার কথা নাই।

কবিরাজ সে রাত্রে রোগীর গৃহে অধিক লোক থাকিতে বারণ করিলেন। সুতরাং স্বর্ণকমল-জননী ও মঙ্গলা দাসী ব্যতীত তথায় আর কেহ রহিল না। স্বর্ণকমল আহার করিয়া শয়নকক্ষে গেল। অবিলম্বে সুকুমারীও আসিল। দুই চারিটী কথার পরই স্বর্ণকমল সুকুমারীর মস্তকের আহত স্থানটী দেখিতে চাহিল। সুকুমারী সহসা এরূপ কথায় একটু অপ্রতিভ হইল; কারণ তাহার স্বামী কিরূপে একথা জানিতে পারিলেন, ইহা তাহার ভাবনার বিষয় হইল। অগত্যা সুকুমারীকে স্বামীর সঙ্গে ক্ষীণ দীপালোকের নিকট যাইতে হইল। স্বর্ণকমল আলোটা একটু বাড়াইয়া দিয়া, সুকুমারীর অর্দ্ধাবগুণ্ঠনাবৃত-কুঞ্চিত-কেশরাশি-শোভিত মস্তক অনাবৃত করিল; সুকুমারী নিজ হস্ত দিয়া ক্ষত স্থান দেখাইয়া দিল। স্বর্ণকমল উহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু ক্ষতটী নিতান্ত সামান্য না হইলেও তখন প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে, স্বর্ণকমল জিজ্ঞাসা করিল, 'পত্রে তুমি একথা লিখ নাই কেন ?'

সুকুমারী লজ্জাবনতমুখী হইয়া বলিল,

'তখন ঘা প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছিল, বেদনাও কমিয়াছিল, তাই আর লিখিলাম না।'

স্বর্ণকমল একটু বিরক্তির সহিত বলিল,

'তা, লিখিলে আর কি দোষ হইত?'

সুকুমারী দুঃখিত চিত্তে বলিল,

'আর আমি মনে করিলাম, পত্রে একথা লিখিলে তুমি হয়ত ইহাকেই গুরুতর আঘাত মনে করিয়া ব্যস্ত হইবে।

স্বর্ণ। তুমি কি ইহা ক্ষুদ্র ঘা মনে করিয়াছ?

সুকুমারী নিরুত্তরা রহিল।

স্বর্ণ। যাক্ সে কথা—ঔষধ দেয় কে?

সুকু। কবিরাজ মহাশয় একটা মলম দিয়াছিলেন, তাতেই ঘা প্রায় শুকাইয়াছে—জ্বরও আর হয় না।

সুকুমারী অন্য কথা উত্থাপন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবার সঙ্গে দেখা হইয়াছে?'

স্বর্ণ। না—কবিরাজ মহাশয় বারণ করিলেন।

সুকু। তুমি বাড়ী আসিয়া বড় ভাল করিয়াছ। এই তিন দিনের মধ্যে তাঁহার এক মুহূর্ত্ত ঘুম নাই। একটু তন্দ্রা হইলেই তোমার নাম করিতে করিতে জাগিয়া উঠিয়াছেন।

স্বর্ণ। অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া আমার বড় ভয় হইতেছে।

বলিতে বলিতে স্বর্ণকমলের মুখশ্রী গম্ভীর হইল। সুকুমারী এত দিন ইহা সামান্য জ্বর মনে করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল; স্বামীর কথা শুনিয়া একটু ভীতা হইয়া বলিল,

'ই-কি কথা বল। ব্যারাম কি কঠিন?'

স্বর্ণকমল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,

'কবিরাজ মহাশয় বলিলেন শীঘ্রই সারিয়া যাইবে।'

সুকুমারী ইহাতে সম্পূর্ণরূপ আশ্বস্ত না হইয়া বলিল, 'ভগবান্

করুন তাই যেন হয়—তোমার কথা শুনিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল!' স্বর্ণকমল অধিক কথা না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

'দাদাদের কোন সংবাদ পাইয়াছ কি?'

সুকু। হাঁ, তাঁহারা সম্প্রতি নিজ নিজ শ্বশুরবাড়ী আছেন। বাড়ী ঘর সব শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। কাল দিনের বেলায় দেখিতে পারিবে। ছেলে পিলে না থাকায় বাড়ীটা যেন একবারে শূন্য শূন্য বোধ হয়। কিছুই ভাল লাগে না।

স্বর্ণ। তুমি একটী বড় অন্যায় কাজ করিয়াছ।

সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল; স্বর্ণকমল ঈষদ্ হাসিয়া বলিল,

'আমাকে একটী শুভ সংবাদ দেও নাই কেন? ইহা তোমার ভারি অন্যায়।'

সুকুমারী বুঝিল যে, গিরিবালার পত্রে দীনেশচন্দ্র ও স্বর্ণকমল তাহার গর্ভসঞ্চার সংবাদ অবগত হইয়াছে। লজ্জায় সুকুমারী কথা কহিতে বা স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে পারিল না—স্থিরনেত্রে আপনার পদাঙ্গুলিগুলি দেখিতে লাগিল; শরীর হইতে ঘর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল। স্বর্ণকমল লজ্জাবনতমুখী স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া দেখিল এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল,

'সুকুমারী সত্য সত্যই বড় সুন্দরী।'

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মৃত্যুশয্যায়।

সে রাত্রে স্বর্ণকমলের সুনিদ্রা হইল না। অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান, হস্তমুখ প্রক্ষালন ও প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিয়া সে রুগ্নশয্যায় শায়িত পিতার নিকট গেল। রুগ্ন পিতা পিতৃবৎসল পুত্রকে দেখিয়া বড় প্রীত হইলেন—তাঁহার প্রফুল্লতা বদনমণ্ডলে প্রতিভাত হইল। 'তুমি এসেছ, বেশ করেছ; নহিলে আমার বড় কষ্ট হইত।' বলিয়াই তিনি থামিলেন। স্বর্ণকমল ভক্তিপূর্ণনেত্রে পিতার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল: দেখিল বৃদ্ধের শরীরের রং বিবর্ণ হইয়াছে, চক্ষু কোটরগত হইয়াছে, শরীর রুক্ষ ও শীর্ণ হইয়াছে। পুত্র পিতাকে বলিল,

'কাল সারা রাত্রি বোধ হয় আপনার সুনিদ্রা হয় নাই—আপনার চক্ষু লাল হইয়াছে—চেহারাও অত্যন্ত খারাপ দেখাইতেছে।'

পিতা। এ জনমে আর সুনিদ্রা হইবে না।

অবস্থা দেখিয়া ও পিতৃবাক্য শুনিয়া স্বর্ণকমলের বড় ভয় হইল। তাহার উপস্থিত বুদ্ধি লোপ হইয়া আসিল। রামধন গুপ্ত চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। ঔষধ প্রয়োগফলে জ্বর একটু কমিল বটে, কিন্তু "অনিদ্রা" দূর হইল না। কবিরাজ স্বর্ণকমলকে গোপনে বলিলেন,

"রোগীর মন সর্ব্বদা দুশ্চিন্তায় পূর্ণ—সুনিদ্রা হইবে কিরূপে? আর চিন্তা রোগেরই বা কি ঔষধ দিব? সুনিদ্রা না হইলেও

জ্বরের বিরাম হইবে না। এক কাজ করুন, হরিসাধন কবিরাজকে ডাকিয়া পাঠান; দুই জনে পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা করিব।'

গ্রামান্তরে হরিসাধন কবিরাজের বাস। তাঁহাকে আনান হইল। চিকিৎসাও চলিতে লাগিল, কিন্তু রোগক্রমে বাড়িতে লাগিল। রামকমল ও কৃষ্ণকমল পিতার ব্যারামের সংবাদ অবগত হইয়াও একবার পিতাকে দেখিতে আসিল না। অতঃপর তাহাদিগকে আনিবার জন্য ভৃত্য ভজহরি স্বর্ণকমলের হস্তলিখিত পত্র লইয়া গেল। রামকমল পত্র পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিল; কৃষ্ণকমল তাহার নামীয় পত্রখানা হাতেও লইল না। বলিল, 'এ পত্র লইয়া কি স্বর্গে যাইব?—আর মিষ্টি কথায় কাজ নাই।' ভৃত্য ভজহরি স্বর্ণকমলপ্রদত্ত উপদেশানুসারে বিহিত অনুনয় বিনয় করিয়া কহিল,

'কর্ত্তা অত্যন্ত পীড়িত, জ্বরের এক মুহূর্ত্ত বিরাম নাই—তাঁহার জীবন সংশয়। পুনঃ পুনঃ আপনাদিগকে দেখিতে চাহিয়াছেন, একবার গেলে বড় ভাল হইত।'

তাহার কাতরোক্তিতে ভ্রাতৃদ্বয়ের কঠিন প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইল না। বরং তাহারা এজন্য ভজহরিকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিল। কৃষ্ণকমল অতি কর্কশভাষায় কহিল,

'যাহাকে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, সে-ই ত আসিয়াছে, আমরা গিয়া কি করিব?'

রায় মহাশয়ের কঠিন পীড়া শুনিয়া রামকমলের গঙ্গাতীরে যাইতে প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল—কারণ সে ভাবিল যে, এ রোগে সত্য সত্যই পিতার মৃত্যু ঘটিলে সে সময়ে গঙ্গাতীরে উপস্থিত

না থাকিলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এখন গঙ্গাতীরে গেলে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে, মহামায়া কাপুরুষ ভাবিবে, এজন্য তাহার যাওয়া হইল না।

স্বর্ণকমল দীনেশচন্দ্রকে পত্র লিখিল। পত্র পাইয়া পর-দুঃখকাতর দীনেশবাবু কালবিলম্ব না করিয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন। তাহাকে দেখিয়া বৃদ্ধ আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এক দিন অপরাহ্নে জ্বর বড় বৃদ্ধি হইল। রায়মহাশয় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। শয্যার এক পার্শ্বে স্বর্ণ-কমল ও দীনেশচন্দ্র অপর পার্শ্বে চিকিৎসকদ্বয়; গিন্নি কৃপাময়ী ও পরিচারিকা মঙ্গলা, একটু দূরে, স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্টা। সক-লেই ব্যাকুলচিত্ত। রোগীর রোগযন্ত্রণাজনিত বিকৃত মুখ দেখিয়া সকলের মুখ ক্রমে মলিন, বিমর্ষ হইয়া উঠিল। স্বর্ণকমল বাষ্পপূর্ণ-লোচনে একখানি পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল রায়মহাশয় বলিলেন,

‘পাখার বাতাসে এ আগুন নিবিবে না—প্রাণের ভিতর যে দাবানল জ্বলিতেছে।’

স্বর্ণকমল কোন কথা বলিতে পারিল না, সকলের অল-ক্ষিতে সে বামহস্ত দ্বারা তাহার অশ্রু মুছিল, দীনেশচন্দ্র ম্লানমুখে অস্ফুট স্বরে বলিলেন,

‘কি করিলে আপনার কষ্ট দূর হইতে পারে?’

রায়মহাশয় শুষ্কমুখে বিকৃত হাসি হাসিয়া বলিলেন,

‘এ কষ্ট আমার সঙ্গে সঙ্গেই দূর হইবে।’

রায়মহাশয়ের মুখ বিকৃত হইল, তিনি এক মনে অনেক-

ক্ষণ কি চিন্তা কবিলেন। তাব পব স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্রকে লক্ষ্য কবিযা ভগ্ন স্ববে, ধীবে ধীবে বলিলেন,

'আমাব শরীবেব অবস্থা অত্যন্ত খাবাপ, শবীব ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতেছে, তাহা আমি বেশ অনুভব কবিতেছি। আমাব জীবনেব আব আশা নাই—এখন আব বাচিতেও সাধ নাই। রামকমল, কৃষ্ণকমলেব পুত্রকন্যাগুলিকে একবাব দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। ভজহবিব কথায তাহাবা আসিল না। অতএব স্বর্ণকমল! তুমি আব একবাব চেষ্টা কবিযা দেখ।'

বায়মহাশযের কথা শুনিযা সকলেব চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। স্বর্ণকমল মনেব বেগ সম্বরণ কবিযা, পিতৃ-আজ্ঞা পালন জন্য [illegible] হইতে বঞ্চিত হইবাব আশঙ্কায বামকমল গঙ্গাতীবে যাইবার জন্য বড ব্যস্ত হইযাছিল। মানেব খাতিবে ভজহবিকে ফিবাইযা দিবাব পব হইতে সেই ব্যস্ততা আরও বাড়িযাছিল, সুতবাং এবাব বামকমল কোন আপত্তি না কবিযা সপবিবাবে স্বর্ণকমলেব সঙ্গে চলিল। দাদা যাইতেছেন শুনিযা, পববুদ্ধিচালিত কৃষ্ণকমলও আব আপত্তি কবিল না। যথা সমযে ভ্রাতৃদ্বয় সপবিবাবে পিতৃ-গৃহে পৌছিল। ইহাদেব আগমনবার্ত্তা শ্রবণ কবিয়া বাযমহাশযেব মলিনমুখ আব একবাব প্রীত-প্রফুল্ল হইল। পুত্রদ্বয রুগ্নশয্যাযশাযিত পিতাব চবণধূলি গ্রহণ কবিল। বৃদ্ধেব শাবীবিক অবস্থাব ভীষণ পবিবর্ত্তন দেখিযা পুত্রদ্বয মনে মনে পিতাব মৃত্যু স্থিব করিল, কিন্তু তজ্জন্য ভ্রাতৃদ্বয বিমর্ষ হইল না। ববং পৃথকান্ন হইবাব সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া মনে মনে ভবিষ্যৎ সুখের চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিল। বড়-বৌ

ও মেজ-বৌ অন্তরাল হইতে মুমূর্ষু শ্বশুরের প্রতি একবার একটু দৃষ্টিপাত করিয়া, আপন আপন দ্রব্য সামগ্রী, তৈজসপত্র ইত্যাদি যথাস্থানে স্থাপন ও শয্যাবিন্যাস কার্য্যে নিযুক্ত হইল। নবলক্ষ্মী, নন্দগোপাল, ননীগোপাল, সুশীলা ও সরলা ঠাকুরদাদার শয্যা বেষ্টন করিয়া বসিল। রায়মহাশয় অনিমেষ লোচনে উহাদের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকালের মধ্যে তাঁহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। অন্যের অলক্ষিতে চক্ষু মুছিয়া বামহস্ত বিস্তার করিয়া চক্ষু দুটী ঢাকিয়া রাখিলেন। স্নেহরসে তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইল। আবার তাঁহার কিছু কাল বাঁচিয়া থাকিতে সাধ হইল।

[illegible] বালিকাদিগের প্রতি একবার চাহিলেন। উহাদের সরলতা মাখা মুখগুলি দেখিয়া তিনি পূর্ব্ব কথা সব ভুলিয়া গেলেন। আপনার বামহস্ত দ্বারা নন্দগোপালের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া স্নেহমাখা বচনে কহিলেন,

'নন্দা! তোরা আমায় এক্‌লা ফেলে কোথায় চ'লে গিয়েছিলে রে?'

কুশিক্ষাপ্রাপ্ত নন্দগোপাল প্রত্যুত্তরে কহিল,

'আমরা কি আর সাধ ক'রে গিয়েছিলুম? ছোট কাকীমার মিথ্যা কথা শুনে তুমি আমাদের তাড়িয়ে দিলে।'

রায়মহাশয় মুখ বিকৃতি করিলেন. সেই মুখ বিকৃতিতে বুঝা গেল যে, নন্দগোপালের কথা তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হইয়াছে। আবার তাঁহার চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল, আবার তিনি বস্ত্র দ্বারা মুখাবৃত করিয়া রাখিলেন। স্বীয় পরিবারের ভবি-

য্যৎ ভাবিয়া আবার তিনি ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপে অর্দ্ধ দণ্ড কাটিয়া গেল। পরে মুখের আবরণ ফেলিয়া দিয়া ঘন ঘন দুই তিনটী অতি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয়াবেগ কিয়ৎ পরিমাণে সম্বরিত হইল। 'ভগবানের ইচ্ছা' ভাবিয়া পুনরায় স্থৈর্য্যলাভ করিলেন। নবলক্ষ্মীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,

'নবলক্ষ্মি। তোরা কেউ আমায় ভালবাসিস্ না।'

নবলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে কহিল,

'আপনিও আমাদের ভালবাসেন না, ঠাকুর-মাও ভালবাসে না।'

রায়মহাশয় বালিকার নিকট এরূপ উত্তর আশা করেন নাই। ভাই ভগিনীর কথা শুনিয়া তিনি বিরক্তি সহকারে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন, উহাদের কথা গুলি তাঁহার কাণে বাজিতে লাগিল। বুঝিলেন, পিতৃ মাতৃ-দত্ত কুশিক্ষার বীজ উহাদের হৃদয়ে বিলক্ষণ অঙ্কুরিত হইয়াছে। বুঝিলেন, ইহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। আর অধিক কথা বলিতে তাঁহার সাধ রহিল না। কিছু কাল পরে বালক বালিকাগণ বাহিরে যাইয়া ছুটাছুটী করিতে লাগিল। ননীগোপাল ছোট কাকীমাকে পাইয়া হাসিয়া গিয়া তাহার কোল জুড়িয়া বসিল। ইহা দেখিয়া বড়-বৌ মহামায়ার চক্ষু টাটাইতে লাগিল. শিশু ননীগোপালের উপর তাহার বড় রাগ হইল এবং প্রথম অবসরেই উহাকে প্রচুর প্রহার করিয়া প্রতিশোধ লইবে, স্থির করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

রায়মহাশয়ের শেষ কথা।

সেই রজনীতে রায়মহাশয়ের একটু সুনিদ্রা হইল। পর দিন প্রাতঃকালে তাঁহার বদন অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল দেখা গেল। স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্রের আনন্দ হইল। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় আবার জ্বর হইল, চিকিৎসকদ্বয় ব্যস্ত হইলেন। যথারীতি ঔষধ প্রয়োগ চলিতে লাগিল। সূর্য্য অস্ত যায় যায়। রায় মহাশয়কে দেখিবার জন্য গ্রাম্য ভদ্রলোকগণ প্রায় সকলেই আসিয়াছেন। সকলেই মুখে মুখে তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন এবং তাঁহার আরোগ্য কামনা করিতে-ছেন। রায়মহাশয় সকলের প্রতি যথোচিত সম্মানের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, এবং তাঁহাদের নিকট ইহ কালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। সকলকেই কাতরকণ্ঠে বলিতেছেন,

'তোমাদের কাহার নিকট কখন কোনরূপ অপরাধ করিয়া থাকিলে, আমার এ সময়ে তোমরা সকলে আমাকে প্রাণ খুলিয়া ক্ষমা কর। হয়ত আমার আর তোমাদের সহিত আলাপ করিবার অবসর ঘটিবে না।'

এইরূপে অপরাহ্ণ কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হইতেছে দেখিয়া সকলে নিজ নিজ গৃহাভিমুখে চলিল। রায়মহাশয়ের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী, ইহা প্রায় সকলেই বুঝিতে পারিল। যাহারা নিজে কিছু বুঝিতে পারে না, তাহারাও পরের দেখাদেখি কাণাকাণি করিতে লাগিল, 'এবার আর অব্যাহতি নাই।' গ্রামের

ধীমান ব্যক্তিগণ রায়মহাশয়ের আশু মৃত্যু উপস্থিত বুঝিয়া মনে মনে বড় ব্যথিত হইলেন। কারণ তাঁহার ন্যায় সদাশয় ও অমায়িক প্রকৃতির লোক গ্রামে আর ছিল না। যাহারা রায়-মহাশয়ের নিকট কোন দিন উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, আজ তাহাদের কাহার কাহার চক্ষু হইতে এক ফোঁটা জলও বাহির হইল। হিংসুকের দল, পরশ্রীকাতরের দল, অদূরদর্শীর দল মনে মনে হাসিতে লাগিল, আর পেটুকের দল 'সম্পন্ন ব্যক্তির শ্রাদ্ধে অবশ্যই লুচি সন্দেশ হইবে' ভাবিয়া একটু উৎফুল্ল হইল।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল। রুগ্নশয্যার অনতিদূরে একটি মৃণ্ময় প্রদীপ মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। কবিরাজদ্বয় একের পর অন্যে নাড়া টিপিয়া মুখ বিকৃতি করিলেন। রায়-মহাশয় শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন,

'আর নাড়া দেখিয়া কি হইবে ?'

হরিসাধন কবিরাজ রায়মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,

'চিন্তা করিবেন না—এখনও চিন্তার বিষয় কিছু হয় নাই। ভগবানের নাম স্মরণ করুন।'

রায়মহাশয় আপনার শরীরের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,

'বেশ কথা, আমাকে ভগবানের নাম স্মরণ করাও, আর বৃথা ঔষধ প্রয়োগ করিও না।' এই বলিয়া ঔষধ সেবন ত্যাগ করিলেন। স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্র ব্যস্ত হইলেন এবং ঔষধ সেবন করিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। প্রত্যু-ত্তরে রায়মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,

'আমার প্রতি তোমাদের অটল ভক্তি আছে বলিয়া তোমরা

আমার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছ না। আর ঔষধ সেবন করিয়া কি হইবে? তোমরা দীর্ঘায়ু হও, ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন।'

তাঁহার কথা শুনিয়া গিন্নি কৃপাময়ী অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন। সুকুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে শান্ত করিতে বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্র ব্যাকুল হইলেন। অতঃপর চিকিৎসকদ্বয় স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্রকে অন্তরালে ডাকিয়া নিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,

'আজ নাড়ীর অবস্থা বড় ভাল নহে—একটু সাবধানে থাকিতে হইবে। বৃথা ভাবিয়া কি করিবেন। সকলই ভগবানের হাত।'

পিতৃভক্তিপরায়ণ স্বর্ণকমলের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, দৃষ্টিশক্তি লোপ হইয়া আসিল, নয়নকোণে অলক্ষিতে অশ্রু বাহির হইল। স্বর্ণকমলের ব্যাকুলতা দেখিয়া দীনেশচন্দ্র স্বর্ণকমলের হাত ধরিয়া বলিলেন,

"ছি! তুমি পাগল হইয়াছ? তুমি এরূপ অস্থির হইলে তোমার পিতা কাঁদিয়া আকুল হইবেন। স্থির হও—চল বিছানায় বসি গিয়ে।"

স্বর্ণকমল দীনেশ বাবুর কথানুরূপ কার্য্য করিল। রায়-মহাশয় স্বর্ণকমলের মলিনমুখ দেখিয়া গম্ভীর ও ভগ্নস্বরে বলিলেন,

'মন স্থির কর, ব্যাকুলতা ত্যাগ কর। দীনেশ বাবু তোমার প্রকৃত সুহৃদ্। তাঁহাকে দেখিয়া আমার আনন্দ হইতেছে। ইঁহার অনভিমতে এ জীবনে কোন কার্য্য করিও না—আর অধিক কি বলিব। এস—তোমরা আমার কাছে এস।'

স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্রের চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল। তাঁহারা

অশ্রুপূর্ণলোচনে রায়মহাশয়ের দুই পার্শ্বে দুই জন যাইয়া বসিলেন। অদূরে, কাষ্ঠাসনে গিন্নি কৃপাময়ী ও সুকুমারী বসিয়া হাঁটুর উপর মস্তক রাখিয়া অস্ফুটস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। রায়মহাশয় দীনেশচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

'দীনেশচন্দ্র! তুমি কত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এখানে আসিয়াছ। তোমাকে এ সময়ে আমি আশীর্ব্বাদ ব্যতীত কিছু করিতে পারিতেছি না। তুমি দীর্ঘায়ু হও, ভগবান্ তোমার সকল প্রকার মঙ্গল করুন।'

রায়মহাশয় অতি কষ্টে দীনেশচন্দ্রের গায় আপনার হাত বুলাইয়া দিলেন। এবার দীনেশচন্দ্র সত্যসত্যই কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, 'আপনার আশীর্ব্বাদে আমাদের মঙ্গল হইবে। আপনি আমার পিতৃ-স্থানীয়, স্বর্ণকমল আমার সহোদর ভ্রাতা।' আর কথা সরিল না। স্বর্ণকমল, কৃপাময়ী, সুকুমারী, পরিচারিকা মঙ্গলা সকলেই বস্ত্রের অগ্রভাগ দ্বারা নিজ নিজ চক্ষু মুছিতে লাগিল। রায়মহাশয় ব্যস্ততাসহকারে বলিলেন,

'ছি! তোমরা কাঁদিতেছ?—তোমরা একপ করিলে আমি অস্থির হইব। সকলে স্থির হও। দীনেশ! বাছাধন! তোমার কথায় আজ আমার প্রাণ শীতল হইল, এমন মধুর কথা অনেক দিন শুনি নাই। আমার অনেক কষ্ট আজ দূর হইল।'

তার পর স্বর্ণকমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন,

'স্বর্ণকমল। দীনেশচন্দ্রকে চিরকাল সহোদর জ্ঞানে কার্য্য করিবে। আমার ভাবনা ছিল, ভ্রাতৃ-সুখ তোমার অদৃষ্টে ঘটিবে না—আজ সে চিন্তা দূর হইল;—বড় সুখী হইলাম। আমার এ সংসারের ভার তোমার উপর, তা যেন মনে থাকে—ঠাকুর-

সেবা, মাতৃ-সেবা, পৈত্রিক ক্রিয়াকলাপ।' বলিতে বলিতে ক্লান্তি বোধ হইল। একটু থামিয়া চারি দিকে চাহিয়া বলিলেন,

'ছোট বৌ-মা কোথা?—ঐ খানে বুঝি?—এস মা লক্ষ্মি! লজ্জা কি মা? আমার কাছে আস্‌তে লজ্জা কি?'

গিন্নি কৃপাময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতে বলিলেন। অগত্যা সুকুমারী শয্যাপার্শ্বে গেল। স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্র শয্যাত্যাগ করিয়া একটু দূরে গিয়া বসিলেন। সুকুমারী শয্যাপার্শ্বে বসিল। মুমূর্ষু বৃদ্ধ বলিলেন

"মা! তুমি আমার লক্ষ্মী মা। তুমি যত দিন আছ, এ সংসারে লক্ষ্মী আছেন। সোণার সংসার হউক, সুপুত্রবতী হও. চিরসুখী হও, কিন্তু মা! একটী কথা। তীর্থস্থানে ভিন্ন আমার এ বাড়ী ত্যাগ করে তুমি কোথাও যেও না। সুখে হউক, দুঃখে হউক এখানেই থাক্‌বে। পিত্রালয়ে যাইলাও কোন বারেই একসঙ্গে অধিক দিন থাকিবে না। বল—প্রতিজ্ঞা কর—'যাব না'।"

সুকুমারী শ্বশুরের পাদস্পর্শ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে বলিল, 'যাব না'।

'ঘাড় নাড়িলা কেন মা? বল, মুখ ফুটিয়া বল যাবে না। আমার সঙ্গে কথা বলিতে লজ্জা কি?'

লজ্জাশীলা সুকুমারী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'যাব না'।

রায়মহাশয় অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল হইয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন,

'বেঁচে থাক মা। চিরকাল এয়ো হয়ে থাক।'

রায়মহাশয়ের কণ্ঠরোধ হইল।

সুকুমারী পূর্ব্বস্থানে চলিয়া গেল।

এ পর্য্যন্ত রামকমল, কৃষ্ণকমল কিম্বা তাহাদের স্ত্রী পুত্র

কন্যাগণ রায়মহাশয়কে দেখিতে আসে নাই। পাড়ার কত লোক আসিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু উহারা বাড়ীর উপর থাকিয়া একটীবার উঁকি মারিয়া দেখিল না। বালক বালিকাগুলি দুই একবার ঠাকুরদাদার নিকট আসিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বড়-বৌ তাহাদিগকে বারণ করিয়া বলিল,

'দেখে যেয়ে কাজ নাই। চুপ্ করে বসে থাক্, ডাকেত যাস।'

রায়মহাশয় জ্যেষ্ঠপুত্রদ্বয় ও তাহাদের পুত্রকন্যাগণকে দেখিবার জন্য ক্রমেই ব্যগ্র হইতেছিলেন, কিন্তু তাহারা এ পর্য্যন্ত আসিল না দেখিয়া মনের দুঃখে বলিলেন,

'তাহারা কি এখনও একবার আমায় দেখ্‌তে আস্‌বে না?'

বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু হইতে জল প্রবাহ বহিল। এ সংবাদ শুনিয়া রামকমল, কৃষ্ণকমল নবলক্ষ্মী, নন্দগোপাল, ননীগোপাল সুশীলা এবং মহামায়া ও মুক্তকেশী গিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিল। রায়মহাশয় চক্ষু মুছিয়া পুত্রদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

'আমার শেষ সময় উপস্থিত—বোধ হয় আর অধিক সময় বাঁচিব না। এ সময়ে তোমাদিগকে কয়েকটী কথা বলিয়া যাই, স্থির হইয়া শোন।—সকলে সদ্ভাবে থাকিও। নীচ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বৃথা আত্মকলহে মগ্ন হইও না, কেহ কাহাকে প্রতারণা করিতে চেষ্টা করিও না—তাহা করিলে সর্ব্বদর্শী ভগবান্ অসন্তুষ্ট হইবেন। এই পৃথিবীতে কেহই চিরকাল থাকিবে না। জন্ম, মৃত্যু একসূত্রে গাঁথা—জন্মের সহিত মৃত্যুর নিত্য সম্বন্ধ। সংসার মানুষের পরীক্ষার স্থান। এই পরীক্ষার ফল দেখিবার জন্যই ভগবান্ আমাদিগকে সংসারে পাঠাইয়াছেন। আমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে, আমি আজ চলিলাম।'

বলিতে বলিতে তাঁহার বিশাল চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। রুগ্নবৃদ্ধ হৃদয়বেগ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,

'আমি আজ চলিলাম—এইরূপ সকলকেই একদিন ভগবানের নিকট যাইতে হইবে। মানুষ এ কথাটা বড় সহজে ভুলিয়া যায়। নতুবা কেহ কাহার অনিষ্ট চিন্তা করিত না, নতুবা পাপকার্য্যে কাহারও মতি হইত না। দু'দিনের জন্যই বা সংসার! —আমার শরীর বড় দুর্ব্বল অধিক কথা বলিতে কষ্ট হয়। স্বর্ণকমল তোমাদের কনিষ্ঠ, তাহার প্রতি স্নেহের সহিত ব্যবহার করিও। কখনও পরের অনিষ্ট চিন্তা করিও না—তাহাতে নিজের ক্ষতি হয়। পরের উপকার করিতে পার ভাল, কাহারও অপকার করিতে চেষ্টা করিও না। বৌমারাও আমার এ কথাগুলি মন দিয়া শুনিও। আর একটা কথা—পুত্র কন্যাগুলিকে কুশিক্ষা দিও না, ইহা করিলে উহাদের পরকাল মাটী হইবে। পিতামাতার দোষে বালক বালিকারা মিথ্যাবাদী হয়, চোর হয়, আত্মরে হয়, অহঙ্কারী হয় নিন্দুক হয়। বাল্যকালে পিতামাতার যেরূপ স্বভাব ও আচার ব্যবহার দেখে, শিশুগুলি তাহাই শিক্ষা করে; পিতামাতা যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখায়, শিশুগণ তাহাই অনুকরণ করে।— দালানটা অসম্পূর্ণ রহিল—সিন্দুকে টাকা আছে, আগে সে কাজ করিও। মায়ের প্রতি কেহ অসদ্ব্যবহার বা অত্যাচার করিও না। তাহা করিলে ভগবান কখনই তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন না। আমি আর অধিক কি বলিব। তোমরা সকলে বেঁচে থাক—আমার দৃষ্টি কমিয়া আসিতেছে।—নবলক্ষ্মী, নন্দগোপাল, সুশীলা তোরা কৈ, সব? আয়, আমার কাছে আয়।' উহারা সকলে নিকটে গেল, মুমূর্ষু বৃদ্ধ তাহাদের গায় হাত বুলাইয়া

আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিলেন, 'ঝগড়া করিস্‌ না, হিংসা করিস্‌ না, মিছে কথা বলিস্‌ না, আর চুরি করিস্‌ না। ভগবান তোদের মঙ্গল করিবেন—বেঁচে থাক।' বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর ভগ্ন হইল, চক্ষু ঊর্দ্ধে উঠিল। বৃদ্ধ বহুকষ্টে কোমর হইতে চাবি খুলিয়া রাখিলেন, রামকমল তাহা তুলিয়া লইলেন।

রজনী দ্বিপ্রহর, সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ। রায়মহাশয় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন, প্রতি মুহূর্ত্তে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তৃষ্ণা বাড়িয়া উঠিল, চৈতন্য প্রায় লোপ হইয়া আসিতে লাগিল। স্বর্ণকমল, দীনেশচন্দ্র, কৃপাময়ী, সুকুমারী, মঙ্গলা, ভজহরি অবস্থা বুঝিয়া কাঁদিতে লাগিল, রামকমল ও কৃষ্ণকমল চক্ষে কাপড় দিয়া রহিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে অবস্থার ভীষণ পরিবর্ত্তন হইল। চিকিৎসকদ্বয় ইঙ্গিত করিলেন—মুমূর্ষু বৃদ্ধকে বাহিরে আনা হইল। বাহিরে আনা মাত্র রায় মহাশয়ের পঞ্চভূতাত্মক নশ্বরদেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া গেল। বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। বড় বৌ ও মেজো-বৌ চক্ষু মুছিতে মুছিতে নিজগৃহে গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

চুরি।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন জন্য মৃতদেহ শ্মশানে নীত হইল। ভৃত্য ভজহরি বাড়ীতে প্রহরী রহিল, আর সকলেই শ্মশান ঘাটে গেলেন। কিন্তু দাহকার্য্য আরম্ভ হইলে রামকমল কাহাকে

কোন কথা না বলিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে গৃহাভিমুখে গেল। তখন সকলে শোকে বিহ্বল, সুতরাং তাহার গমন কেহ লক্ষ্য করিল না। ভজহরি প্রভুশোকে প্রায় হতজ্ঞান হইয়া আঙ্গিনায় ভূমি-শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া রামকমল ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া পিতার গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহে মৃণ্ময় প্রদীপ মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। রামকমল আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, পিতার চাবি দ্বারা একটা লোহার সিন্ধুক খুলিল। সিন্ধুকে তিনটা তোড়ায় তিন হাজার টাকা এবং একটী ক্ষুদ্র তোড়ায় তিন শত তের টাকা নগদ ছিল। রামকমল ঐ তোড়া তিনটী তিন বারে অন্যত্র লুকাইয়া রাখিয়া আসিল। তিন শত তের টাকার তোড়াটী বাক্সেই রহিল, রামকমল তাহা গ্রহণ করিল না। একটী ক্ষুদ্র টীনের বাক্সে প্রাপ্য টাকার কতগুলি খত ছিল, রামকমল সে গুলিও হস্তগত করিল। পরে ধীরে ধীরে সিন্ধুকটা বন্ধ করিয়া একবার উঁকি মারিয়া ভজহরির প্রতি চাহিল, দেখিল সে তখনও তদবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। রামকমলের সাহস বৃদ্ধি হইল; সে পুনরায় গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া ছোট লোহার সিন্ধুকটী খুলিল। উহাতে রায়-পরিবারের পৈতৃক ভূসম্পত্তির কবলা ও অন্যান্য দলিল, রায়-মহাশয়ের নামের পিতলের মোহরটী এবং প্রতিবেশিনীগণের বন্ধক দেওয়া কতগুলি সোণার ও রূপার গহনা ছিল। রামকমল সে গুলি আত্মসাৎ করিল। তৎপর গৃহ হইতে বহিস্কৃত হইয়া ধীরে ধীরে পুনরায় শ্মশান ঘাটে যাইয়া ভূমিতে বসিল এবং হাঁটুর উপর মস্তক রাখিয়া মায়াক্রন্দন জুড়িয়া দিল। রামকমলের অনুপস্থিতি কেহ বড় লক্ষ্য করে নাই, সুতরাং তাহাকে কেহ

কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। রামকমলের চিন্তা দূর হইল—সে মনে মনে আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল।

দাহকার্য্য সমাপন হইল। রায় পরিবারস্থ স্ত্রী পুরুষ, পরিজনবর্গ ও প্রতিবেশীগণ স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া গৃহে গেল। তখন পূর্ব্বদিক রক্তিমাভ হইয়া উঠিতেছে। মুক্তকেশী ও কৃষ্ণকমল সন্তানগণ সহ ঘোর নিদ্রিত হইল। দুর্ব্বুদ্ধি পরিচালিত রামকমলের নিদ্রা হইল না। স্বর্ণকমল, তাহার জননী কৃপাময়ী, সুকুমারী ও বন্ধুদুঃখে কাতর দীনেশচন্দ্র মর্ম্ম যাতনায় কাতর হইয়া শয্যায় গেলেন বটে, কিন্তু নিদ্রাদেবী তাঁহাদিগকে অঙ্গে স্থান দিলেন না।

ভোর হইল। গভীর নিশির গভীর হরিবোল ধ্বনি শ্রবণে গ্রামের আবালবৃদ্ধ সকলে রায়মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ জানিতে পারিয়াছিল। এখন বিদ্যুদ্বেগে এই শোক সংবাদ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রচারিত হইতে লাগিল। দুই চারি জন নীচ প্রকৃতিক, ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই রায়-পরিবারের এই বিপদে আন্তরিক দুঃখিত হইল। নিকটবর্ত্তী পদস্থব্যক্তিগণ দলে দলে রায়বাড়ী আসিয়া স্বর্ণকমল প্রভৃতিকে সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা যথাসম্ভব আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। আজ অনেকের হৃদয়েই পরকালের কথা একবার উদয় হইল। 'এই মুহূর্ত্তে যে মানুষ কথা কহিতেছিল, সংসারচিন্তায় লিপ্ত ছিল, পর মুহূর্ত্তেই সে নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হইল! মানুষ মরিয়া কি হয়, কোথায় যায়? কেন এরূপ হয়?' ইত্যাকার চিন্তায় আজ অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের হৃদয় জুড়িয়া গেল।

বেলা এক প্রহর না হইতেই রায়-পরিবারের কুলপুরোহিত

রামনিধি বিদ্যালঙ্কার আসিলেন। তখন স্বর্ণকমল, রামকমল, দীনেশচন্দ্র ও গ্রামের আরও অন্যান্য লোক বৈঠকখানা গৃহে উপবিষ্ট। স্বর্ণকমলের মূর্ত্তি প্রশান্ত ও শোককাতর, চক্ষু বিস্ফারিত ও রক্তিমাভ। সারা রাত্রি কাঁদিয়া তাহার চক্ষের পত্র ফুলিয়া গিয়াছে। আর রামকমলের মূর্ত্তি দুশ্চিন্তাপূর্ণ; বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কিয়ৎকাল কোন কথা বলিতে পারিলেন না। স্বর্ণকমলের কাতরতাপূর্ণ ও শোকব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার চক্ষুও বাষ্পপূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মনের বেগ সম্বরণ করিয়া স্বর্ণকমলকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,

'বৃথা চিন্তা করিয়া কি করিবে—সকলই ভগবানের হাত। আমি আর কি বুঝাইব।'

স্বর্ণকমলের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল—সে কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ।

এদিকে রামকমল ক্রমেই অধৈর্য্য হইতেছিল। এখনও কেহ শ্রাদ্ধের কথা উত্থাপন করিতেছে না, লৌহসিন্দুক খুলিয়া নগদ তহবিল ইত্যাদি গণিয়া দেখিতে বলিতেছে, ইহাতে তাহার যাতনা উপস্থিত হইল। কোন প্রকারে এখন চাবিগুলি অন্যের হস্তে প্রদান করিয়া তাহার ঘাড়ে দায়ীত্ব ন্যস্ত করিয়া সে নিজে মুক্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে সে সুযোগ ঘটিয়া

উঠিল না। দীনেশচন্দ্রের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় স্বর্ণকমল একটু প্রকৃতিস্থ হইল। সুযোগ বুঝিয়া অপরাহ্নে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় শ্রাদ্ধের কথা পাড়িয়া বলিলেন,

'অদৃষ্ট দোষে পিতৃহীন হইলে, কিন্তু কি করিবে, এর ত আর উপায় নাই। তোমার পিতা একজন কৃতী মনুষ্য ছিলেন! এ অঞ্চলে তাঁহাকে কে না চিনে? আর তিনি বেশ দুপয়সা রাখিয়া গিয়াছেন, ইহাও সাধারণের ধারণা। এ অবস্থায় তাঁর শ্রাদ্ধের কি করবে না করবে বিবেচনা করে দেখ। আর সময়ই বা কৈ। আজ দু দিন যায়, মাঝে আর আট দিন বৈ ত নয়?'

স্বর্ণকমল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। রামকমল হাপ ছাড়িয়া বলিল,

'বিদ্যালঙ্কার জেঠা যাহা বলিলেন, তাহা ঠিক; যাহা হয় শীঘ্র করা কর্ত্তব্য। আর লোহার সিন্ধুকে কি আছে না আছে, সকলের সাক্ষাতে খুলিয়া দেখা উচিত। এই যে চাবি রহিয়াছে।' এই কথা বলিয়া চাবিগুলি স্বর্ণকমলের সম্মুখে রাখিল।

দীনেশ। এখন আপনার কাছেই চাবিগুলি রাখুন না কেন? আপনাকে ত কেহ অবিশ্বাস করিতেছে না।

রাম। না, তাহার প্রয়োজন নাই। টাকা পয়সার বিষয়, একটু সাবধান হওয়া ভাল। সকলের সাক্ষাতে তহবিল বুঝ হইলে বরং আমি চাবি রাখিতে পারি।

এইরূপ কথোপকথনের পর, তখনই লৌহ সিন্ধুক দুটী তল্লাস করিয়া নগদ তহবিল গণিয়া দেখা স্থির হইল। কৃষ্ণ-কমলকে ডাকা হইল। সে তখনও ঘুমাইতেছিল। কৃষ্ণকমল চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বহির্ব্বাটীতে আসিল। তার পর

ভ্রাতৃত্রয়, দীনেশচন্দ্র ও বিদ্যালঙ্কার মহাশয় রায়মহাশয়ের শয়ন গৃহে গেলেন। কৃষ্ণকমল সকলের সাক্ষাতে প্রথমতঃ বড় সিন্ধুকটী খুলিতে লাগিল। রামকমলের প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। কৃষ্ণকমল একটী ক্ষুদ্রতোড়ার টাকা ঘরের মেজেতে ফেলিয়া গণিতে লাগিল। দীনেশচন্দ্র বলিলেন,

'আগে হাজার টাকার তোড়া কটী বাহির করুন—

কৃষ্ণ। কৈ, এ বাক্সে আর ত টাকার তোড়া নাই।

দী। সে কি কথা? অবশ্যই আছে, দেখুন।

কৃষ্ণ। কৈ, দেখুন না কেন, কতগুলি কাগজ ছাড়া এ বাক্সে আর যে কিছুই নাই।

দীনেশচন্দ্র ও স্বর্ণকমল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সিন্ধুকের নিকট-বর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, প্রকৃতই উহাতে আর একটা কপর্দ্দকও নাই। দীনেশচন্দ্র ও স্বর্ণকমল পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন।

দী। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! তোমার দাদারা আসবার পূর্ব্বের দিন আমার সাক্ষাতে যে তিনটা তোড়ায় তিন হাজার টাকা রাখা হইয়াছিল। সে টাকা কি খরচ হইয়াছে?

স্বর্ণকমল অপ্রতিভ হইয়া বলিল,

'কৈ?—না! এত টাকা কিসে খরচ হ'বে?'

দী। তবে?

স্ব। কি আর বলিব, নিশ্চয়ই চুরি হইয়াছে।

লৌহসিন্ধুকে রক্ষিত টাকা সম্বন্ধে স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্র যে অবগত আছেন, রামকমল ইহা জানিত না। জানিলে হয়ত সে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে লিপ্ত হইত না। এখন সে মনে মনে

একটু ভীত হইল। কিন্তু এ অবস্থায় সাহস প্রদর্শনই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া, সে বলিল,

'দেখুন দেখি সময়ে চাবিগুলি না দিলে, পরে এ সন্দেহ যে আমার উপরই পড়িত।'

দীনেশ বাবু এ কথায় লক্ষ্য না করিয়া স্বর্ণকমলের প্রতি কহিলেন,

'বোধ হয় তোমার ভুল হইয়াছে—টাকাগুলি বোধ হয় ঐ ছোট সিন্দুকে রাখিয়াছ।'

স্বর্ণ। না, এই সিন্দুকেই রেখেছিলুম, আমার বেশ স্মরণ আছে। তিন চারি দিনের কথা বৈ ত নয়।

দী। একবার ছোট সিন্দুকটী অনুসন্ধান করিয়াই দেখ না কেন—ভুল ভ্রান্তি সকলেরই আছে।

স্বর্ণকমল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,

'ছোট সিন্দুকে কতগুলি বন্দকী সোণার গহনা, কতগুলি খত, আর কয়েকখানা প্রয়োজনীয় দলীল মাত্র আছে। সন্দেহ ভঞ্জন করিতে হয়, একবার খুলিয়া দেখ।'

অতঃপর ছোট সিন্দুকটী খোলা হইল। সকলে সতৃষ্ণ নয়নে উহার অভ্যন্তরের দিকে চাহিল, কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! উহাতে টাকা ত নাই-ই,—গহনাপত্র, দলীল ইত্যাদি কিছুই নাই! স্বর্ণকমল মস্তকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। বলিল,

'টাকা, কড়ি গহনাপত্র সর্ব্বস্ব গিয়াছে—খতগুলি গিয়াছে, দলীলগুলি গিয়াছে। পথের ভিখারী হইলাম, তাহাতে ভাবি না, কিন্তু পরের বন্ধকী গহনাগুলি যে গেল, তাহার কি হইবে?—আমি কি উপায় করিব?'

সকলে নির্ব্বাক হইলেন। গত রজনীতে যখন বাড়ীর সকল লোক শ্মশানঘাটে ছিল, তখন চুরি হইয়াছে, ইহা সকলেই সিদ্ধান্ত করিল। গ্রামে রাষ্ট্র হইল, রায়বাড়ী গত রাত্রে ভয়ানক চুরি হইয়া গিয়াছে। সকলে চুপি চুপি বলাবলি করিতে লাগিল, 'এ কি রকম চুরি গা? সিন্দুকে চাবি বন্ধ আছে, অথচ ভিতরের মাল সাবাড়!—এ যে আশ্চর্য্য রকমের চুরি!! চোরের ফের চাবি বন্ধ করিয়া যাইবার কি প্রয়োজন ছিল? আর চোরে কাগজপত্র চুরি করিবে কেন?' কেহ বলিল, 'ঘরের ইঁদুর বাঁধ না কাটিলে এমন হয়? ইহা নিশ্চয়ই ভজহরির কাজ।' কেহ তাহার উত্তরে বলিল, 'ভজহরি বহুকালের পুরাতন বিশ্বাসী লোক—সে কখনও এ কাজ করে নাই। আর সে চাবি পাইবে কোথা? সে চোর হইলে চিরকাল এক বাড়ীতে কাটাইয়া যাইতে পারিত না।'

রামকমলের বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল, সে মনে মনে ভাবিল, 'অনেক লোভ করিয়া ভাল কাজ হয় নাই, খতগুলি না নিলেই ছিল ভাল; আর ফের চাবি বন্ধ করিয়া রাখা নেহাত আহাম্মকী হইয়াছে। দীনেশচন্দ্র অনেকক্ষণ মনে মনে কি ভাবিলেন, তার পর স্বর্ণকমলের কাণে কাণে বলিলেন,

'আমার বোধ হয়, এ তোমার বড়দাদার কাজ—তুমি এখন যাহাই বুঝ।'

স্বর্ণকমল কহিল, 'ভগবান জানেন।'

কিন্তু ক্রমে ক্রমে রামকমলের উপরই সকলের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সাহেব বন্ধু।

রায়মহাশয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই চুরির সংবাদও অতিরঞ্জিত হইয়া দেশময় ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। কেহ বলিল, 'সিঁদ-চুরি হইয়াছে'; কেহ বলিল, 'ডাকাত পড়িয়াছিল—দস্যুরা পাঁচ ছয়টা মশাল জ্বালিয়া, হাতে অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দালানের কপাট ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া লৌহ-সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সর্ব্বস্ব লুটপাট করিয়া লইয়া গিয়াছে। নগদ প্রায় দশ হাজার টাকা নিয়াছে—তা ছাড়া সোণা রূপার গহনা যে কত নিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।' আর কেহ বলিতে লাগিল, 'রায়মহাশয়েরা চোর ধরিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।'

এ ঘটনায় কি করা কর্ত্তব্য, স্বর্ণকমল তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। থানায় খবর দিলে যদি প্রকৃত চোর ধরা পড়ে, তবে হয় ত বংশে কলঙ্ক থাকিয়া যাইবে—জ্যেষ্ঠ সহোদরের কারাবাস দণ্ড হইবে। স্বর্ণকমলের হৃদয়ে এ চিন্তাও উদয় হইতে লাগিল। 'চোর ধরিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে' এ কথা সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছে, সুতরাং এ কথা থানায় পৌছিলে কিম্বা কেহ বাদী হইয়া দরখাস্ত করিলে বিপদ ঘটিতে পারে। এইরূপ বিপরীত চিন্তায় তাহার মন বিলোড়িত হইতে লাগিল। অগত্যা সকলে পরামর্শ করিয়া থানায় একটা সংবাদ দিয়া রাখাই স্থির হইল, কিন্তু রামকমল এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতে পারিল না। সে বলিল,

'থানায় খবর দিয়া কি লাভ হইবে? নিজদের অনুসন্ধান

করিয়া দেখা উচিত। থানায় খবর দিলে পুলীশ কর্ম্মচারীতে বাড়ী ভরিয়া যাইবে, মেয়েদের প্রতি অত্যাচার হইবে, অথচ লাভ কিছুই হইবে না।' বলিতে বলিতে রামকমলের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং রামকমলের প্রতি তাহাদের সন্দেহ আরও বাড়িল। রামকমলের চরিত্র ভাবিয়া তাহার প্রতি তাঁহাদের উভয়েরই এক প্রকার বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিল। এরূপ নীচ প্রকৃতি ব্যক্তির আদালতে দণ্ড হওয়াই উচিত, দুই একবার একথাও তাহাদের মনে জাগিতেছিল।

থানায় চুরির সংবাদ প্রেরিত হইল, কিন্তু কাহারও প্রতি সন্দেহ করা হইল না। ইহার পূর্ব্বেই গ্রাম্য চৌকীদার থানায় সংবাদ দিয়াছিল, গত রাত্রে ৺কালীকান্ত রায়ের বাড়ীতে প্রায় দশ হাজার টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে। রায়-পরিবার ধনশালী বলিয়া জনশ্রুতি ছিল। সুতরাং পুলীশ কর্ম্মচারিগণ কথাটা নিতান্ত উড়াইয়া না দিয়া একবার তদন্ত করিয়া দেখা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। বিশেষতঃ সে দিন জেলার বড় পুলীশ ইউল সাহেব থানায় উপস্থিত ছিলেন। গঙ্গাতীর হইতে মোহন-গঞ্জ থানা এক ক্রোশের পথ মাত্র। ইউল সাহেব বঙ্গের পল্লী-গ্রাম দেখিতে বড় ভালবাসিতেন—সুতরাং তিনি এ সুযোগ ছাড়িলেন না। স্বয়ং দলবল সহ এই চুরির অনুসন্ধানে চলি-লেন। থানার ইন্স্পেক্টার মহেন্দ্র বাবুর ঘোটকটী সাহেবের বাহন হইল। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোকের নিকটই সাহেব একটা অভিনব পদার্থ, সাহেবরা কিরূপ জীব—ইহাদের কয় হাত, কয় পা এবং ইহারাও সাধারণ মানুষের ন্যায় কি না,

অনেকে এ কথা জানে না, সুতরাং সাহেবের আগমনে সমস্ত গ্রামে একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। নীচ শ্রেণীর গৃহস্থগণ, হংস, ছাগল ও কুক্কুট ইত্যাদি গৃহপালিত পক্ষী গুলি সাবধানে লুকাইয়া রাখিতে লাগিল। যাহাদের একাধিক পুত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নাকি কার্য্যের ব্যপদেশে পুত্রদিগকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিল—ভয়, পাছে সাহেব তাহাদিগকে যুদ্ধে পাঠাইয়া দেন।

পূর্ব্বাহ্ণ দশটার সময় সাহেব রায়বাড়ী পৌছিলেন। সংবাদ পাইয়া স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্র ভীত হইয়া অন্দরবাটী হইতে বহির্ব্বাটীতে গেলেন। রামকমলের প্রাণ উড়িয়া গেল, এবং অধিক পীড়াপীড়ি দেখিলে, সমস্ত স্বীকার করিবে স্থির করিল—কারণ, পুলীশ যে কিরূপ প্রকৃতির জীব তাহা সে কিছু কিছু অবগত ছিল, নানাকারণে তাহার উপরই যে সকলের সন্দেহ হইয়াছে, ইহা সে বুঝিতে পারিল। এই ব্যাপারে স্থূল-বুদ্ধি কৃষ্ণকমলও তাহার বিরোধী হইল এবং আবশ্যক হইলে সে গুণের বড়দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেও প্রস্তুত হইল। গতিক দেখিয়া রামকমল বড়ই ভীত হইল এবং কৃষ্ণকমলকে তাহার পক্ষে টানিয়া লইবার জন্য সমধিক ব্যগ্র হইল। কৃষ্ণকমলের মতি ফিরাইতে যে তাঁহার অধিক সময় লাগিবে না, তাহা সে জানিত। বহির্ব্বাটীতে পুলীশ আসিয়াছে শুনিয়া, রামকমল ব্যস্ততা সহকারে কৃষ্ণকমলকে গৃহের অন্তরালে ডাকিয়া নিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল,

'কৃষ্ণকমল, শোন! তুমিও কি ওদের সঙ্গে ক্ষেপ্‌লে নাকি? আমি কি তোমার কথা ছাড়া? আমি যাহা করিয়াছি, তোমার

জন্য আর আমার জন্যই করিয়াছি। জান ত স্বর্ণকমলকে বাবা গোপনে ঢের টাকা দিয়ে গ্যাছেন, আমি যাহা সরাইয়াছি, বৃথা কেন স্বর্ণকমলকে তাহার ভাগ দিতে যাইব? এ বিপদ চুকিয়া গেলে, তোমাতে আমাতে উহা সমান ভাগ করিয়া নিব। তুমি ওদের সঙ্গে সঙ্গে নেচ না। জান ত আমি কি প্রকৃতির লোক।'

কৃষ্ণকমল একটু হাসিয়া বলিল, 'তা, আগে আমাকে বলিলেই ত সব চুকিয়া যাইত। আচ্ছা—কত টাকা?'

রামকমল একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিল,

'সে সব কথা পরে জান্‌তে পার্‌বে। তার জন্য ভাবনা কি? আমি ত আর তোমায় ঠকাব না?'

কৃষ্ণকমল রামকমলের পক্ষাবলম্বন করিল। রামকমল মনে মনে ভাবিল যে স্বর্ণকমল ও দীনেশচন্দ্র অতি স্থলোক, তাহারা মুখে যাহাই বলুন না কেন, তাহাকে কখনও বিপদে ফেলিবে না। এই ভরসায় সে তাহাদিগকে কোন কথা বলিল না। টাকা ও গহনা ইত্যাদি অপহৃত দ্রব্যগুলিও ফিরাইয়া দিবার প্রস্তাব করিল না।

এদিকে সাহেবকে দেখিবার জন্য গ্রামের অধিকাংশ লোক একত্রিত হইয়াছে। তাহারা সকলে সাহেবকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। সাহেব ইহাতে কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া দীনেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহারা কি চায়?'

দী। কিছু চায় না—আপনাকে দেখিতে আসিয়াছে।

কথা বার্ত্তা হইতেছিল ইংরাজীতে—সুতরাং গ্রামের লোক তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সাহেব অতঃপর উপস্থিত বিষয় উত্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

'কোথায়, কিরূপে, কি কি দ্রব্য চুরি হইয়াছে, বলুন।'

দীনেশচন্দ্র স্বর্ণকমলকে দেখাইয়া বলিলেন,

'ইহাদের বাড়ী—সমস্ত কথা ইহার বলাই ভাল, আমার বাড়ী এ গ্রামে নয়। আমি এখানে বেড়াইতে আসিয়াছি।'

স্বর্ণকমল একটু অগ্রসর হইয়া সাহেবের সম্মুখীন হইল। সাহেব তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া পুনরায় দীনেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

'আপনার বাড়ী এ গ্রামে নয় বলিলেন, তবে কোথায়?'

দীনেশ। চন্দনবাগ গ্রামে।

সাহেব। চন্দনবাগ গ্রাম আমার বোধ হয় অপরিচিত নহে—আমি সেখানে অনেকবার শীকারে গিয়াছি।

দীনেশ। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে আমাদের গ্রামে জেলার অনেক সাহেব শীকারে আসিতেন।

সাহেব। সে গ্রামের জমীদার রাধাকান্তবাবু আমার বন্ধু ছিলেন।

দীনেশচন্দ্র সসম্ভ্রমে বলিলেন, 'তিনি আমারই পিতা।'

সাহেব সে কথায় প্রীতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, 'আপনি তাঁহারই পুত্র। শুনিয়া বড় সুখী হইলাম; আমি অনেকবার আপনাদের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি—তখন আপনি ছেলেমানুষ ছিলেন।' এই কথা বলিয়া সাহেব দীনেশ বাবুর হাতে ধরিয়া তাঁহাকে আপনার পার্শ্বে একখানি চেয়ারে বসাইলেন। তাঁহার পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কিরূপে স্বর্ণকমলের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে, তাহাও জানিয়া লইলেন। এইরূপে অনেকক্ষণ দীনেশচন্দ্র ও স্বর্ণকমলের

সঙ্গে আলাপ করিলেন, এবং সুন্দর ইংরাজীতে কথা কহিতে পারেন বলিয়া উভয়ের প্রশংসা করিলেন। তৎপর স্বর্ণকমলের পিতৃ-বিয়োগে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া পুনরায় চুরির কথা উত্থাপন করিলেন। স্বর্ণকমল তদুত্তরে বলিল,

'সবে আমার পিতা মরিয়াছেন। এখনও সংসারের আর্থিক অবস্থা ভাল বুঝিতে পারি নাই। তহবিলে কত টাকা ছিল, তাহা সব আছে কি না, চুরি করিয়া থাকিলে, কে চুরি করিয়াছে, তাহা নিঃসংশয়রূপে বলিতে পারিতেছি না। এজন্য সম্প্রতি চুরির অভিযোগ উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক নহি—প্রয়োজন হইলে পরে অভিযোগ করিব।'

সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন,

'বুঝিলাম, তোমরা বিষয়টা চাপা দিতে চাহিতেছ—বোধ হয় কোন আত্মীয়লোক এ ব্যাপারে লিপ্ত আছে। কিন্তু যাউক, তোমরা বাদী না হইলে আমি মোকদ্দমা চালাইব না—আমি তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বড় সুখী হইয়াছি। কিন্তু তোমাদের কাহার প্রতি সন্দেহ থাকিলে আমাকে বলিতে পার—তোমাদিগকে কোন ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হইবে না—সে ভয় করিও না।'

স্বর্ণকমল সত্যপ্রিয়, কিন্তু মমতা শূন্য নহে। টাকার জন্য আপন জ্যেষ্ঠ সহোদরকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। বলিল,

'আপনার বড় অনুগ্রহ দেখিতেছি—সুতরাং আপনার নিকট কোন কথা গোপন করা ভাল বোধ হইতেছে না। এক ব্যক্তির প্রতি সন্দেহ হইতেছে বটে, কিন্তু শুধু সন্দেহের

উপর নির্ভর করিয়া একজনকে বিপদগ্রস্ত করা সঙ্গত বোধ করিতেছি না।'

সাহেব। তোমার সরল কথায় সন্তুষ্ট হইলাম। আমি পীড়াপীড়ি করিতে চাহি না। পরে প্রয়োজন হইলে আমাকে জানাইও, আমি সাধ্যানুসারে তোমাদের উপকার করিব।

সাহেবের সঙ্গে খানা আসিয়াছিল, তিনি তাহা উদরস্থ করিলেন। অনুচরবর্গ স্বর্ণকমলের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় সাহেব বন্ধুদ্বয়কে বলিয়া গেলেন,

'তোমাদের সহিত পরিচয় হওয়ায় আমি বড় সুখী হইলাম। যখনই তোমরা জেলায় যাইবে, আমার কুঠীতে যাইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিলে, আমি আরও সুখী হইব। আমার দ্বারা কখন কোন রূপ উপকার হইলে, সাধ্যানুসারে তাহা করিব।'

সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে পুলীশ কর্ম্মচারিগণও চলিয়া গেলেন। এ যাত্রা একরূপ নিষ্ফল হইবে, ইহা তাহারা পূর্ব্বে মনে করে নাই। সুতরাং মফস্বল আসিয়া একবারে শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাইতে হইল বলিয়া তাহাদের মনে বড় দুঃখ হইল। সাহেব তদন্তে আসিলেন, এত লালপাগড়ীওয়ালা আসিল, তবু কাহারও খানা তল্লাস হইল না, হাতকড়ি পড়িল না, কাহাকেও গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল না দেখিয়া, গ্রামের লোক বিস্মিত—কেহ কেহ বা দুঃখিত হইল। সাহেবের সঙ্গে এতক্ষণ কি কথা হইল, সকলে দীনেশচন্দ্র ও স্বর্ণকমলকে পুনঃ পুনঃ সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দম্পতীযুগল।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে দীনেশচন্দ্রের শ্বশুরালয় এই গঙ্গাতীর গ্রামে। ৺কালীকান্ত রায়ের জ্ঞাতিকন্যা শ্রীমতী গিরিবালা তাঁহার পত্নী। গিরিবালার পিতা হরিপদ রায় সঙ্গতিপন্ন লোক নহেন। কয়েক জন শিষ্য আছে। ইহার যৎসামান্য আয় দ্বারা কোন প্রকার দিন যাপন হয়। বাড়ীতে চারিখানা খড়ের ঘর আছে। পরিজনের ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেই তাঁহার ক্ষুদ্র আয় ফুরাইয়া যায়, তাই সকল সময় ঘরের চালে খড় যোগাইতে তাঁহার কষ্ট হয়। কিন্তু তিনি ন্যায়পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ ও স্বাধীনচেতা। নিজের ব্যয় সংকুলনার্থ পরপ্রত্যাশী হওয়া তিনি অপমানজনক বোধ করেন, এজন্য কখনও পরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন না। তাঁহার জামাতা দীনেশবাবু সঙ্গতিপন্ন লোক। সুতরাং ইচ্ছা করিলেই জামাতার নিকট সাহায্য পাইতে পারেন, কিন্তু তিনি কখনও সাহায্যপ্রার্থী হন নাই। নিজের অবস্থা ভাল নহে বলিয়া, এ পর্য্যন্ত কখনও জামাতাকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে পারেন নাই, সুতরাং দীনেশবাবুর এ পর্য্যন্ত শ্বশুরালয় দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। এদিকে গিরিবালার মাতা জামাতাকে দেখিবার জন্য দিন দিন ব্যাকুলা হইতেছিলেন। দীনেশচন্দ্র গঙ্গাতীরে আসিয়াছেন অবধি সে ব্যাকুলতা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। স্বর্ণকমলের পিতা যখন রুগ্নশয্যায় শায়িত, তখন তাঁহাকে দেখিবার উপলক্ষে রায়বাড়ী যাইয়া, অন্তরালে থাকিয়া, জামাতাকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার সাধ

দু পাঁচ দিন পিত্রালয়ে থেকে দেখি বেশ একজন কবি হয়ে উঠেছ।

গি। কি বলিলে—'কবি' না 'কপি'? 'কপি' শব্দের অর্থটা কিন্তু আমার জানা আছে। বিদ্যা বড় কম নয়!

দী। এখন একটা টোল খুলিলে ভাল হয় না?

গি। মনের মত ছাত্র পাইলে খুলিতাম বৈ কি?

দী। চেষ্টা করিলে ভাল ছাত্র জুটিতে পারে।

গি। গুরুভক্ত শিষ্য জোটে কৈ? জুটিলে তাহাকে কিছু গৃহস্থলী শিখাইতাম, কিসে স্ত্রীলোকের সুখ দুঃখ হয় তাহা বুঝাইয়া দিতাম। যে এক ছাত্র পাইলাম, কপাল দোষে, তাহার মাথা পাকিয়া গিয়াছে—সে এখন নূতন পাঠ লইতে চায় না।

দীনেশচন্দ্র স্নেহভরে গিরিবালাকে নিকটে বসাইয়া বলিলেন, 'আজ যে সব নূতন কথা, ব্যাপার খানা কি?'

গি। আজ সবই নূতন, কথা নূতন না হবে কেন?— মহাশয়ের ত বুঝি বড় কষ্ট হচ্ছে।

দী। মহাশয়ার যে গজেন্দ্রগমন, কষ্ট হয়েছিল বৈ কি? আমি ভাবলুম, আপনি বুঝি আস্‌বেন না। আস্‌তে বুঝি বড় ইচ্ছা ছিল না?

গি। আমার জন্য ত তোমার ঘুম হয় না।

দী। সে কথা কতক সত্য বটে।

গি। আর বলিতে হইবে না—আজ কদিন ধরে এখানে এয়েছ, একটীবার দেখা কল্লে না। বাবা যদি আজ না যেতেন, তবে বোধ হয় ওখান থেকেই চলে যেতে।

তারপর, গিরিবালা সগর্ব্বে বলিল,

'বাপ, মা ববং গবীব—দীন, দুঃখী। আমি ত আব এখন গবীব নই। দয়া কবিয়া আমাকে একটীবাব দেখিতে আসিলে কি সম্মান খসিয়া পড়িত, না জমিদাবী নীলাম হইয়া যাইত? তুমি এখানে আসিলে, দু'দিন আমবা অপেক্ষা কবিলাম। তুমি আসিলে না দেখিয়া অগত্যা আমি আব মা, ঝিকে সঙ্গে লইয়া স্বর্ণদাদাব বাড়ী যাইয়া আড়ালে থেকে তোমাকে দেখিয়া আসিলাম।'

দীনেশচন্দ্র পত্নীব মুখচুম্বন কবিয়া বলিল,

'বেশ কবেছ, বেশ কবেছ। আমি বোজই আসব আসব ভাবছিলুম, কিন্তু ওদেব এ বিপদ, কি কবে আসি বল?'

গি। মন থাক্‌লে সব হয়। তোমাদেব ইংবেজী কেতাবে বুঝি মেয়ে মানুষেব সুখ দুঃখেব কথা কিছু লেখা নাই। নইলে মানুষগুলি এত বোঝে, অন্ন বোঝে না, কেন?—তাই ত বল-ছিলুন, একটা ভাল ছাত্র পাইলে কিছু শিখাইতাম।

দী। আমি ছাত্র হইতে প্রস্তুত আছি।

গি। তোমাব মাথা পাকিয়া গিয়াছে, সহজে নূতন পাঠ স্থান লইবে না। না—তামাসা যাউক, তোমাব ত আজ কষ্ট হইতেছে?

দী। কিসেব কষ্ট?

গিবিবালা মৃদু হাসিয়া বলিল,

'এমন সুন্দর শয্যায় কখন শোও নাই—এমন খাওয়াও বোধ হয় খাও নাই।'

দী। কেন, খাওয়া ত বেশ হয়েছে।

গি। বেশ বৈ কি?—বিদুরেব ক্ষুদ কণা।

দী। তোমার এত দৈন্যতাব প্রয়োজন নাই।

গি। আমি দৈন্যতা করিব কোন্ দুঃখে? আমার অভাব কিসেব? আমার মত অদৃষ্ট ক জনেব?

দীনেশচন্দ্র পুনবপি রূপলাবণ্যবতী, সুচতুবা ভার্য্যার অলকা-গুচ্ছশোভিত সুকোমল গণ্ডদেশে স্নেহভবে চুম্বন কবিলেন। সারা নিশি বসিযা প্রেমের কথা বলিলেও যত অনুরাগ প্রকাশিত হয না, একটী চুম্বনে তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক অনুবাগ প্রকাশিত হইল। সেই চুম্বনে বলিল, 'আমি তোমাকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভালবাসি।'

বাত্রি অধিক হইযাছে। আলো নির্ব্বাপিত হইল। দরমাব বেড়া ভেদ কবিযা চন্দ্রেব বশ্মি গৃহে প্রবেশ কবিয়াছে।

গিবিবালা স্বামীকে তাহা দেখাইযা বলিল,

'দেখ দেখি এ ঘরে আজ কত মণি মুক্ত জ্বলিতেছে। তোমাব জীবনে কখনও এরূপ সোণাব ঘবে শোও নাই—শুইবেও না। এ জন্য আমাদিগকে তোমাব কিছু বকসিস দেওযা উচিত।'

দীনেশচন্দ্র বলিলেন, 'বক্সিস্ পাইবে বৈ কি? সে জন্য ভাবিও না। বক্সিস্ দিব বলিযাই ত আনিযাছি।'

ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ।

যাব যাব, তার তাব।

পরদিন প্রাতঃকালে কিছু জলযোগ করিয়া দীনেশচন্দ্র স্বর্ণ-কমলেব বাড়ী গেলেন। সকলে রামকমলের নিকট হইতে অপ-

হৃত ধনাদি পুনঃ প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রামকমল কিছুতেই হটিলেন না। এখন আর কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা নাই স্থির বুঝিতে পারিয়া, সকলের সমক্ষে, যেন একটু ক্রোধের সহিত সে বলিল,

'আমার নিকট টাকা চাওয়া হইতেছে কেন?—আমি কি চোর নাকি? চুরি করিয়া থাকি বেশ করিয়াছি—সাধ্য থাকিলে আমাকে পুলীশে দিলেই ত হয়! অত কাণাকাণি হানাহানির প্রয়োজন কি?—আমার স্পষ্ট কথা, মন চায় খুসী হও, মন চায় বেজার হও। আমি কোন বেটার ধার ধারি না। এদেশে যদি উচিত বিচার থাক্‌ত, তবে এত দিন আমার নিজ উপার্জ্জনের যে টাকাগুলি সংসারে দিয়েছি, তাহা আমাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইত!'

রামকমলের কথা শুনিয়া সকলে অবাক্ হইল!

দীনেশচন্দ্র বিরক্তি সহকারে বলিলেন,

'সকল অবস্থায় ভদ্রতা ভাল নহে, পুলীশ তদন্ত হইলেই ভাল ছিল, আমার বিবেচনায় এখনও পুলীশে সন্দেহ করিয়া খবর দেওয়া উচিত।' তারপর স্বর্ণকমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন,

'আর ভাবছ কি? যাহা গিয়াছে, তাহার আশা ত্যাগ কর। একটু কঠিন হইতে পারিলে এখনও কূল কিনারা করা যাইতে পারে, ভদ্রতায় কিছুই হইবে না।'

স্বর্ণকমল কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হউক, তবুও পিতার নামে কলঙ্ক রাখিব না। পৈতৃক ধনসম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তাহার আশা ত্যাগ করিলাম।' কৃষ্ণকমল সে কথার পোষকতা করিলেন। সুতরাং এখন হইতে রামকমলের কোনরূপ চিন্তা রহিল না।

৺ কালীকান্ত রায়ের শ্রাদ্ধ ভালরূপ হইতে পারিল না। তহবিলে তিন শত তের টাকা মাত্র ছিল। প্রাপ্য টাকার খত গুলিও চুরি গিয়াছে, কাহার নিকট টাকা পাওয়া গেল না। সুতরাং ঘরের ঐ সামান্য টাকায় কোনরূপে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইল। যাহারা লুচি সন্দেশ আশা করিয়াছিল, তাহারা তৎপরিবর্ত্তে এক মুষ্টি চিপিটকও পাইল না দেখিয়া নানারূপ নিন্দা করিতে লাগিল। বলিল, 'সিংহের ঘরে সব শৃগাল জন্মিয়াছে— ইহারা সব ক্রিয়াকলাপ লোপ করিবে।'

শ্রাদ্ধের পরই রামকমল পৃথকান্ন হইবার প্রস্তাব করিল। পৃথকান্ন হইলে নিজে কর্ত্তা হইতে পারিবেন ভাবিয়া কৃষ্ণকমল ইহাতে অনুমোদন করিল। স্বর্ণকমলও আর আপত্তি করিল না। সুতরাং সকলে পৃথকান্ন হইয়া পড়িলেন। পৈতৃক তৈজসপত্র দ্রব্যসামগ্রী তিন ভাগে বিভক্ত হইল। রামকমল ও কৃষ্ণকমল তাহাদের ভাগ বুঝিয়া লইল, স্বর্ণকমল অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিল। ইষ্টকালয় দুটী রামকমল ও কৃষ্ণকমল লইয়া অসম্পূর্ণ ইষ্টকালয়টী স্বর্ণকমলের ভাগে দিল এবং উহা সম্পূর্ণ করিবার ব্যয় সংকুলনার্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় স্বর্ণকমলকে কিছু নগদ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইল। আর খড়ের চৌচালাগৃহখানা সম্প্রতি জননীর বাসগৃহ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। রামকমল, কৃষ্ণকমল এই বণ্টন করিল, স্বর্ণকমলের পক্ষে কেহ কেহ ইহাতে আপত্তি করিল, কিন্তু স্বর্ণকমল এই বণ্টন স্বীকার করিয়া বলিল,

'নির্ব্বিবাদে যাহা হয়, তাহাই ভাল। আমি ইহা লইয়া ঝগড়া করিব না। দাদারা যাহা করিতেছেন তাহাই আমার স্বীকৃত।'

রামকমল ও কৃষ্ণকমল ইটালয় দুটী দখল করিয়া বসিল,

তাহাদের দ্রব্য সামগ্রীতে প্রকোষ্ঠ পূর্ণ করিতে লাগিল। আর স্বর্ণকমলের দ্রব্য সামগ্রী সম্প্রতি জননীর গৃহেই রাখা হইল এবং যতদিন ইষ্টকালয়ের নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা না হয়, ততদিন সুকুমারীও শাশুড়ীর সঙ্গে থাকিবেন স্থির হইল।

শোক-কাতরা গিন্নি কৃপাময়ী প্রিয়পুত্র ও পুত্রবধূকে আবাস-ঘর-শূন্য ও নিতান্ত দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন। সুকুমারী বস্ত্রাঞ্চলে শাশুড়ীর অশ্রু মুছাইয়া বলিল,

কাঁদিলে কি হইবে, মা! সকলই ভগবানের ইচ্ছা, তিনি কৃপাদৃষ্টি করিলে এ অবস্থা ফিরিতেও পারে।'

বলিতে বলিতে সুকুমারীর চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া দুই ফোটা জল পড়িল। দেখিয়া গিন্নি ঠাকুরাণীর দুঃখের সাগর আরও উথলিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া স্বর্ণকমল নিকটস্থ হইয়া বলিল,

'মা! তোমরা দুঃখ করিও না, যদি ভগবান দয়া করেন তবে আবার সব হইবে। নতুবা তিনি যেরূপ রাখেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। ভাবিয়া কি করিবে?'

দীনেশচন্দ্র বৃদ্ধাকে বুঝাইয়া বলিলেন,

'স্বর্ণকমল আছে, ছোট-বৌ আছে—আমরা আছি। আপনার কিসের দুঃখ, মা? সকলেই ত আপনার শত্রু নহে।'

বৃদ্ধা এ কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

জননী ও ভার্য্যার কষ্ট দেখিয়া স্বর্ণকমলের হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যতশীঘ্র সম্ভব, তাঁহাদের দুঃখ দূর করিবেন এবং ইষ্টকালয়টী সম্পূর্ণ করিবেন, স্থির করিলেন। কিন্তু নগদ টাকা ও প্রাপ্য টাকার খতগুলি রামকমল হস্তগত করিয়াছে। যৎ

সামান্য ভূ-সম্পত্তি যাহা আছে, তাহার আয়ের এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা কোন প্রকারে মোটা ভাত, মোটা কাপড় চলিতে পারে মাত্র। রামকমল ও কৃষ্ণকমল ইষ্টকালয়ের নির্ম্মাণ জন্য যাহা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, তাহাও 'আজ দিব, কাল দিব' করিয়া দিল না। এই প্রতিশ্রুতির অনেক সম্ভ্রান্ত সাক্ষী ছিল। স্বর্ণকমল ইচ্ছা করিলে তাহা আদালতের সাহায্যে আদায় করিতে পারিত। কিন্তু স্বর্ণকমল বলিল,

'এতই যখন ত্যাগ করিলাম, তখন আর এই জন্য আদালতে যাইব না।'

সুতরাং নালিসও হইল না, টাকা আদায়ও হইল না। স্বর্ণকমল এখন চাকরীর অনুসন্ধানে দূরদেশে যাইবে স্থির করিল।

প্রজাদের নিকট হইতে মথুরানাথ পাল নামক এক ব্যক্তি খাজনার টাকা আদায় করিত। স্বর্ণকমল তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল,

'আমি বিদেশে যাইব। আমার অংশের টাকা প্রতি কিস্তে নিয়মিত মত মায়ের হাতে দিও। ইহাই মাত্র তাহাদের ভরণ-পোষণের প্রধান অবলম্বন, ইহা যেন তোমার মনে থাকে।'

মথুরানাথ স্বীকৃত হইল। অতঃপর স্বর্ণকমল জননী ও ভগ্নীকে আশস্ত করিয়া গৃহবহিষ্কৃত হইল। যাইবার সময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে মাতার প্রতি অনুগ্রহদৃষ্টি রাখিতে বলিয়া গেল।

সেই দিন রাত্রে রামকমল কৃষ্ণকমলকে নিজগৃহে ডাকিয়া নিয়া চুপি চুপি বলিলেন, 'তুমি টাকার তাগাদায় আমাকে অস্থির করিয়াছ, এই নেও তোমার টাকা। ছয়শত বার টাকা রাখিয়াছিলাম—তাহা হইতে তোমাকে দুইশত টাকা দিতেছি।' বলিয়া

সে টাকার তোড়া সম্মুখে রাখিল। কৃষ্ণকমল আবদার করিয়া বলিল,

'তা কেন, বড় দাদা। আমাকে যে অর্দ্ধেক দিবে বলেছিলে?'

রামকমল উদারতা দেখাইয়া বলিল,

'আচ্ছা তবে তাই লও—আমার কথা মিথ্যে হবে না। আর আমার মতে থাকিলে তোমার লাভ বৈ লোকসান হবে না—তা নিশ্চয় জেনো।'

'আমি কোন্ দিন তোমার মত ছাড়া, বড় দাদা?'

রামকমল টাকাগুলি ভাগ করিয়া তিনশত ছয় টাকা কৃষ্ণকমলকে দিল, বক্রী তিন শত ছয় টাকা পুনরায় থলের মধ্যে রাখিল। এই স্থলে আর কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। কৃষ্ণকমল পিতার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া শ্বশুরালয় গেলে, তাহার পাঠশালাটী ভাঙ্গিয়া যায়। কয়েক দিন পরে আর এক ব্যক্তি একটী পাঠশালা খুলিলে তথায় সমস্ত ছাত্র দলে দলে যাইয়া ভর্ত্তি হইল। কৃষ্ণকমল চেষ্টা করিয়াও আর ছাত্র পাইল না। তাহার বাহিরের আয়ও আর কিছু রহিল না। এই টাকাগুলির দ্বারা সে কয়েক দিন বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার চালাইতে লাগিল। রামকমলও মনিবের অনুমতি ব্যতীত চলিয়া গিয়াছিল বলিয়া, মহাজন তাহার স্থানে আর একজন নূতন লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এজন্য রামকমলের বিশেষ কষ্ট হইল না। তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থ ছিল—আবার এদিকে নগদই প্রায় তিন হাজার টাকা প্রাপ্তি হইল। তা ছাড়া অনেক টাকার খত ও অনেকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কারও তাহার হস্তগত হইয়াছে। ন্যায় পথে হউক, অন্যায়

পথে হউক, ধন বৃদ্ধিই তাহার মূল মন্ত্র হইল এবং সর্ব্বদা অবসর থাকায় নানারূপ কুচিন্তা আসিয়া তাহার কুহৃদয়খানা সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া বসিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

চাকরী প্রাপ্তি।

স্নেহময়ী জননীর কাঁদ কাঁদ মুখ এবং প্রিয়তমা ভার্য্যার অশ্রু-পূর্ণ নয়ন ও শুষ্ক বদন দেখিয়া স্বর্ণকমল গৃহবহিষ্কৃত হইল। জননী ও স্ত্রীর বিদায়কালীন মুখছবি দেখিয়া স্বর্ণকমলের এক পা অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হইল না, কিন্তু কি করেন—তহবিল শূন্য, চাকরী ব্যতীত উপায়ান্তর খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু তাহার উদারহৃদয় প্রতিহিংসার জন্য ব্যস্ত হইল না, এমন কি সে কথা তাহার হৃদয়ে একবার উঠিলও না। এদিকে রামকমল ও কৃষ্ণকমলের চিন্তা হইল, পাছে স্বর্ণকমল বিদেশে যাইয়া একটা ডেপুটীগিরি কিম্বা জজীয়তি পাইয়া বসে। তাই তাহারা উভয়ে, বিশেষতঃ রামকমল, মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া বলিল, 'হরি ঠাকুর! স্বর্ণকমলের এ যাত্রা নিষ্ফল হউক—আমি সওয়া পাঁচ আনার বাতাসা হরির-লুট দিব।'

ভগ্নহৃদয় স্বর্ণকমল গৃহ বহিষ্কৃত হইল। গ্রাম ছাড়িয়া গ্রামান্তরে পৌছিতেই তাহার হৃদয় শূন্যবোধ হইতে লাগিল। এতদিন সংসার যে চক্ষে দেখিতেছিল, আজ আর সে চক্ষে দেখিতে পারিল না—থাকিয়া থাকিয়া মায়ের মুখ, স্ত্রীর মুখ, তাহার মনে পড়িতে লাগিল, আর তাহার প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

কোথায় যাইবে, কাহার আশ্রয় লইবে, কাহার নিকট কৃপাভিক্ষা চাহিবে, এ চিন্তায় তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইতে লাগিল। শত লক্ষ যোজন-বিস্তৃত মহাসমুদ্রে ভাসমান অর্ণবজানের দিক্‌ভ্রান্ত নাবিক আপনাকে যেরূপ বিপন্ন ও লক্ষ্যশূন্য মনে করে, স্বর্ণকমল আপনাকে আজ সেইরূপ মনে করিতে লাগিল। কোন্ দিকে গেলে কূলে পৌছিতে পারিবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। হঠাৎ নীলাকাশে একটী সুখতারা দেখা দিল—তাহাতে গতি নির্ণয়ের কিছু সুবিধা হইল। ইউল সাহেব বন্ধুভাবে উপকার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন এবং জেলায় গেলে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়াছিলেন, স্বর্ণকমলের সে কথা মনে পড়িল। সাহেব বড় ভদ্র এবং বাঙ্গালীর প্রতি তাঁহার বড় অনুগ্রহ, স্বর্ণকমল এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া মাতা ও ভার্য্যাকে দুঃখ দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য সাহেবের শরণাপন্ন হইবে স্থির করিল।

যথা সময়ে স্বর্ণকমল সহরে গিয়া পৌছিল। তখন বেলা প্রায় তিনটা বাজিয়াছে। সে পর্য্যন্ত তাহার স্নানাহার ঘটিয়া উঠে নাই, পথের কষ্টে ও অনাহারে তাঁহার সুন্দর মুখ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে, চুলগুলি তৈলাভাবে রুক্ষ হইয়াছে এবং শরীরের স্বাভাবিক কান্তি তিরোহিত হইয়াছে। স্বর্ণকমল সহরে পৌছিয়া, স্নান আহারের অপেক্ষা না করিয়া, সামান্য অনুসন্ধানের পর, সাহেবের কুঠীতে গেল। সাহেবের দ্বাররক্ষক তাহাকে প্রবেশ করিতে দিল না। অগত্যা স্বর্ণকমল দ্বারবান প্রদত্ত একখানি স্লেটে নিজ নাম, ধাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিয়া দিল। সাহেব তাহা পড়িয়া বাবুটীকে উপরে লইয়া যাইতে বলিলেন। স্বর্ণকমল আপনার চামড়ার ব্যাগটী দ্বারবানের নিকট রাখিয়া তাহার সঙ্গে

সাহেবের নিকট গেল। সাহেব একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতে-ছিলেন। স্বর্ণকমল গৃহে প্রবেশ করিলে সেখানি টেবিলের উপর রাখিয়া, একটু হাসিয়া তাহাকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন এবং তাহার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বর্ণকমল কৃতজ্ঞহৃদয়ে বলিল,

'আপনি যে আমাকে এত সহজে চিনিতে পারিবেন, এ ভরসা আমার ছিল না।'

সাহেব হাসিয়া বলিলেন,

'তোমরা আমাদিগকে বড় নিষ্ঠুর ও আত্মরত মনে কর—নয় কি? যাক, সে কথা—তোমাকে এত বিষণ্ণ ও কাতর দেখাইতেছে কেন? লজ্জা কি, আমার নিকট সব খুলিয়া বল।'

সাহেবের সদয় বাক্য শুনিয়া স্বর্ণকমল সাহসী হইল; এবং কিরূপে পৈতৃক অর্থ অপহৃত হইয়াছে, কিরূপ জ্যেষ্ঠভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া সে কপর্দ্দকশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, কিরূপে পৃথকান্ন হইয়াছে, কি উদ্দেশ্যে গৃহবহিষ্কৃত হইয়াছে ইত্যাদি সকল কথা যথাযথরূপ বর্ণন করিল। সাহেব তাহা শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,

'তোমার দাদা হয় ত এখন নিঃশঙ্ক হইয়া অপহৃত টাকা কড়ি ও গহনাগুলি নিজ বাক্সে রাখিয়াছে। তোমার ইচ্ছা হইলে আমি এখনও চোর ধরিয়া দিয়া উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। কিন্তু তুমি বোধ হয়, তাহা করিতে চাও না। তোমাদের ইহা মহৎ দোষ—ভালবাসায় তোমরা কর্ত্তব্যজ্ঞান ভুলিয়া যাও। ইংরেজরা এরূপ নীচাশয়, স্বার্থপর তস্কর পিতাকেও আইন অনুসারে দণ্ডিত করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না। এরূপ দুষ্কার্য্য-

রত, স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা মনুষ্যসমাজের শত্রু। ইহাদিগকে দণ্ডিত করিলে পুণ্য হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত এদেশীয় লোকের ধারণা অন্যরূপ। এক ভ্রাতার কারাবাস দণ্ড হইলে পারিবারিক-সম্মান খর্ব্ব হইবে, এই অসার ভয়ে ইহারা কর্ত্তব্য কাজ করিতেও ভীত হয়।'

স্বর্ণকমল নতমস্তকে বিনীত ভাবে বলিল,

'আপনার কথা সত্য। ফলতঃ এরূপ প্রকৃতির লোকের শাসন না হইলে ইহাদের অত্যাচার, আস্পর্দ্ধা আরও বাড়িয়া যায়। কিন্তু নানা কারণে আমি পৈতৃক সম্পত্তির আশা ত্যাগ করিয়াছি, সুতরাং এ বিষয়ে আর ঘাটাঘাটি করিতে চাই না। আপনি দয়া করিয়া একটী 'চাকরীর' যোগাড় করিয়া দিলে, চিরকাল আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।'

তারপর, দু'চারি কথার পর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পুলীস বিভাগে কার্য্য করিবে, কি ?'

স্বর্ণকমল প্রত্যুত্তরে বলিল,

'আমি কার্য্যক্ষেত্রে এই নূতন পা দিতেছি মাত্র। কোন্ বিভাগ ভাল, কোন্ বিভাগ মন্দ আমি তাহা জানি না। আপনি দয়া করিয়া আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, আমি তাহাই করিব।'

সাহেব। পুলীশ বিভাগে কার্য্য করিলে আমি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি। কিন্তু প্রথম হেড্ কনেষ্টবল্‌রূপে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। ইহা ভাল না লাগিলে, আসাম চা-বাগানে চেষ্টা করিতে পার। আজ্‌কের কাগজে দুই বাগানে দুটী 'বাবুর' প্রয়োজন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছে। লালচক বাগানে বেতন

পঞ্চাশ টাকা, উলুবন বাগানে বেতন ত্রিশ টাকা। কিন্তু লাল-চক স্থানটা কিছু অস্বাস্থ্যকর। এই উভয় বাগানের ম্যানেজার সাহেবদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমার পত্র লইয়া গেলে উপকার হইতে পারে। কি করিবে, তুমি নিজে বিবেচনা করিয়া দেখ। আজ বেশ চিন্তা করিয়া দেখ, কাল প্রাতে আমাকে তোমার অভিমত জানাইলে, যাহা কর্ত্তব্য করা যাইবে।'

স্বর্ণকমল সাহেবকে সেলাম করিয়া বাহিরে আসিয়া দ্বারবানের নিকট হইতে ব্যাগটী লইয়া রাজপথে প্রবেশ করিল। তখন ক্ষুধায় তাহার পেট জ্বলিয়া যাইতেছিল, একটা মিঠাইর দোকানে প্রবেশ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিল। একটা হোটেলে সে রাত্রটী কাটাইয়া দিবে স্থির করিল। সহরে তাহার পরিচিত লোক অনেক ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাদের নিকট যাইতে তাহার লজ্জা বোধ হইল। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া একটা হোটেলে প্রবেশ করিয়া ঘর্ম্মাক্ত পিরাণ ও চাদরখানি ব্যাগের উপর রাখিয়া একখানি কাষ্ঠাসনে বসিল। স্নান না করাতে তাহার মস্তক ঘুরিতেছিল, সুতরাং সেই সন্ধ্যার সময় স্নান করিবার জন্য সে ঝির নিকট জল চাহিল। ঝিকে কেহ কাজের হুকুম করিলে, হোটেল-স্বামীর বড় রাগ হইত, তাই সে ভ্রূকুটি করিয়া কহিল,

'এই সন্ধ্যার সময় কে স্নান করিবার জল আনিয়া দিবে? এত সখ্ করিতে হইলে, তাহার হোটেলে থাকা পোষায় না।'

স্বর্ণকমলের সংসারশিক্ষা রীতিমত আরম্ভ হইল। ব্যাপার দেখিয়া সে দিন স্নানের আশা ত্যাগ করিতে হইল। যথাসময়ে

একখানা ইলিস মৎস্য ও এক বাটি ঝোল দিয়া এক থালা ভাত মাখিয়া খাইয়া হোটেলস্বামীর ভৃত্যের প্রদর্শিত একটা শয্যায় গিয়া বসিল। একতালা দালানের মেজে—শ্যাঁত শ্যাঁত করিতেছিল। তদুপরি, সেই প্রকোষ্ঠটা অতি অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধপূর্ণ। সেই গৃহের মেজেতে একটা মাদুর পাতা; মাদুরের উপর একটা অতি ক্ষুদ্র, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত বালিশ; তাহার উপর ঐরূপ গুণবিশিষ্ট, শতগ্রন্থিযুক্ত একটা ক্ষুদ্র মশারি। এই শয্যায়ই স্বর্ণকমলকে সে রাত্র কাটাইতে হইল! কিন্তু সেই প্রকোষ্ঠে, সেই মাদুর, বালিশ ও মশারির ভীষণ দুর্গন্ধে ও ছারপোকা মশকের অত্যাচারে সারারাত্রির মধ্যে সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষু বুজিতে পারিল না সেই দিন অশ্রুজলে অনেক-বার তাহার বক্ষ ভাসিয়া গিয়াছিল। সারারাত্রি বসিয়া কাটা-ইল, পূর্ব্বদিক রক্তবর্ণ হইয়া উঠিতেছে, এমন সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে গিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিল এবং হোটেলস্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তাহার হস্তে ভোজন ও শয়নের মূল্য বাবদ মোট চৌদ্দটি পয়সা দিয়া সেস্থান হইতে বহির্গত হইল। পূর্ব্ব দিনের শ্রান্তি ও গত রজনীর অনিদ্রা বশতঃ তাহার শরীর বড় খারাপ বোধ হইতে লাগিল। পথিমধ্যে একটা মুদী-দোকান হইতে একটী পয়সা দিয়া একটু তৈল লইয়া তাহা মস্তকে দিয়া একবারে নদীর তীরে গেল। তখনও সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ। স্বর্ণকমল নদীর ধারে ব্যাগটা রাখিয়া স্নান করিয়া উঠিল, এবং ব্যাগ হইতে একখানি ধৌত বস্ত্র খুলিয়া পরিধান করিল। আর্দ্র বস্ত্রখানার জল যথাসাধ্য নিংড়াইয়া তাহা ব্যাগে পুরিয়া রাখিল। তার পর, পিরাণটী গায়ে দিয়া, চাদরখানা স্কন্ধে ফেলিয়া সাহে-

রের কুঠীতে গেল। তখন সাহেব প্রাতঃভোজন সমাপন করিয়াছেন মাত্র। স্বর্ণকমলকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

'কি বুদ্ধি স্থির করিলে ?'

স্বর্ণকমল সসম্মানে বলিল,

'পুলীশবিভাগ অপেক্ষা চা-বাগানই আমার ভাল বোধ হইতেছে। আমার জননীর ও স্ত্রীর আমি ব্যতীত আর কোন আশ্রয় নাই। সুতরাং আমাকে মধ্যে মধ্যে বাড়ী যাইতে হইবে, কিন্তু পুলীশবিভাগে সে সুবিধা ঘটিবে না। অতএব চা-বাগানই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হইতেছে।'

সাহেব। তবে তাহাই কর। কিন্তু কোন্ বাগানে যাইবে, লালচক, না উলুবন ?

স্বর্ণ। আপনি যেখানে বলিবেন,—

সাহেব। লালচকে বেতন বেশী, কিন্তু স্থানটী তেমন স্বাস্থ্যকর নহে ; তাহা কল্যই বলিয়াছি।

বাঙ্গালীর শরীরের প্রতি দৃষ্টি কম। তদ্ব্যতীত স্বর্ণকমলের তখন টাকার প্রয়োজন ; মনে মনে ভাবিলেন একটু সাবধানে থাকিলেই চলিবে। তাই বলিল,

'লালচকেই যাইতে চাই।'

'তবে যাও, কিন্তু স্বাস্থ্যের প্রতি খুব দৃষ্টি রাখিও।' বলিয়া সাহেব তাহাকে একখানি অনুরোধ পত্র লিখিয়া দিলেন। স্বর্ণকমল সাহেবকে সেলাম করিয়া বাহির হইল। সেই দিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময় জাহাজে উঠিল, জাহাজ আসাম অভিমুখে চলিল, চতুর্থ দিনে জাহাজ বন্দরে পৌছিল। তৎক্ষণাৎ একটা চাপরাসী জাহাজে উঠিয়া স্বর্ণকমলের নাম ধরিয়া

ডাকিতে লাগিল। কিন্তু এই দূরদেশে কেহ তাহার পরিচিত নহে ভাবিয়া স্বর্ণকমল তাহার কথায় উত্তর দিল না। মনে ভাবিল, তাহার নামধারী অন্য কোন ব্যক্তিকে ডাকিতেছে। কিন্তু সেই চাপরাসীটা ক্রমাগত চীৎকার করিতেছে দেখিয়া, অগত্যা স্বর্ণকমল সাহসে ভর করিয়া, ভাঙ্গা হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিল,

'কোন্ স্বর্ণকমল বাবুকে খোজ ?'

'যিনি লালচক বাগানে যাইবেন।'

'আমি লালচক বাগানে যাইব।'

'আপনার নাম কি ?'

'আমার নামও স্বর্ণকমল।'

'তবে আপনাকেই খুঁজিতেছিলাম।'

এই কথা বলিয়া সেই চাপরাসী স্বর্ণকমলের ব্যাগটী নিজে লইয়া বলিল,

'আপনি ভয় করিবেন না, আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য সাহেব আমাকে পাঠাইয়াছেন, আপনার জন্য ঘোড়া আসিয়াছে।'

স্বর্ণকমল অবাক হইয়া বলিল,

'তোমাদের সাহেব আমার পরিচয় জানিলেন কিরূপে ? আর, আমি যে আজকার জাহাজে আসিব, তাহাই বা তিনি কি প্রকার জানিলেন ?'

'ইউল সাহেব টেলিগ্রাফ করিয়াছেন, আপনার কাজে গত কল্য এক জন বাবু নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু ইউল সাহেবের টেলিগ্রাফ পাইয়া সাহেব তাহাকে নিযুক্ত করেন নাই।'

ইউল সাহেবের অনুগ্রহ ভাবিয়া স্বর্ণকমল কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হইল। তাহার চক্ষে এক ফোঁটা জল বাহির হইল।

মনে মনে সাহেবকে শত সহস্র ধন্যবাদ করিতে করিতে ঘোড়ায় চড়িয়া বাগানের দিকে চলিল। স্বর্ণকমল খুব ভালরূপ ঘোড়ায় চড়িতে পারিত না। ধীরে ধীরে কোন প্রকারে বাগানে পৌঁছিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিল। সাহেব তাহাকে বাগানের প্রধান কর্ম্মচারী করিয়া দিলেন। স্বর্ণকমলের পত্রে চাকরীর সংবাদ অবগত হইয়া বৃদ্ধা জননী ও ভার্য্যা সুকুমারী পরমানন্দিতা হইলেন। রামকমল, কৃষ্ণকমল, মহামায়া ও মুক্তকেশীর গাত্র-জ্বালা উপস্থিত হইল। রামকমল মহামায়ার নিকট বলিল,

'চাকরী নিশ্চয়ই হয় নাই, হইয়া থাকিলেও বেতন দশ পনর টাকার অধিক নহে, মান বাড়াইবার জন্য পঞ্চাশ টাকা লেখা হইয়াছে।'

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাগ বাড়িল।

যথাসময়ে স্বর্ণকমলের অতি সুন্দর একটা পুত্র জন্মিল, সুকুমারী ও গিন্নি ঠাকুরাণীর আনন্দের সীমা রহিল না। প্রতি-বেশীগণ পুত্র দেখিয়া শিশুর রূপের প্রশংসা করিল, স্বর্ণকমলের ক্ষমাগুণ ও সহিষ্ণুতার প্রশংসা করিল, ভগবানের নিকট তাহা-দের মঙ্গল কামনা করিল। কেহ কেহ রামকমল ও কৃষ্ণকমলের ঘৃণিত চরিত্রের নিন্দা করিতেও ছাড়িল না। মহামায়া ও মুক্তকেশী পাড়াপ্রতিবেশীর উচিত কথা শুনিয়া তেলে বেগুনে জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের উপর সে রাগ মিটাইতে না পারিয়া, শাশুড়ী, ছোট-বৌ ও নবজাত সুন্দর শিশুর উপর তাহা-

দের ক্রোধ হইল। তাহাদিগকে গালাগালি করিয়া, শিশুটীকে ‘বাদরমুখো ছেলে’ বলিয়া গাত্রজ্বালা নিবারণ করিতে লাগিল। স্বর্ণকমল বাড়ী হইতে যাইবার সময়, মাতা ও ভার্য্যাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিয়া গিয়াছিল,

‘আমার একটী অনুরোধ, তোমরা উহাদের সঙ্গে ঝগড়া করিও না, উহারা গালাগালি করিলেও তাহাতে কাণ দিও না, অভিসম্পাত করিলে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিবে, তোমাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিলে ভগবানের দিকে চাহিয়া তাহা সহ্য করিবে।’

বৃদ্ধা ও সুকুমারী একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতেন। সুতরাং রামকমল, কৃষ্ণকমল, মহামায়া বা মুক্তকেশী তাহাদিগকে নিতান্ত নির্দ্দয়রূপে মর্ম্মপীড়াদায়ক কথা বলিলেও তাহারা অশ্রুপাত করিতেন, কিন্তু কোন কথা বলিতেন না। ইহাতে মহামায়া ও মুক্তকেশীর ঝগড়া করিবার প্রবল ইচ্ছা, অনেক সময় ব্যর্থ হইয়া যাইত। একদিন মহামায়া, সুকুমারী ও বৃদ্ধাকে শুনাইয়া বড় গলায় বলিল,

‘এমন বাদরমুখো ছেলেও যদি সুন্দর হয়, তবে কুৎসিত কে? পাড়ার চক্‌খাকী মাগীরা আবার এ বাদরেরই প্রশংসা করে।—মরণ আর কি। আমার পেটে এমন ছেলে হ’লে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতাম।’

সুকুমারী তদুত্তরে কাঁদিয়া বলিল,

‘কি করিব দিদি। ভগবান যাহা দিয়াছেন, তাহাই ভাল। বাঁদরমুখো ব’লে ত আর ফেলে দিতে পারি না।’

বৃদ্ধা কৃপাময়ীর মহামায়ার কথা সহ্য হইল না। তিনি সর্ব্ব-

প্রকার অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু নবনীতসদৃশ কোমল শিশুটীকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কথা বলায় তাঁহার অদমনীয় ক্রোধ উপস্থিত হইল, তিনি বড-বৌকে কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,

'দেখ্ বড বৌ! অত ডেমাক করিস্ না; উপরে ভগবান, নীচে পৃথিবী আছে; এখনও চন্দ্র সূর্য্য উদয় হয়; এখনও ধর্ম্ম আছে। এত বাড়াবাড়ি করিলে হরিঠাকুর কখনও ভাল করিবেন না। এমন করিয়া রোজ রোজ পরকে জ্বালাইলে শেষে নিজের জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে।'

বলিতে বলিতে বৃদ্ধার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। অশ্রুজল গণ্ডদেশ প্লাবিত করিয়া বক্ষে পড়িতে লাগিল।

সেই দিন রজনীতে মহামায়া বালক বালিকাদিগকে একটু শীঘ্র নিদ্রিত করিয়া, স্বামীর নিকট রাগত স্বরে বলিল,

'আর আমার সহ্য হয় না; এর কিছু কত্তে পার কর, নইলে আমার এ বাড়ীতে থাকা হবে না।'

রাম। তোমাকে একটা নূতন বাড়ী করে দিতে হবে নাকি?

মহা। সকল সময় ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না। পাড়ার মাগীদের কথায় আমার গা দগ্ধে যায়। 'তুমি নাকি হাজার হাজার টাকা চুরি করেছ, ভাইদের ঠকিয়েছ, ছোট ঠাকুরপোকে দেশত্যাগী করেছ——'

রাম। করেছি, ত বেশ করেছি—আবার করব, বেশ করব, শত্রুকে নির্য্যাতন করব না, ত করব কাকে?

মহা। তোমার ঐ মুখেই সব। নির্য্যাতন ত ভারি করেছ আর কি? ঠাকুরপো বিদেশে গিয়েছে, ক্ষেমতা করে

চাকরী করেছে, পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাচ্ছে। লোকে ধন্যি ধন্যি কচ্ছে। সবাই বলে 'স্বর্ণকমল বুদ্ধিমান, লেখা পড়া জানে। ভাই দুটো মুক্ষু বলে ইচ্ছা করে স্বর্ণকমল তাদের সব দিয়ে গ্যাছে। তার ভাবনা কি? যেই ঘরের বের হয়েছে, অমনি সাহেব মস্ত চাকরী দিয়েছে।' আর দেখ দেখি, এই ক'মাস ধরে বা চাকরী হয়েছে, এরি মধ্যে কত টাকা পাঠিয়েছে। সে দিনও চল্লিশ টাকা এসেছে। লোহার সিন্ধুক টাকায় পুরে গেল যে।

রাম। মুক্ষুই হই, আর যাই হই, আমি চেষ্টা কল্লে, এক দিনে এই চাক্‌রী টাকরী উড়িয়ে দিতে পারি।

মহা। আর বলো না—ক্ষেমতা ঢের দেখিছি।

তার পর গলা ভার করিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল,

'আমি সব সইতে পারি, কিন্তু তোমার মায়ের কথা আর আমার সহ্য হয় না। আজ আমি ওদের ছোঁড়াটাকে একটু দেখ্‌তে গিয়েছিনুম, তাই আমায় কি না গালাগালি দিতে লাগ্‌লো। আর আমাদের জ্বালায় নাকি ওদের শশা, কলা, কুমড়া কিছুই গাছে থাকিতে পাবে না। এক শ লোকের মাঝে এ কথা বলে।'

সত্য সত্যই রামকমল ও মহামায়ার উপদেশ ও শিক্ষানুসারে, নবলক্ষ্মী ও নন্দগোপাল ছোট বৌর গাছের শশা, কলা, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি সমস্ত চুরি করিয়া লইয়া যাইত। রোদ্রের কাপড়গুলি পিণ্ডাকার করিয়া পুকুরের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিত। কিন্তু সুকুমারী জানিয়া শুনিয়াও এজন্য তাহাদিগকে কিছু বলিত না। বরং মঙ্গলা ও ভজহরি কিছু বলিলে, সুকুমারী তাহা-দিগকে বলিত,

'ওরাই ত আমার সব। ওদের কেউ কিছু বলো না।'

এই খানে বলিয়া রাখা ভাল যে, পৃথকের সময় মঙ্গলা ও ভজহরি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বর্ণকমলের সংসারেই গিয়াছিল।

এ সব কথায় বিশেষ ফল হইল না দেখিয়া, মহামায়া বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিয়া একটু সখের কান্না কাঁদিয়া বলিল,

'তোমাকে রোজ রোজ চোর, মুক্ষু নানা কথা বল্লে আমার তাহা সহ্য হয় না। কেন—তুমি কি এ বাড়ীর কেউ না? এত কথা বলবার ওরা কে?'

মহামায়ার পতি-ভক্তিতে রামকমলের হৃদয় গলিয়া গেল। নিজের স্বভাব মনে করিয়া মনে মনে সে একটু লজ্জিত হইল। স্বর্ণকমল ও সুকুমারীর কোন দোষ নাই, ইহা সে মনে মনে বুঝিল। কিন্তু তবুও তাহাদের উপর ও জননীর উপর তাহার আরও ক্রোধ জন্মিল। স্বর্ণকমলের স্বভাব ভাল বলিয়াই ত লোকে রামকমলকে নিন্দা করে, স্বর্ণকমল ইংরেজী জানে বলিয়াই ত লোকে রামকমলকে মূর্খ ভাবে, স্বর্ণকমল বিদেশে গিয়াছে বলিয়াই ত তাহার সহিত লোকের এত সহানুভূতি, আর ছোট বৌ পাড়াপ্রতিবেশীর উপকার করে বলিয়াই ত সকলে তাহার প্রশংসা করে আর বড়-বৌর নিন্দা করে। এইরূপ চিন্তা করিয়া রামকমল স্থির করিল যে, যত দিন ইহারা জীবিত থাকিবে, তত দিন রামকমলের সুখ হইবে না, তত দিন সকলেই স্বর্ণকমল ও ছোট-বৌর গুণগান করিবে, আর রামকমল ও মহামায়ার নিন্দা করিবে। আর স্বর্ণকমলের চাকরী হইয়াছে, হয় ত সে শীঘ্রই অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়া ফেলিবে—অনেক সৎকার্য্য করিবে। তাহা হইলে ত এখন রামকমলের যে যৎকিঞ্চিৎ ধনগৌরব

আছে তাহাও থাকিবে না। ভাবিতে ভাবিতে রামকমলের অন্তঃকরণ হিংসাপূর্ণ হইয়া উঠিল। হিংসা হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হইল। সেই ক্রোধ শান্তির উপায় চিন্তা করিতে করিতে সে মহামায়াকে বলিল,

'পাড়ার হিংসুটে মাগীগুলি আর বেটারা যাহাই বলুক, আমি ওদের ভিটায় ঘুঘু চড়াব, তবে ছাড়ব।'

মহামায়া স্বামীর স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া মনে মনে আনন্দিতা হইল।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

জাল উইল ও বুদ্ধি স্থির।

পিতার লৌহসিন্ধুক হইতে রামকমল খতগুলি চুরি করিয়াছিল, তাহা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। কয়েক মাস পরে সে প্রত্যেক খতের দায়ীককে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিল,

'তোমার নিকট আমাদের সুদ সহ অনেক টাকা পাওনা হইয়াছে, এই খত দেখ। কিন্তু তুমি যদি আমাকে ন্যায্য টাকার অর্দ্ধেক দেও, তবে আমি তোমাকে মুক্ত দিয়া খতখানা ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারি। কিন্তু এই কার্য্য গোপনে করিতে হইবে। কেহ যেন টের না পায়।'

রামকমলের এই প্রস্তাবে প্রায় সকল দায়ীক স্বীকৃত হইল এবং কেহ অর্দ্ধেক, কেহ এক-তৃতীয়াংশ টাকা প্রদান করিয়া খত ফিরাইয়া পাইল। কেবল এক ব্যক্তি বলিল, 'আমি ইহা পারিব না। আমার ন্যায্য দেনা কড়ায় গণ্ডায় শোধ না করিলে নরকগামী হইতে হইবে। আপনাদের তিন ভ্রাতার সাক্ষাতে

সমস্ত টাকা বুঝাইয়া দিব—গোপনে কিছু দিব না।' যাহা হউক, এই প্রকারে রামকমলের প্রায় পাঁচ ছয় হাজার টাকা প্রাপ্তি হইল। কৃষ্ণকমলকে সে অবশ্যই ইহার অংশ প্রদান করিল না। মূর্খ কৃষ্ণকমল বড়ীতে থাকিয়াও ইহার বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারিল না। সোণার গহনাগুলিও রামকমলের হইল। যাহারা উহা বন্ধক রাখিয়াছিল, উহা চুরি হইয়া গিয়াছে শুনিয়া তাহারা আর টাকাও দিতে আসিল না, গহনাও ফিরাইয়া পাইল না। মহামায়ার আনন্দের সীমা রহিল না।

ইহার পর, পৈতৃক তালুকের উপর রামকমলের দৃষ্টি পড়িল। এই তালুকের বার্ষিক আয় প্রায় সাত আট শত টাকা। সদর রাজস্বও অত্যন্ত কম, প্রায় কিছুই না বলিলেও হয়। প্রজাগুলি বেশ সঙ্গতিপন্ন, সুতরাং কখনও খাজানা বাকি পড়ে না। তালুকখানা নিজ গ্রামেই—সুতরাং তহশীলের খুব সুবিধা। রামকমলের ইহার প্রতি লোভ হইল। কিন্তু পৈতৃক তালুক ত আর নগদ টাকা নহে—সুতরাং ইহা হজম করা যে কষ্টসাধ্য, রামকমল ইহা বুঝিতে পারিল। মোহনগঞ্জ মহকুমায় রামকমলের এক শালা মোক্তারী করিত। রামকমল মহকুমায় যাইয়া তাহার সহিত পরামর্শ আঁটিয়া আসিল। তার পর, একখানা পুরাতন কাগজে তাহার পিতার নামের এক কৃত্রিম উইল প্রস্তুত করাইল। তাহাতে লেখা হইল যে, রামকমল ভূ-সম্পত্তি সমস্ত পাইবে; আর কৃষ্ণকমল ও স্বর্ণকমল প্রত্যেকে নগদ সম্পত্তির অর্দ্ধেক পাইবে। রামকমল ভূসম্পত্তি পাইল বলিয়া নগদ কিছুই পাইবে না। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, পিতার মৃত্যু তারিখে রামকমল টাকা কড়ি গহনা পত্রের সঙ্গে ৺কালীকান্ত

রায়ের নামাঙ্কিত পিতলের মোহরটীও চুরি করিয়াছিল। আজ সে সেই মোহরটী খুলিল এবং তৈল-কালী প্রস্তুত করিয়া কৃত্রিম উইলে মোহরাঙ্কিত করিল। মোহরের ছাপার উপরে কালীকান্ত রায়ের নাম জাল করা হইল। সেই উইলে রাম-কমলের শালা রাইমোহন ও গ্রামের আর তিন জন দুষ্ট লোক সাক্ষী হইল। উইলখানা একটু পুরাতন না হইলে বাহির করা সঙ্গত নহে বিবেচনায় রামকমল সম্প্রতি তাহা লুকাইয়া রাখিল। কিন্তু মুখে প্রচার করিতে লাগিল যে, তাহার পিতা তাহাকে উইল করিয়া সমস্ত ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন।

ইহার পর রামকমলের একটু ভয় হইল। সে মনে করিল— 'স্বর্ণকমল, ছোট-বৌ এবং তাহাদের পুত্রটী বাঁচিয়া থাকিতে সে সম্পত্তি দাবি করিলে কিম্বা উইলের মোকদ্দমা উঠিলে, গ্রামের সকল লোকই স্বর্ণকমলের পক্ষাবলম্বন করিবে। সুতরাং উইল-খানা সত্য প্রমাণ করা সহজসাধ্য হইবে না। জাল উইল প্রস্তুত করা অপরাধে বিপন্ন হওয়াও একেবারে অসম্ভব নহে। এ অবস্থায় তাহাদিগকে মারিয়া ফেলাই উচিত। আর শত্রুবধে দোষই বা কি? ইহাদিগকে বধ করিতে পারিলে, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক সকলেই তাহার কথা কহিবে। তবে তাহাই উচিত। ঘরে অগ্নি প্রদান করিলেই একসঙ্গে তিন জন শেষ হইবে। তার পর, স্বর্ণকমল কি বাড়ী আসিবে না?—ভাবনা কি, একটা পথ হইবেই হইবে।' কৃষ্ণকমলের জন্য সে তত চিন্তা করিল না। রামকমল জানিত যে, কৃষ্ণকমলের প্রয়োজনমত সংসার খরচের জন্য দুই একটী টাকা দিলেই সে নীরব থাকিবে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

রামকমলের পাশব ব্যবহার।

রামকমল গ্রামের কাহারও সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে না—যেন সকলেই তাহার চিরশত্রু। তাহার বাক্সে টাকা আছে, উদরান্নের জন্য চিন্তা করিতে হয় না। এজন্য তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় গর্ব্বে পূর্ণ। সে কথায় কথায় লোকের মর্ম্মে পীড়া প্রদান করিত, বিনা কারণে কুৎসিত গালাগালি করিত, কাহারও সম্মান রক্ষা করিয়া চলিত না—কথায় কথায় বলিত, 'আমি কোন ব্যাটার তোয়াক্কা রাখি না।' দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে তাহার হৃদয়ে একটুও কষ্ট বোধ হইত না। পৃথকান্ন হইবার পর টাকা ধার দেওয়াই তাহার প্রধান ব্যবসা হইল। কিন্তু সামান্য সুদ তাহার নিকট যথেষ্ট বোধ হইত না। এজন্য সে নিরক্ষর লোকের নামে কৃত্রিম খত প্রস্তুত করিয়া নালিশ করিত এবং ডিক্রী পাইলে, ডিক্রীজারি করিয়া টাকা আদায় করিত। যাহার প্রতি কোন কারণে তাহার একটু রাগের সৃষ্টি হইত, নানারূপ অত্যাচার, মিথ্যা ব্যবহার বা অসদুপায় দ্বারা তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে তাহার দ্বিধা বোধ হইত না। তাহার হৃদয় হইতে ধর্ম্মভাব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান একবারে পলায়ন করিল। এইরূপ নানা কারণে রামকমলের শত্রু বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যতই তাহার শত্রু বৃদ্ধি হয়, যতই সাধারণে প্রকাশ্য ভাবে তাহার কার্য্যের সমালোচনা করিতে লাগিল, ততই স্বর্ণকমল, ছোট-বৌ ও বৃদ্ধা জননীর প্রতি তাহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। এই সময় স্বর্ণকমল দুই মাসের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিল।

সাহেব তাহার কার্য্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, বাড়ী আসিবার সময় তাহাকে দুই শত টাকা পুরস্কার দিয়া বলিয়া দিলেন,

'ছুটীর পর হইতে তোমার বেতন এক শত টাকা হইবে।'

রামকমল এ সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ভীত ও মর্ম্মপীড়িত হইল। তাহার প্রথম পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনিলেও বোধ হয় তাহার এত কষ্ট হইত না! স্বর্ণকমল প্রায় এক বৎসর পর বাড়ী আসিয়াছে। লালচকের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, কিন্তু সপ্তাহকাল মধ্যেই তাহার শরীর ভাল বোধ হইতে লাগিল। এই এক বৎসরে পারিবারিক ব্যয় বাদে প্রায় পাঁচ শত টাকা জমিল। বেতনও বৃদ্ধি হইল। ইহাতে স্বর্ণকমলের সাহস হইল এবং জননী ও ভার্য্যার অনুরোধে ইষ্টকালয়টী সম্পূর্ণ করিবার জন্য ইট, সুরকী ও চূণ আনাইয়া রাখিল। মনে মনে ভাবিল, আবার কয়েক মাস কাজ করিয়া কিছু টাকা সঞ্চয় করিয়া পুনরায় দুই মাসের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিবে এবং কড়ি ও বরগা আনাইয়া ইষ্টকালয়টী বাসোপযোগী করিয়া জননী ও ভার্য্যার কষ্ট দূর করিবে। এদিকে মাতার অনুরোধে পুত্রের জন্য একগাছি সোণার হার গড়াইয়া দিল। লোকে দশমুখে স্বর্ণকমলের প্রশংসা করিতে লাগিল। কয়েক দিনের জন্য সুকুমারী ও জননীর সকল কষ্ট দূর হইল। সুকুমারী পুনরায় গর্ভবতী হইল।

রামকমল ও মহামায়া ইট সুরকী চূণ ও সোণার হার দেখিয়া হিংসায় জ্বলিয়া মরিতে লাগিল। মহামায়া একদিন রামকমলকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল,

'কৈ, তুমি না ওদের ভিটায় ঘুঘু চরাবে? আর দু'বছর

ছোট-ঠাকুরপোর চাকরী থাক্‌লে হয়ত তোমার ভিটায়ই ঘুঘু চরবে। দেখছ ত, ইট সুরকী চুণ কত এসেছে? হাজার হউক, ওরা লেখা পড়া শিখেছে—তোমাদের মত ত নয়। তুমি ত দশ টাকা মাইনের চাকরী বলেই উড়িয়ে দিয়েছিলে।'

মহামায়ার প্রত্যেক কথায় রামকমলের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। এবার স্বর্ণকমল কার্য্যস্থলে যাওয়া মাত্রই একটা কিছু করিবে স্থির করিল। স্বর্ণকমল বাড়ী হইতে যাইবার সময় পূর্ব্ববৎ জননী ও ভার্য্যাকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে অনুরোধ করিয়া সকলের পদধূলি গ্রহণ করিয়া চলিল। বৃদ্ধা জননীর হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল—তিনি অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রামকমল ও মহামায়া স্বর্ণকমলের মৃত্যু কামনা করিল। কৃষ্ণকমল আশীর্ব্বাদ বা অভিসম্পাত কিছুই করিল না। মুক্তকেশী মন খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল! সুকুমারীর কষ্ট দেখিয়া মুক্তকেশীর হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নিজ স্বামীর মূর্খতাবশতঃ মুক্তকেশীর সংসারের অবস্থা স্বচ্ছল নহে। এজন্য তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে খুব কষ্ট ভোগ করিতে হয়। সুতরাং সে এখন ব্যথীর বেদনা বুঝিতে শিখিয়াছে। তাই সে আশীর্ব্বাদ করিল। আর তাহার স্বামী, ভাশুরের পক্ষাবলম্বন করিয়া যে ভাল কার্য্য করে নাই, ক্রমে ক্রমে এ ধারণাও তাহার হৃদয়ে স্থান পাইতে লাগিল।

স্বর্ণকমল যে দিন চলিয়া গেল, তাহার পর দিন রাত্রে রামকমল একটী অতি ঘৃণিত ও পাশব কার্য্য করিল। রজনী দ্বিপ্রহর, সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, সুকুমারী ও বৃদ্ধা পুত্রটীকে লইয়া এক শয্যায় শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে; এমন সময়, রামকমল সেই

চৌ-চালা গৃহের খোলা বারান্দায় ধীরে ধীরে পা টিপিয়া উঠিল এবং একটু এদিক ওদিক চাহিয়া (পাঠক, পাঠিকাগণ শুনিয়া লজ্জিত হইবেন) সেই গৃহ হইতে বহির্গমের দরজার সম্মুখে মল মূত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। পরদিন সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে, তাহার বৃদ্ধা জননী গৃহ বহিষ্কৃতা হইবার সময় সেই মলমূত্র মাড়াইলেন। আহা! বৃদ্ধা দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন, আপনার অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিলেন এবং অবশেষে অভিসম্পাত করিয়া বলিলেন,

'যে আমাকে এইরূপে জ্বালাইতেছে, মধুসূদন অবশ্যই তাহাকে শাস্তি দিবেন—সম্বৎসরের মধ্যে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।'

এই বলিয়া তিনি স্নান করিতে গেলেন। বৃদ্ধার ন্যায়, মঙ্গলাও উদ্দেশ্যে অভিসম্পাত করিতে করিতে স্থানটা পরিষ্কার করিয়া, গোময় দ্বারা উহার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিল।

রামকমল ঝগড়ার সূত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল; সুতরাং জননীর ও মঙ্গলা দাসীর কথা শুনিয়া সে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল,

'দেখ মা। এ ছেলেপিলের সংসার। তুমি ভোরের বেলা অমনতর করে শাপ দেবে, তবে তোমায় গলাটিপে বাড়ী থেকে বের করে দিব।'

বৃদ্ধা জননী কাঁদিয়া বলিল,

'আমি ত বাছা তোমাদের কিছু বলি নাই—তুমি ত আর একাজ কর নাই। গলাটিপে দিয়ে যদি সুখী হও, তবে তাই কর। যদি দশমাস দশদিন উদরে ধরে থাকি, তবে ভগবান অবশ্যই তার বিচার করিবেন।'

পাষণ্ড রামকমল আরও গর্জ্জিয়া উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, 'তোর আস্পর্দ্ধা বড় বেড়ে গ্যাছে—নয়? তুই কের শাপ দিতে লাগ্‌লি? বের হ বাড়ী থেকে,—হারামজাদী' এই বলিয়া রামকমল সত্য সত্যই একখানা যষ্টি লইয়া মাকে তাড়িয়া মারিতে গেল। 'স্বর্ণকমল! বাপ্‌ আমার' বলিয়া বৃদ্ধা কাঁদিতে লাগিল। সুকুমারী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'কেঁদ না মা, কেঁদে আর কি হবে? এ সব অদৃষ্টের ভোগ' বৃদ্ধার ক্রন্দনে পাড়ার লোকজন একত্রিত হইল। তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল, 'আর কাঁদ্‌ছ কেন, মা! তোমার সোণার ছেলে স্বর্ণকমল বেচে থাক্‌লে তোমার সকল কষ্ট দূর হবে। এখন একটু স্থির হও।' মহামায়া এই প্রতিবেশিনীর কথার উত্তরে বলিল,

'ও কাঁদ্‌বে বৈ কি? ওর সাধের ছেলে স্বর্ণকমলকে যে যমে নিয়াছে—হতভাগী, লক্ষ্মীছাড়ী।'

মহামায়া পুনঃ পুনঃ একথা বলিতে লাগিল। বৃদ্ধা ও সুকুমারী কাঁদিতে লাগিল। মায়ের কান্না দেখিয়া কোলের শিশুটী কাঁদিতে লাগিল। প্রতিবেশিনী মহামায়াকে বলিল,

'ছি! এ তোমার বড় অন্যায়। এমন করে মানুষের মনে কষ্ট দিলে ভগবান কখনই তার মঙ্গল করেন না।'

মহামায়া ও রামকমল প্রতিবেশিনীকে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিল। তারপর রামকমল মঙ্গলা দাসীর উপর বক্রচক্ষু হইল। মঙ্গলা অনেক দিন অনেক সহিয়াছে, কিন্তু আজ আর সহ্য করিতে পারিল না। রামকমল তাহাকে তাড়া করিয়া গেল দেখিয়া, সে যে ঝাঁটা দ্বারা উঠান ঝাঁট দিতেছিল, তাহা

লইয়া দাঁড়াইল। রামকমল দ্রুতবেগে যাইয়া যষ্টি দ্বারা মঙ্গলার পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে লাগিল। মঙ্গলাও তার সহ্য করিতে না পারিয়া সেই শতমুখী দ্বারা সজোরে রামকমলের মস্তকে, মুখে ও বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিল। তারপর, মঙ্গলা কাহার বারণ না শুনিয়া, আর কালবিলম্ব না করিয়া মহকুমায় যাইয়া ডেপুটী বাবুর নিকট রামকমলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল, মৌখিক এজাহারে সরল কথা বলিল। সেও যে আত্মরক্ষার জন্য শতমুখী প্রহার করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাও গোপন করিল না। মঙ্গলার ক্রন্দন ও সরলতা দেখিয়া ডেপুটী বাবুর ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না। রামকমলের বিরুদ্ধে শমন জারি হইল, কিন্তু সে হাজির হইল না। অতঃপর ওয়ারেণ্ট বাহির হইল, পুলীশের লোক রামকমলকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া আসিল, বহু চেষ্টায় রামকমল জামিনে খালাস হইল। অনেক টাকা ব্যয় করিয়া মহকুমায় ভাল ভাল উকীল মোক্তার নিযুক্ত করিল—অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া জবাব দিল। কিন্তু ডেপুটী বাবু তাহার ও তাহার সাক্ষীর কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন, 'মঙ্গলা বলিতেছে যে, সে আত্মরক্ষার জন্য রামকমলকে ঝাঁটার বাড়ি মারিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সরলতাপূর্ণ কথাটী আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, একটা ঘটনা না হইলে মঙ্গলার ঝাঁটার বাড়ি মারিবার কোন কারণ হইত না। অতএব ঘটনা সত্য। একটা ভদ্র লোকের এরূপ জঘন্য ব্যবহার অমার্জ্জনীয়। আমি আসামীর পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড করিলাম—তাহা না দিলে, আসামীর দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড

ভোগ করিতে হইবে। এই টাকা আদায় হইলে তাহা হইতে মঙ্গলা এক শত টাকা পাইবে।'

রামকমলের এই অপমানে গ্রামের কোন লোকই দুঃখিত হইল না। মঙ্গলা এক শত টাকা লইয়া পরমানন্দে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহ দাহ।

প্রজ্বলিত আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। রামকমল আর স্থির থাকিতে পারিল না। অর্থ দণ্ড দিয়া আসিয়া রামকমল গৃহদাহ, নরহত্যা, স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা প্রভৃতি কত প্রকার কল্পনা করিতে লাগিল। কিন্তু কল্পনাগুলি তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছে না দেখিয়া আপনাকে শত প্রকার ধিক্কার দিতে লাগিল। রণপটু সেনাপতি যেরূপ যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে এক অপূর্ব্ব উত্তেজনা ও উৎসাহে তন্ময় হয়, রামকমলের তখন সেরূপ অবস্থা। কেবল কল্পনা তাহার আর ভাল লাগে না—সত্য সত্যই কিছু করা চাই। সে মোকদ্দমা হারিয়া আসিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, সাত দিনের মধ্যে একটা কিছু অবশ্যই করিবে, কিন্তু আজ দশ দিন চলিয়া যাইতেছে, তবুও কিছু করা হইল না। পূর্ব্বেও এরূপ কত বার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, কিন্তু একবারও তাহা রক্ষিত হয় নাই। এইরূপ নানা চিন্তায় তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

গঙ্গাতীর গ্রামে তুফানী মোল্লা সুপরিচিত লাঠিয়াল। দাঙ্গা

হাঙ্গামা, চুরি ইত্যাদি অভিযোগে তুফানী চারি বার কারাবাস যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, প্রমাণাভাবে সাত আট বার অব্যাহতিও পাইয়াছে। রামকমল দুইটী টাকা ট্যাকে গুঁজিয়া সন্ধ্যার সময় তুফানীর বাড়ী গেল। তুফানীর বাড়ীতে দুই খানি মাত্র কুড়ে ঘর, তন্মধ্যে একখানি 'সদর' একখানি 'অন্দর'। তুফানী এই 'সদর' 'অন্দরের' মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কার্য্য করে। রামকমল সদর ঘরের সম্মুখে গিয়া ডাকিল,

'তুফানী সরদার, বাড়ী আছ?'

তুফানী তখন 'অন্দরে' ভাত খাইতেছিল। সেখান হইতে মস্তক বাহির করিয়া বলিল, 'কে, তুমি?'

রাম। এলেই চিন্‌তে পারবে, এখন।

তুফানী গলার স্বরে রামকমলকে চিনিতে পারিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, আপনি! সদর ঘরের বারান্দায় বসুন, আমি যাচ্ছি।' বলা বাহুল্য, সদর ঘরের বারান্দায় বসিবার কোন আসন ছিল না। রামকমল প্রাঙ্গণে পাইচারি করিতে লাগিল। তুফানী ক্ষিপ্রহস্তে ভোজন ব্যাপার সম্পাদন করিয়া আসিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, কি মনে করে? যদি গরীবের বাড়ী মেহেরবাণী করে এলেন, তবে একটু বসুন'; কিন্তু তাহার বসিবার কোন আসন ছিল না।

রাম। না, বসাবসির প্রয়োজন নাই, এই টাকা দুটী নাও, ছেলে পিলেদের জলখাবার কিনে দিও। আর আমার সঙ্গে এস, একটা কথা আছে।

তুফানী আহ্লাদ সহকারে টাকা দুটী লইয়া 'অন্দরে' গিয়া তাহা তাহার বিবির হস্তে প্রদান করিয়া রামকমলের সঙ্গে

চলিল। দুই পার্শ্বে লোকালয়, তাহার মধ্য দিয়া গ্রাম্য পথ। এই স্থানটুকু রামকমল ও তুফানী নিঃশব্দে অতিক্রম করিল। একটা নির্জ্জন স্থানে গিয়া রামকমল তুফানীকে চুপি চুপি বলিল,

'একটা কাজ কত্তে পার?'

তুফানীও ফুস্‌ফুস্‌ করিয়া উত্তর দিল, 'কি কাজ?'

রাম। এ কাজ তোমায় কত্তেই হবে?

তুফানী। কি কাজ, বলুন।

রাম। কববে বল—

তুফানী। আপনার কাজ করব বৈ কি?—কাজটা কি?

রাম। তবে শোন—কিন্তু তোমার খোদার দোহাই, এ কাজ কত্তেই হবে। আর কেউ যেন এর কিছু জান্‌তে না পারে।

তুফানী। তার জন্য ভাবনা কি?—বলুন না, কি?

রামকমল আপনার দুই হস্ত তুফানীর স্কন্ধের উপর দিয়া তাহার কাণে কাণে কয়েকটী কথা বলিল। তুফানী তাহা শুনিয়া চমকিয়া বলিল,

'বাপরে! এ কাজ ত আমি কখনো করি নাই!'

রামকমল তাহার দুই হস্ত ধরিয়া বলিল,

'দেখ সরদার ভাই। এ কাজ তোমার কত্তেই হবে।'

তুফানী সে কথায় কোন উত্তর প্রদান করিল না। রামকমল তাহার অনিচ্ছা বুঝিতে পারিয়া বলিল,

'তোমার নিকট আমার পঁচিশ টাকা পাওনা আছে। সুদও বার তের টাকা বাকি। এ পর্য্যন্ত একটী পয়সাও দেও নাই। তুমি আমার এ কাজ করে দেও, আমি তাহার একটা পয়সাও চাইনে। তোমাকে আরও কিছু বক্‌সিস্‌ দিব।'

খতের টাকা দিতে হইবে না বলিয়া তুফানী সর্দার বড় একটা লাভ মনে করিল না। কারণ, এই ঋণ যে পরিশোধ করিবে না, ঋণ গ্রহণের সময়ই সে তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু নগদ বক্‌সিসের লোভটা সে ছাড়িতে পারিল না।

তুফানী। আপনি সঙ্গে থাকিয়া দেখাইয়া দিবেন।

রামকমল চিন্তা করিয়া বলিল,

'আমি সঙ্গে না থাকিলে পারিবে না?'

তুফানী। আজ্ঞে না—আমি এ কাজ কখনও করি নাই।

রাম। তবে যে করেই হউক থাক্‌ব।

রামকমল তুফানীকে লইয়া নিজ গৃহের দিকে চলিল। তখন রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। রামকমল তুফানীকে নিজ বাড়ীসংলগ্ন একটা নিবিড় বাগানে একটা বৃক্ষের অন্তরালে বসাইয়া, গৃহে যাইয়া স্বহস্তে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া আনিল, নিজে তাহা সেবন করিতে করিতে, কল্কেটী তুফানীর হস্তে দিল। তুফানী হস্তের দ্বারা হুকার কার্য্য করিয়া তামাক খাইল।

সে দিন কৃষ্ণপক্ষের একাদশী, সুতরাং পৃথিবী গাঢ় তমসাচ্ছন্ন। তুফানী সর্দ্দার ও রামকমল অতি নিকটস্থ হইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কত কথা কহিতেছে, কিন্তু সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে কেহ কাহাকে দেখিতে পাইতেছে না। প্রত্যেক বৃক্ষপত্র পতন শব্দে তাহারা চমকিয়া উঠিতেছে—বৃক্ষোপরস্থ পক্ষিগণের পক্ষব্যজন শব্দে ভীত হইতেছে। মশককুল মহাসমারোহে নিমন্ত্রণভোজনে নিযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু শব্দ হইবে ভয়ে তাহারা মশা তাড়াইতে পারিতেছে না। এইরূপে রজনী সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। রামকমল একখণ্ড বাঁশ, দুইটা টীকা, একটা আগুনের

হাঁড়ি, এক আটি শুষ্ক খড ও একটা দড়ি আনিয়া রাখিয়াছিল। তুফানী খড়গুলি একত্রিত করিয়া দড়ি দিয়া উহা বাশের অগ্র-ভাগে বাধিল। উভয়ে সেই চৌ-চালা গৃহের পশ্চাদ্ভাগে গেল। তখন সকলে গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত—কোন রূপ সাড়া শব্দ নাই, রামকমল তুফানীর কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,

'বাহিরের দিকে ঘরের দরজা দুটা বাঁধিয়া রাখ—যেন ঘরের বাহির হইতে না পারে।'

তুফানী তাহা করিতে ভয় পাইল। রামকমল নিজ হস্তে সে কাজ করিল। তখন পূর্ব্বদিকে সোণার থালার ন্যায় চন্দ্র উঠিতেছে, দেখা গেল। রামকমল তুফানীর নিকটস্থ হইয়া, ব্যস্ততাসহকারে হস্ত নাড়িয়া, ইঙ্গিতে বলিল, 'শীঘ্র কর'। তুফানী সন্ধার হাঁড়ির আগুনে টিকা জ্বালিয়া খড়ের পাজার মধ্যে তাহা গুঁজিয়া ফুৎকার দিতে লাগিল। প্রতি ফুৎকারে তাহার মুখ আলোকিত হইতে লাগিল, হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, হস্ত পদ শিথিল হইয়া আসিল। রামকমল পুনরপি নিকটে গিয়া বলিল, 'ভয় কি?—শীঘ্র কর'। তুফানী ভয়বিহ্বল হইয়া অগত্যা কাঁপিতে কাঁপিতে বাশটা উচু করিয়া সেই চৌ চালা গৃহের চালার এক কোণে অগ্নি প্রদান করিল। রামকমল নিজগৃহের দরজায় গিয়া দাড়াইল। তুফানী ভীত হইয়া বাশটা তথায় ফেলিয়া রাখিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। তাহার পায়ের ও বাশ পতনের শব্দে মঙ্গলার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে বলিল, 'কে ও।' কোন উত্তর না পাইয়া 'চোর চোর' শব্দে বিকট চীৎকার করিয়া মঙ্গলা বাহিরে আসিল, তাহার চীৎকারে ভজহরিও বাহিরে আসিল, তদ্রু শব্দে আগুন জ্বলিয়া উঠিল মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত চালায় অগ্নি বিস্তৃত হইল।

তাহা দেখিয়া ভজহরি ও মঙ্গলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চীৎকার করিয়া গিন্নি ঠাকুরাণী ও ছোট-বৌকে ডাকিতে লাগিল। চীৎকারে তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল, ভয়ে সকলে উঠিয়া বসিলেন। গিন্নি কৃপাময়ী ব্যস্ততাসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,

'কি হয়েছে, মঙ্গলা?'

'সর্ব্বনাশ হয়েছে। সর্ব্বনাশ হয়েছে! শীঘ্র দরজা খুলুন।'

বিপদে বুদ্ধিলোপ হয়। এ অবস্থায়ও তাহাই হইল। বাহিরে মঙ্গলা ও ভজহরি চীৎকার করিতেছে, আর গৃহের অভ্যন্তরে বৃদ্ধা ও সুকুমারী দরজা খুঁজিয়া পাইতেছে না। অনেক চেষ্টার পর দরজা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু অনেক টানাটানি করিয়াও কেহ তাহা খুলিতে পারিল না। বৃদ্ধা ও সুকুমারী চীৎকার করিয়া এ কথা বলিতে লাগিল, কিন্তু বাহিরের ও ভিতরের চীৎকার মিশিয়া গেল—কেহ কাহার কথা শুনিতে পাইতেছে না, অথচ সকলেই চীৎকার করিতেছে। আগুন তখন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। মঙ্গলা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; বৃদ্ধা ও সুকুমারী মস্তকের উপর আগুন দেখিয়া, বহির্গমনের পথ না পাইয়া ভীষণ কান্না জুড়িয়া দিল। গভীর রজনীর সেই বিকট চীৎকার ও ক্রন্দনধ্বনিতে কৃষ্ণকমল ও মুক্তকেশী বাহির হইল, পাড়ার লোক দৌড়িয়া আসিতে লাগিল, রামকমল ও মহামায়া দরজা খুলিল না। তখন আগুন গৃহান্তরে বিস্তৃত হইল। ভীষণ অগ্নির ভীষণ উত্তাপে সত্য সত্যই বৃদ্ধা, সুকুমারী ও নবজাত শিশুটী অর্দ্ধদগ্ধ হইতে লাগিল। কৃষ্ণকমল ও মুক্তকেশী বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িয়া নিজগৃহে যাইয়া এক খানা দা লইয়া আসিল, তখন সকলে বেড়ার বাঁধ কাটিয়া দিতে

লাগিল। সকলে টানাটানি করিয়া বেড়াগুলি ফেলিয়া দিতে লাগিল। বৃদ্ধা সেদিন একাদশীর উপবাস করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন—সেই বিপদে তিনি হতজ্ঞান হইযা ঘরেব মেজেতে পড়িয়া গেলেন। সুকুমাবী ছেলেটীকে কোলে লইয়া অগ্নিব ভীষণ উত্তাপে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে উপব হইতে প্রজ্বলিত অগ্নিখণ্ড তাহাদেব গায় পড়িতেছিল। মঙ্গলা, ভজহরি, কৃষ্ণকমল ও মুক্তকেশী প্রাণেব ভয় না করিয়া সেই প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ কবিযা তাহাদিগকে টানাটানি কবিয়া বাহিরে আনিল। তাহারা যন্ত্রণায় মৃতপ্রায় হইযা ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। মঙ্গলা ও মুক্তকেশী প্রাণপণ করিয়া তাহাদিগকে ব্যজন কবিতে লাগিল।

এ দিকে পাড়াব লোক জড় হইযাছিল, তাহাদেব দ্বাবা অগ্নি নির্ব্বাণ পক্ষে বড় সাহায্য হইল না। গৃহসামগ্রীগুলিও বড় বক্ষা হইল না। একে একে সবগুলি ঘব পুড়িযা ছাই হইল। গৃহ-সামগ্রীগুলি ভস্মীভূত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বামকমল ও কৃষ্ণকম-লেব বন্ধনগৃহ দু'খানাও গেল। কৃষ্ণকমল ও মুক্তকেশীব হৃদযে আজ দযাব সঞ্চাব হইযাছে। তাঁহাবা বৃদ্ধা, সুকুমাবী ও নবজাত শিশুটীব যন্ত্রণা দূবীকবণে নিযুক্ত হইল। আপনাদেব ক্ষুদ্র ঘবখানা পুড়িয়া গেল, তাহাতে ভ্রূক্ষেপও কবিল না।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মৃত্যু।

ভোরের সময় অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। রাত্রিতে যাহারা আসিয়াছিল, পরিশ্রান্ত হইয়া তাহারা গৃহে ফিরিল। রাত্রিতে যাহারা আসে নাই, তাহারা দলে দলে তামাসা দেখিতে আসিতে লাগিল। রামকমল কার্য্য-ব্যপদেশে অতি প্রত্যূষে গৃহবহিষ্কৃত হইল এবং তাহার দলের জনৈক দুষ্কর্ম্মরত ব্যক্তি দ্বারা স্বর্ণকমলের নিকট একখানি মিথ্যা পত্র লিখাইয়া দিল। তাহার মর্ম্ম এই যে, স্বর্ণকমলের স্ত্রী, পুত্র, জননী ঘর পুড়িয়া মরিয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধা কৃপাময়ী তখনও বাহিরে ছট্‌ফট্ করিতেছে। স্বর্ণকমলের শিশু পুত্র মাখনলাল যন্ত্রণায় 'মা মা' রবে চীৎকার করিতেছে। সুকুমারী অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। সে পুত্রটীকে কোলে লইয়া কাঁদিতেছে। বৃদ্ধার মস্তকে, বক্ষঃস্থলে, ও দক্ষিণ পদে প্রজ্বলিত অগ্নিখণ্ড পড়িয়াছিল। মস্তকের কতকগুলি চুল পুড়িয়া গিয়াছে এবং দগ্ধ স্থানগুলিতে ফোস্কা পড়িয়া ভীষণ আকৃতি ধারণ করিয়াছে! আহা! বৃদ্ধাকে আর চিনিতে পারা যায় না। মাখনলাল কচি শিশু, অগ্নির সেই ভীষণ উত্তাপে তাহার সুকোমল সোণার দেহ রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে—স্থানে স্থানে ফোস্কা পড়িয়াছে। সেই নবনীত সদৃশ শিশু সর্ব্বাঙ্গের যন্ত্রণায় উঠিতে, শুইতে বা বসিতে পারিতেছে না, শরীরে জননীর হস্ত স্পর্শ হইবামাত্র 'মা মা' করিয়া চীৎকার করিতেছে। সুকুমারীর অগ্নির উত্তাপে অসহ্য কষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে ক্রমেই একটু

সুস্থ হইতে লাগিল, শিশুসন্তান ও শাশুড়ীর কষ্ট দেখিয়া অশ্রুজলে তাহার বক্ষঃ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

রৌদ্রের উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা ও শিশুর যন্ত্রণাও ক্রমে বাড়িতে লাগিল। ভজহরি ও মঙ্গলা ব্যজনকার্য্যে নিযুক্ত হইল। পরদুঃখকাতর প্রতিবেশীগণ এ দৃশ্য দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল।

তারপর কথা উঠিল—কিরূপে কাহার দ্বারা এ কাণ্ড হইল? সকলেই একবাক্যে বলিল,

'অবশ্যই ইহা কোন সর্ব্বনেশে লোকের কাজ, নহিলে চৌ-চালা গৃহের চালের উপর আগুন আসিল কিরূপে? এ ত আর রান্না-ঘর নয়! আর মানুষে এ কাজ না করিলে, বাহিরের দিকে ঘরের দরজা বাঁধিয়া রাখিল কে? আহা! এমন সোণার মানুষ, ইহাদের আবার শত্রু কে? এমন মানুষের প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হয়, এমন নিষ্ঠুর, এমন পাষণ্ড কে আছে?"

মঙ্গলা দুঃখে ও ক্রোধে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,

'ইহা নিশ্চয়ই বড় বাবুর কাজ—আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আগুন নিবাইতে কত লোক আসিল কিন্তু বড়বাবু আসিল না।'

মঙ্গলার স্বচক্ষে দেখার কথাটুকু মিথ্যা।

ভজহরি কহিল, 'ঝির চীৎকার শুনিয়া আমি অন্দর বাড়ীতে আসিতেছিলাম, তখন দেখিলাম বড়বাবু তাহার দালানের সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ভিতরে যাইয়া দরজা বন্ধ করিল।'

এইরূপ অনেক কথা হইল। রামকমলের অনুপস্থিতিতে সন্দেহ আরও বাড়িল। প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে কাহার

বিলম্ব হইল না। পাড়ার লোক সকলে রামকমলের উপর চটিয়া গেল।

বৃদ্ধা কৃপাময়ীর একটু চৈতন্য হইল। এই সমস্ত আলোচনা তাঁহার কাণে গেল। আর বৃদ্ধা স্থির থাকিতে পারিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে সজোরে নিজের কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, 'হা ভগবান, এই কি তোমার সৃষ্টি। কোন্ পাপে এখনও বেঁচে আছি?' বৃদ্ধার মস্তকের দক্ষিণাংশ ও দক্ষিণ গণ্ড ব্যাপিয়া একটা ফোস্কা পড়িয়াছিল। করাঘাতে সেই ফোস্কা গলিয়া গেল। ফোস্কার জল চক্ষে মুখে বাহিয়া পড়িল! বৃদ্ধা পুনরপি হতজ্ঞান হইলেন।

মাখনলাল যন্ত্রণায় ছট্‌ ফট্‌ করিতে করিতে ডাকিল, 'মা!' কিন্তু শিশুর স্বর ভগ্ন ও বিকৃত হইয়াছে, শব্দোচ্চারণ-শক্তি হ্রাস হইয়াছে। সুকুমারী অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে শিশুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল, মুখে স্তন্য প্রদান করিল, কিন্তু শিশু তাহা পান করিল না—কাঁদিতে লাগিল। সুকুমারীর চক্ষু হইতে প্রস্রবণ বহিতে লাগিল।

মুক্তকেশী নিজে চক্ষু মুছিয়া বলিল, 'কেঁদ না ছোট-বৌ! চল ঘরে যাই।' তাহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ক্রমে সুকুমারী পুত্রটীকে লইয়া মুক্তকেশীর গৃহে গেল। বৃদ্ধাকেও তথায় ধরাধরি করিয়া নেওয়া হইল। সেদিন সেখানে থাকিবার বন্দোবস্ত হইল। সুশীলা ও সরলা আজ পিতামাতার সুদৃষ্টান্ত দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়াছে। তাহারাও ঠাকুর-মা ও কাকী-মার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

বৃদ্ধার আবার চৈতন্যোদয় হইল। সুকুমারীকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিলেন,

'মা! লক্ষ্মি! কাঁদিস্ না মা—তুই কাঁদ্‌লে যে আমার মাখনলাল কেঁদে খুন হবে।' মাখনের যে কি অবস্থা হইয়াছে বৃদ্ধা এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই। তাই বলিলেন,

'কৈ, মাখন কৈ আমার? আজ ত আমার সোণার চাঁদ একটীবারও আমার কোলে আসে নাই, মাখনকে একবার আমার কাছে দে।'

মঙ্গলা এতক্ষণ এককোণে বসিয়া চক্ষু মুছিতেছিল। বৃদ্ধার কথা শুনিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল,

'মাখন কি আর সে মাখন আছে গো। মানুষ কি এমন সর্ব্বনাশ করিতে পারে? ধর্ম্ম কি নেই? সম্বৎসরের মধ্যে ভগবান তাকে দগ্ধে মারবেন।' সকলে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

কৃষ্ণকমল ডাক্তার ডাকিতে গেলেন। ডাক্তার আসিয়া দগ্ধ স্থানে একটা মলম দিয়া গেলেন। মঙ্গলা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া চক্ষু মুছিয়া ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবু, মাখনের কেমন বুঝ্‌লে?—বাছা ভাল হবে ত?' ডাক্তারবাবু মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'তা কি বলা যায়? হ'লে হ'তেও পারে।' মঙ্গলা কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিল।

ক্রমেই মাখনলালের ও বৃদ্ধার কষ্ট বাড়িতে লাগিল। সুকুমারী আর এ দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া মঙ্গলার কোলে মাখনকে দিয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় মহামায়া মুক্তকেশীকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিল,

'তুমি ক'চ্ছ কি? শত্তুরের সঙ্গে আবার খাতির কি?—কেন

এত কষ্ট ক'চ্ছ? এতে কি লাভ হবে?—ওদের চরিত্র জান্‌তে কি তোমার এখনও বাকি আছে?'

আজ মুক্তকেশী মহামায়ার মহামন্ত্র গ্রহণ করিল না। রাগত স্বরে বলিল, 'ছি! বড় দিদি! এ তোমার বড় অন্যায়, দেখ দেখি ওরা কত কষ্ট পাচ্ছে, এ দেখে কার না দয়া হয়? ঘর দুয়ার কাপড় চোপড় কিছু নাই, মাখনলাল আর ঠাকরাণী ত মর মর হয়েছে। আহা! এমন সোণার ছেলে কি হয়েছে, দেখে যে পাষাণও গলে যায়। আর ভেবে দেখ দেখি, ওরা কার কি অন্যায় করে? আমরা গায়ে পড়ে ওদের নানারকমে জ্বালাতন করি, কত অনিষ্ট করি, তবু ওরা চুপকরে থাকে, ভগবান আর কত সইবেন? ছি! এমন করে মানুষের সর্ব্বনাশ কত্তে আছে! তোমরা বড় নিষ্ঠুর!' বলিতে বলিতে মুক্তকেশী চক্ষু মুছিল। মহামায়া বিফলমনোরথ হইয়া গেল।

রাত্রে কষ্ট আরও বাড়িল। বৃদ্ধা আপনার কষ্টে বড় ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, কিন্তু মাখনলালের অবস্থা শুনিয়া তিনি কতক্ষণ বিকট ক্রন্দন জুড়িয়া দিলেন, এবং পৃথিবীর সমস্ত দেবতাকে সাক্ষী করিয়া শোকে দুঃখে অভিভূত হইয়া বলিলেন,

'আমার এমন সোণার চাঁদকে যে পুড়ে মার্‌লো, ভগবান্ তাকে দগ্ধে মার—মার—মার!' ইহা বলিয়া বৃদ্ধা পুনরায় চৈতন্য হারাইল। গভীর রজনীর এই গভীর অভিসম্পাত রাম-কমল ও মহামায়া শুনিতে পাইল; তাহারা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল; মহামায়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কেঁপে উঠ্‌লে কেন?' রামকমল বলিল, 'কৈ?—না।'

রজনী তৃতীয় প্রহর। মিটি মিটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। কৃষ্ণ-

কমল গতরাত্রের অনিদ্রা ও পরিশ্রম হেতু নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা হতজ্ঞানাবস্থায় শয্যায় এক এক বার শিহরিয়া উঠিতেছে। সুকুমারী মঙ্গলার কোল হইতে মাখনলালকে নিজ কোলে টানিয়া লইয়া সতৃষ্ণনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। মুক্তকেশী ও মঙ্গলা পার্শ্বে বসিয়া আছে। সকলেই কাঁদিতেছিল—কে কাহাকে প্রবোধবাক্য বলিবে?

মাখনলালের অবস্থার ভীষণ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সেই—শিশু একটু একটু পরেই কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, একটু রক্ত বমন করিল, উহার শ্বাস ঘন ও দীর্ঘ হইয়া আসিতে লাগিল, প্রত্যেক শ্বাস গ্রহণের সময় তাহার তলপেট পর্য্যন্ত নড়িতে লাগিল। শিশুর এই অবস্থা দেখিয়া সুকুমারী ও মঙ্গলা অস্থির হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মুক্তকেশী ভীতা হইয়া তাহার স্বামীকে জাগ্রত করিল। কৃষ্ণকমল চক্ষু রগড়াইয়া আসিতে আসিতে মায়ের কোলে মাখনের প্রাণটুকু উড়িয়া গেল। সংজ্ঞাশূন্যা বৃদ্ধা এ সংবাদ জানিতে পারিলেন না। তাঁহার অবস্থাও ক্রমেই শোচনীয় হইতে লাগিল। শেষ রাত্রে বৃদ্ধা প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। বলিলেন,

'বেশ করেছে, বেশ করেছে। দিব না—কেন দেব? সোণার ছেলে নিয়ে যাবে?—তা হবে না, হবে না। উঁ হুঁ হুঁ, বাছা কাঁদ্ছে। আয় মাখন! আমার কাছে আয়—ভয় কি? এই যে আমি এখানে বসে আছি।' বৃদ্ধা একটু থামিয়া আবার বলিলেন, 'ঐ নিয়ে যায় নিয়ে যায়। নিয়ে গেল, নিয়ে গেল, নিয়ে গেল। স্বর্ণকমল,—বাপ আমার! শীগ্‌গীর ধর্, ধর্ ধর্। —কৈ, তোকেও নিয়ে গেল! হায়! হায়! হায়!' রাত্রি প্রভাত হইল, কিন্তু প্রলাপ থামিল না। 'আবার এয়েছে—আবার

নেবে ?—কত মার্‌বে—মার—আমি কাঁদ্‌ব না। কেন কাঁদ্‌ব ?—মাখন বড় হবে, মানুষ হবে, কেউ কিছু বল্‌তে পার্‌বে না। মাখন আমার সোণার চাঁদ।'

বৃদ্ধার প্রলাপবাক্য শুনিয়া সকলের চক্ষু হইতে বন্যার জলের ন্যায় প্রবলবেগে বারিধারা পড়িতে লাগিল। 'উহুঃ—বড় ব্যথা, তাই কাঁদে। আ-গু-ন—আ-গু-ন্—আ-গু-ন্। পু-ড়ে গেল-অ, পুড়ে গেল-অঃ। হায, হায, হায! কেউ নাই, কেউ নাই। স্বর্ণ-কমল এলো না। ঐ কুকুর—ঐ কুকুর! কামড়ায—কামড়ায়। উ হু-হুঃ বড় ব্যথা।—মারিস্ না—মারিস্ না—কুকুর মেরে কি হবে ?—ঐ কামড়িয়ে কামড়িযে ওর দাঁত ভেঙ্গে গ্যাছে—আর মারিস্ না।—কুকুরটা মেরে ফেল্লি ?—ছিঃ কেন মাল্লি ? হিংসা—ছিঃ! রাগ ?—ছিঃ।'

দিবা দ্বিপ্রহরের সময় বৃদ্ধার আবার চৈতন্যোদয় হইল, কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। তখন সুকুমারী ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছে। বৃদ্ধা তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া বলিলেন,

'মা—লক্ষ্মি—কেঁদ না, কেঁদ না। এ দুঃখু থাক্‌বে না—ভগবান্ নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল করিবেন। এস—আমার পায়ের ধূলি লও।' তার পর মুক্তকেশীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'মেজ-বৌ! মা! বড় সুখী হলুম। বেঁচে থাক মা! বড়-বৌ কোথা ?' মুক্তকেশী শাশুড়ীর আশীর্ব্বাদবাক্য শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বড়-বৌ আসিল না। সুকুমারী ও মুক্তকেশী অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে বৃদ্ধার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধার তখন বাক্য-প্রয়োগের শক্তি নাই—তিনি মুখ নাড়িয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। দেখিতে দেখিতে চক্ষু তালুর উপর উঠিল। দুই তিন বার তাঁহার

সেই দগ্ধশরীর আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। ক্রন্দনের রোলের মধ্যে বৃদ্ধার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সব হইল—সব ফুরাইল।

লালচক বাগানের জলবায়ু স্বর্ণকমলের সহ্য হইল না। বাড়ী গিয়া স্বাস্থ্য একটু ভাল হইয়াছিল বটে, কিন্তু কার্য্যস্থলে যাইবার পরই আবার জ্বর হইল। ঔষধ সেবনেও জ্বর বন্ধ হইল না। ডাক্তার বলিল, আর কয়েক দিন গেলেই সারিয়া যাইবে। কয়েক দিন গেল, জ্বর একটু থামিল, কিন্তু আবার দেখা দিল। এমন সময় রামকমল, রামনিধি বিদ্যালঙ্কারের নাম জাল করিয়া, স্বর্ণকমলের নিকট পূর্ব্বোল্লিখিত মিথ্যা পত্র প্রেরণ করে। স্বর্ণকমলের মনে কষ্ট দেওয়াই রামকমলের উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। পত্র পাঠ করিয়া স্বর্ণকমল বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িল। তাহার অসুস্থ শরীরে স্ত্রী, পুত্র, জননীর মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার হৃদ্‌পিণ্ড একবারে ছিন্ন হইয়া গেল। সেই দিনই জ্বর একবারে প্রবলবেগে বৃদ্ধি হইল। স্বর্ণকমল হতজ্ঞান হইল। সাহেব বাগানের ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ হঠাৎ জ্বর এত বাড়িল কেন?' ডাক্তার, সাহেবকে পত্র দেখাইয়া বলিলেন, 'এ পত্রের লিখিত শোকসংবাদ পাঠ করাতে রোগীর হৃদ্‌পিণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।'

সাহেব। রোগীর জীবন রক্ষা করিতে পারিবে ত?

ডাক্তার। সন্দেহ স্থল—মানসিক যন্ত্রণা কমাইতে না পারিলে

প্রাণ বাঁচান কঠিন হইবে। এ সময়ে শোক নিবারণের উপায় দেখিতেছি না।

সাহেব। জীবন রক্ষা করিতে পারিলে এক শত টাকা পুরস্কার পাইবে—প্রাণপণ করিয়া চিকিৎসা কর।

ডাক্তার। চেষ্টার ত্রুটি করিব না—ভগবানের হাত।

ডাক্তারবাবু বিশেষ পরিশ্রম সহকারে ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, সাহেব প্রত্যেক ঘণ্টায় রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে তত্ত্ব লইতে লাগিলেন, কিন্তু রোগ উপশম বা হ্রাসের কোন লক্ষণ দেখা গেল না, বরং উত্তরোত্তর অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। সাহেব ভীত হইলেন এবং স্বর্ণকমলের আত্মীয় স্বজনকে খবর দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিলেন। প্রকারান্তরে সাহেব স্বর্ণকমলের অভিমত জানিতে চাহিলেন, স্বর্ণকমল উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,

'আমার আছে কে?—কাহাকে খবর দিতে বলিব?'

বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। উপাধানের নীচ হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া তাহা সাহেবের হস্তে দিতে চাহিল। সাহেব বলিলেন,

'পত্রের সংবাদ আমি শুনিয়াছি, কিন্তু আমার বোধ হয় পত্রখানা কৃত্রিম। ঘটনা সত্য হইলে তোমার ভাই পত্র লিখিতেন।'

'আমার আবার ভাই কোথা?—আমি তাহাদের শত্রু।—এ সংসারে আমার যা ছিল সব গিয়েছে—আমার কেউ নাই।'

স্বর্ণকমল হৃদয়াবেগ ধারণ করিতে না পারিয়া ফুকারিয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সাহেব। সত্য হইলে তোমার ভাই সর্ব্বাগ্রে এ সংবাদ প্রদান

করিয়া শত্রুতা উদ্ধার করিত। হয় ত ইহা তোমার ভাইদের চক্রান্ত। তাহারা পরের নাম জাল করিয়া এই মিথ্যা সংবাদ দিতে পারে।

স্বর্ণকমলের মনেও অনেকবার এ কথা উঠিয়াছিল, এইরূপ চিন্তায় সে একটু শান্তিও বোধ করে, কিন্তু তবু তাহার মন স্থির হয় না। সন্দেহের বৃশ্চিক দংশনে সে একবারে অস্থির হইয়া পড়িল। ডাক্তারবাবু তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি শীঘ্র সঠিক খবর আনিয়ে আপনার চিন্তা দূর করিব।'

স্বর্ণকমল ভগ্ন স্বরে বলিল,

'ব্যস্ত হযে লাভ কি? ডাক্তারবাবু! আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি যে আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। আমার হৃদয় কাঁপিতেছে, প্রাণটা হু হু করিতেছে, মন শূন্য শূন্য বোধ হইতেছে, আমার বুঝিতে কিছু বাকি নাই। স্বাভাবিক মৃত্যু হইলে তাহা বরং সহ্য হইত, কিন্তু ভাই এই যে আগুন দিয়ে পুড়ে মেরেছে।—দুঃখিনী মায়ের কষ্টের কথা মনে হইলে আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়, স্ত্রীর কথা মনে পড়িলে আমি পাগল হই, আর শিশু ছেলেটী—তার কথা আর কি বলিব?'

স্বর্ণকমলের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল—আর কথা বাহির হইল না। অশ্রুধারা মুছিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'ভাই! একটী দিন তাহাদিগকে সুখী করিতে পারিলাম না। আহা! তাহারা কত কষ্ট পাইয়া মরিয়াছে, একবার ভাবিয়া দেখ, তোমারও বুক ফাটিয়া যাইবে।—আমি কেন এ দূরদেশে এসেছিলুম। যাদের জন্য এসেছিলুম, তারা এখন কোথায়?'

স্বর্ণকমলের কথা শুনিয়া ডাক্তারবাবু চক্ষু মুছিলেন। স্বর্ণকমল ধীরে ধীরে বলিল,

'একটু জল।'

ডাক্তারবাবু রোগীর মুখে একটু জল দিলেন।

স্বর্ণকমল বলিল, 'আরও দেও।'

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'অধিক জল খাইলে ব্যাবাম সারিবে না।'

স্বর্ণকমল একটু হাসিয়া বলিল, 'তুমি পাগল হইয়াছ'—আমার ব্যাবাম সারিয়া দরকার?—আমার এ জীবনে আর প্রয়োজন কি ভাই?—আমার আছে কে?—আমি কার জন্য বেগার খাটিব?—যাহাদের কষ্ট দূর করিব বলিয়া এই দূরদেশে আসিয়াছিলাম, তাহারা চলিয়া গেল, আমার থাকিয়া প্রয়োজন? এখন যত শীঘ্র আমার মৃত্যু হয়, ততই আমার কষ্ট কম হইবে।'

স্বর্ণকমল উপাধানে মুখ লুকাইয়া অবিরাম অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। ডাক্তার তাহার স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আর কোন বিষয়ে আপত্তি করিতে সাহসী হইলেন না। অতঃপর ডাক্তার রোগীর নিকট দুই এক বার ঔষধ ধরিয়াছিলেন, কিন্তু স্বর্ণকমল তাহা সেবন করিল না।

স্বর্ণকমল একটু স্থির হইয়া দীনেশ বাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইতে বলিল। সংবাদ প্রেরিত হইল। অতঃপর স্বর্ণকমল সাহেবের নিকট বিনীত ভাবে বলিল,

'আপনি আমার প্রতি অত্যধিক অনুগ্রহ করেছেন, তজ্জন্য আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ। আমার একটী নিবেদন আছে, আপনার অনুরোধ ও পরামর্শেই আমি পাঁচ হাজার টাকার

জীবন-বীমা করিয়াছি। যদি পত্রের সংবাদ মিথ্যা হয়, তবে আমি মরিলে এই টাকা গুলি যাহাতে আমার স্ত্রী পাইতে পারে, আপনি দয়া করিয়া সে চেষ্টা করিবেন। দীনেশবাবু এ সংসারে আমার একমাত্র বন্ধু, তাঁহাকে জানাইলে তিনি সব করিবেন।'

সাহেব বলিলেন,

'তাহা করিব—কিন্তু তুমি এত ভীত হইলে কেন?'

স্বর্ণ। কৈ, না—এখন আমার আর মরিতে ভয় হইবে কেন?

এদিকে স্বর্ণকমলের প্রেরিত সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই দীনেশ-বাবু গঙ্গাতীরের সংবাদ জানিয়াছিলেন। তাই তিনি স্বর্ণকমলের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—'তোমার গৃহদাহ হইয়া গিয়াছে। তোমার মা ও শিশুটী রোগগ্রস্ত—সুকুমারী ভাল আছে। তুমি ছুটী লইয়া শীঘ্র বাড়ী আইস।' দীনেশচন্দ্র কি উদ্দেশ্যে স্বর্ণকমল-জননী ও শিশুটীর মৃত্যুসংবাদ গোপন করিয়া সংবাদ পাঠাইলেন, পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। দীনেশচন্দ্রের প্রেরিত সংবাদে স্বর্ণকমল আবার উল্লাসিত হইল। 'সুকুমারী তবে এখনো বেচে আছে' পুনঃ পুনঃ একথা বলিতে লাগিল। আজ এগার দিন স্বর্ণকমলের পেটে ভাত পড়ে নাই, সুতরাং শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময়ে দীনেশ-বাবুর প্রেরিত সংবাদ তাহার নিকট আসিল। অতি অবসাদের পর উল্লাসে রোগীর ভগ্ন শরীর ভীষণ উত্তেজনা-স্রোতে ভাসিতে লাগিল। 'সুকুমারী বেঁচে আছে' 'সুকুমারী বেচে আছে' ইহাই স্বর্ণকমলের মূল মন্ত্র হইল। ভীষণ উত্তেজনায় ক্ষিপ্তবৎ হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে শত বার সুকুমারীর নামোচ্চারণ করিতে লাগিল।

ডাক্তারের বারণ শুনিল না, সাহেবের বারণ গ্রাহ্য করিল না—কেবল 'সুকুমারী' কেবল 'সুকুমারী'। কখন হাসিয়া বলে, 'আমার সুকুমারী', পরমুহূর্ত্তে কাঁদিয়া বলে, 'কোথা—সে?' স্বর্ণকমলের সেই জীর্ণতরী উল্লাসের প্রবল তরঙ্গাঘাত সহ্য করিতে পারিল না। ডাক্তারবাবু সাহেবকে বলিলেন,

'লক্ষণ অত্যন্ত খারাপ—আর বাঁচাইতে পারিলাম না।

সাহেব অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

স্বর্ণকমল অজ্ঞানাবস্থায় প্রলাপ বকিতে লাগিল,

'মা, মা, মা—সেও না, সেও না। এত ভাল, এত কষ্ট।—সব পর চিন্তা কি? পাপের শাস্তি হবেই হবে—ঐ ত মাথার উপর পরমেশ্বর। ঐ তিনি বলেন, 'হবে'। কি সুন্দর! কি সুন্দর!'

ডাক্তারবাবু মনে করিলেন, এ সব অসম্বদ্ধ কথা, কিন্তু যাহারা তাহার পারিবারিক অবস্থা জ্ঞাত আছেন, যাহারা তাহার ভ্রাতৃচরিত্র অবগত আছেন, তাহারা কেহ আজ স্বর্ণকমলের শয্যাপার্শ্বে থাকিলে বুঝিতে পারিতেন যে, সে একটীও অসম্বদ্ধ কথা বলে নাই। মায়ের দুঃখ, ভার্য্যার দুঃখ ও ভ্রাতৃদ্বয়ের নৃশংস ব্যবহারে পিষ্ট ও ভগ্নহৃদয় হইয়া, ভ্রাতৃ-তাড়িত স্বর্ণকমল আজ সুদূর আসামের এক জনশূন্য প্রান্তে ভীষণ মর্ম্মযাতনা ভোগ করিতে করিতে প্রাণ হারাইতেছে। তিন দিবস হতজ্ঞানাবস্থায় স্বর্ণকমল কত কথাই বকিল। চতুর্থ দিন, 'এসেছ, বেস করেছ' বলিতে বলিতে তাহার মুখ একটু প্রসন্ন হইল। আবার একটু জ্ঞান হইল, কিন্তু তাহা নির্ব্বাণোন্মুখ প্রজ্বলিত দীপশিখার ন্যায় ক্ষণকালের জন্য মাত্র। রোগীর হস্তপদ শীতল হইয়া আসিতে লাগিল, চক্ষু দুটী স্থির, বিস্ফারিত ও উদ্ধগ হইল, নয়নপ্রান্তে দুই বিন্দু

জল দেখা গেল। মুমূর্ষু রোগী ইঙ্গিতে কি একটা কথা বলিল, কিন্তু ডাক্তারবাবু তাহা বুঝিলেন না। যৌবনের প্রথমভাগে, পার্থিব ও সাংসারিক সুখভোগের পূর্ব্বে, হৃদয়ের আশা অপূর্ণ থাকিতে, বিদেশে, নিজ পরিজন ও বন্ধুবর্গের অনুপস্থিতিতে, দুঃখের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে, স্বর্ণকমলের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল! রামকমলের সব হইল—সুকুমারীর সব ফুরাইল!

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অশনি পতন।

দীনেশবাবু স্বর্ণকমলকে সংবাদ পাঠাইয়া সুকুমারীকে সান্ত্বনা প্রদান জন্য এবং নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণের সাহায্যার্থ দুই তিন জন লোক সহ গঙ্গাতীরে রওনা হইতেছিলেন, এমন সময় চা-বাগানের সাহেবের প্রেরিত সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল। দীনেশবাবু বিপদের উপর বিপদ দেখিয়া অস্থির হইলেন এবং স্বর্ণকমলের কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া প্রাণে দারুণ ব্যথা পাইলেন। তিন জন লোক গঙ্গাতীরে পাঠাইয়া তিনি সেই দিনই আসাম প্রদেশে রওনা হইলেন। লালচক বাগানে পৌঁছিয়া দীনেশবাবু অবগত হইলেন যে, পূর্ব্বরাত্রে স্বর্ণকমলের মৃত্যু ঘটিয়াছে। তখনও তাহার মৃতদেহ পড়িয়া আছে—সৎকারের যোগাড় হইতেছে মাত্র। স্বর্ণকমলের সেই শবদেহ দেখিয়া দীনেশচন্দ্র কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সুকুমারীর দশা কি হইবে, ভাবিয়া অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন। আর একদিন পূর্ব্বে এখানে পৌঁছিতে পারিলে স্বর্ণকমল অন্ততঃ একজন আত্মীয়ের মুখ দেখিয়া

অপেক্ষাকৃত সুখে মরিতে পারিত, এই চিন্তায়ও তিনি ক্লিষ্ট হইলেন। দীনেশচন্দ্র আকুল প্রাণে মৃত বন্ধুর সৎকার করিলেন।

সাহেব দীনেশবাবুর নিকট অতি দুঃখের সহিত বলিলেন,

'স্বর্ণকমলকে আমি বড় ভালবাসিতাম—এমন কার্য্যদক্ষ, সুবুদ্ধিসম্পন্ন ও সচ্চরিত্র সহকারী আমি আর পাই নাই, কিন্তু কি করিব, তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না।'

দীনেশ। ডাক্তারবাবুর নিকট শুনিয়াছি, আপনি তাহার জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু সমস্তই ভগবানের ইচ্ছা, আপনি কি করিবেন?

সাহেব। স্বর্ণকমল ছুটী চাহিয়াছিল, আমি তাহা দেই নাই, আমি তাহাকে ছুটী দিলে হয়ত দেশের স্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে সে বাচিলেও বাচিতে পারিত। তাহার দুঃখিনী স্ত্রীর নিকট আমি ঋণগ্রস্ত রহিলাম।

বলিয়া সাহেব রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিলেন। চা-কর সাহেবের এরূপ সহৃদয়তা দেখিয়া দীনেশচন্দ্র সেই দুঃখের মধ্যেও একটু সুখী হইলেন, কৃতজ্ঞতায় তাঁহার প্রাণ আপ্লুত হইল। সাহেব বলিলেন,

'স্বর্ণকমল মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে আপনার নিকট সংবাদ পাঠাইতে বলিয়াছিল—আপনিই নাকি তাহার একমাত্র বন্ধু। আপনি তাহার দ্রব্য সামগ্রীগুলি লইয়া যান। আর, স্বর্ণকমল পাঁচ হাজার টাকার জন্য জীবন-বীমা করিয়াছিল—এই সেই কাগজগুলি নিন। আপনি চেষ্টা করিয়া টাকাগুলি আদায় করিয়া দিয়া বিধবার প্রাণ বাচাইবেন।'

দীনেশচন্দ্র চক্ষে রুমাল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সাহেব বলিলেন,

'বৃথা দুঃখ করিবেন না, অনাথা বিধবার কি উপায় হইবে ভাবিয়া আমি অস্থির হইয়াছিলাম, আপনাকে দেখিয়া সে চিন্তা দূর হইল, আপনার ন্যায় অভিভাবক থাকিতে বিধবার কোন কষ্ট হইবে না। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ আছে, আপনাকে তাহা রক্ষা করিতে হইবে। আমি বিধবাকে যৎসামান্য অর্থ সাহায্য করিব—'

সাহেবের কথা শেষ না হইতেই দীনেশচন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন, 'সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না—এই পাঁচ হাজার টাকা আছে, তা ছাড়া, প্রয়োজন হইলে আমরাও যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পারিব।'

সাহেব। তাহা জানি,—আপনি যে একজন সম্ভ্রান্ত জমীদার তাহা আমি জানিয়াছি, কিন্তু বিধবাকে আমি নিজে কিছু না দিলে আমার মনে শান্তি থাকিবে না। আমি পাঁচশত টাকা বেতন পাই, অনুগ্রহ করিয়া এই এক মাসের বেতন লউন, বিধবার হাতে ইহা প্রদান করিবেন।

সাহেব জীবন-বামার কাগজ, পাঁচশত টাকার পাঁচখানি নোট এবং স্বর্ণকমলের দ্রব্য সামগ্রীগুলি দীনেশবাবুকে বুঝাইয়া দিলেন। দীনেশবাবু আর আপত্তি না করিয়া, উহা লইয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন।

দীনেশবাবুর প্রেরিত লোকমুখে তাহার আসাম গমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, জীবন্মৃতা সুকুমারীর প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। পতির অমঙ্গল আশঙ্কা সতীর হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল। 'তাহার কোনরূপ বিপদ ঘটিয়া না থাকিলে, দীনেশদাদা আসাম যাইবেন কেন?' এই প্রশ্ন সুকুমারীর হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ জাগিতেছিল।

কোনরূপ দুর্ঘটনা যে ঘটিয়াছে ইহা সুকুমারী স্থির বুঝিল, কিন্তু ভগবান যে তাহার এইরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, এ কথা হতভাগিনীর মনে একবারও স্থান পাইল না। দীনেশবাবু আসিলেন কিন্তু স্বর্ণকমল তাঁহার সঙ্গে আসে নাই, ইহাতে সুকুমারীর প্রাণ উড়িয়া গেল। যদি স্বর্ণকমল ভাল থাকিবেন, তবে দীনেশদাদা এ কথা কহিতেছেন না কেন? তাঁহার সেই সুন্দর, সহাস্য মুখ আজ বিষন্ন কেন?—নয়ন কোণে অশ্রুরেখা কেন? তাঁহার মূর্ত্তি এত শুষ্ক কেন? মন্দভাগিনী সুকুমারীর হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ এইরূপ কত প্রশ্ন উঠিতে লাগিল. হতভাগিনী বসিয়া পড়িল, তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, পৃথিবী শূন্য বোধ হইতে লাগিল, তাহার চতুষ্পার্শ্বের পদার্থগুলি যেন সুকুমারীকে কেন্দ্র করিয়া দ্রুতবেগে ঘুরিতে লাগিল। দীনেশবাবুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না, সন্দেহের বৃশ্চিক দংশনে তাহাকে পাগলিনী করিয়া তুলিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া স্বামীর মঙ্গল সমাচার জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তখন মঙ্গলা দীনেশবাবুর নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,

'আমাদের বাবু ভাল আছেন ত?'

দীনেশবাবু সে কথার উত্তর না দিয়া চক্ষে হস্ত দিয়া শুইয়া পড়িলেন। সুকুমারী আর সহ্য করিতে না পারিয়া হৃদয়ের সমস্তটকু সাহস একত্র করিয়া বলিল, 'দাদা'। কিন্তু তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, আর বাক্যস্ফুরণ হইল না। দীনেশচন্দ্র বস্ত্র দ্বারা চক্ষু আবৃত করিলেন। নয়নজলে তাঁহার বক্ষঃ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ভয়বিহ্বলা, শোকাতুরা সুকুমারী নূতন অসহ্য শোক বক্ষে লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় বলিল,

'দাদা! সেখানকার সংবাদ কি?'

দীনেশচন্দ্র সেস্থান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া বহির্ব্বাটীর একটা ধূলিপূর্ণ তক্তাপোষের উপর গিয়া বসিয়া পড়িলেন। দীনেশচন্দ্রের নিরুত্তরে সুকুমারী উত্তর বুঝিতে পারিল। তাহার হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গেল, মস্তকে অশনি পতন হইল—অনশনে দুর্ব্বলা, পুত্র-শ্বশ্রূ-শোক-কাতরা, দগ্ধ কপালিনী সুকুমারী সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। সেই দিন হইতে সুকুমারী পাগলিনী হইল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পাগলিনী।

সত্য সত্যই সুকুমারী পাগলিনীর ন্যায় হইল। চারি পাঁচ দিন তাহার মুখে এক বিন্দু জলও পড়িল না। দীনেশচন্দ্রের অনুমত্যনুসারে গিরিবালাও গঙ্গাতীরে আসিলেন। অঙ্গাভরণ পরিত্যক্তা, থান-বস্ত্র-পরিহিতা, শোক-দুঃখ ম্রিয়মাণা সুকুমারীকে দেখিয়া গিরিবালা নিজেই অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল, প্রবোধ বাক্য বলিবেন কাহাকে? এখন সুকুমারীর সেই কান্তি নাই, সেই সৌন্দর্য্য নাই, সেই হাসি নাই, সেই প্রফুল্লতা নাই, সুকুমারীর কথায় সেই মধুরতা নাই, বাক্যে সেই সরলতা নাই, পরের অনুরোধ ও জেদ রক্ষা বিষয়ে সেই আগ্রহাতিশয় বা ত্যাগস্বীকার নাই। সেই কোমলস্বভাবা, স্নিগ্ধনয়না হরিণী, যেন রক্তচক্ষু, উগ্রস্বভাবিনী, ভীষণ তেজস্বিনী সিংহী হইয়া উঠিয়াছে।

দীনেশচন্দ্র কিম্বা গিরিবালা তাহাকে এখন কোন কার্য্য

করিতে জেদ করিলে, সুকুমারী সে অনুরোধ রক্ষা না করিয়া সতেজে বলে,

'কেন করিব?—কাহার জন্য করিব?'

এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু জলপূর্ণ হয়। সুকুমারী কখন একাকিনী বসিয়া কাঁদে, কখন বা হাসে। কখন বা অস্ফুটস্বরে চুপি চুপি, আপনা আপনি কি কথা বলে, কেহ তাহার কিছু বুঝিতে পারে না। গিরিবালা এক দিন বলিল,

'তুমি একা একা অত বক কি?'

সুকুমারী সক্রোধে বলিল, 'যা খুসী।'

গিরি। তুমি ক্ষেপ্‌লে নাকি?

সুকু। 'সে ত ভাল কথা।' বলিয়া সে হাসিল।

গিরি। ছি। একটু স্থির হও।

সুকু। একবারে স্থির হব।

গিরি। তুমি ও সব অলক্ষ্যে কথা বলো না।

সুকু। ভয় কার?

গিরিবালা যুক্তি তর্ক দ্বারা সুকুমারীর মত পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন,

'এ বাড়ীতে আরও লোক রয়েছে—তুমি অমন করে পাগ-লামি করলে যে তাদের অসুবিধা হয়। অন্ততঃ পরের খাতিরেও তোমার একটু স্থির হওয়া উচিত।'

সুকুমারী পূর্ব্ববৎ বিকটস্বরে বলিল, 'চুলয় যাক্।'

গিরিবালা এবার একটু উগ্র হইয়া বলিলেন,

'তুমি এক্‌শবারই ও কথা বলো না—বল্‌ছি।'

পাগলিনী, তেমনি বা তদধিক উগ্র হইয়া, বলিল,

'পাঁচ শ বার বলবো—ভয় কার? যার যা সাধ্যি ছিল, সে তা করেছে। এখন আর আমার কে কি করবে? আমার আছে কি? কেন ভয় করব?'

বলিয়া পাগলিনী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

দীনেশচন্দ্র, গিরিবালা বা মুক্তকেশী কেহই তাহাকে স্থির করিতে পারিলেন না।

এক দিন অপরাহ্নে, সুকুমারী আপনার মস্তকের গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশগুলি কাঁচি দ্বারা, স্বহস্তে, কচ্ কচ্ করিয়া কাটিয়া ফেলিল। গিরিবালা তাহা দেখিয়া বিস্ময় সহকারে বলিলেন,

'এ করলে কি?—এমন সুন্দর চুলগুলি কেটে ফেল্লে?'

সুকুমারী। সুন্দর বলেই ত কাট্‌লুম।

গিরিবালা। কেন?—কাট্‌লে কেন?

সুকুমারী। যার জন্য রেখেছিলুম, তাকে দিব।

এই কথা বলিয়া সুকুমারী চুলগুলি প্রজ্বলিত অনলে ফেলিয়া দিল। দিন দিন সুকুমারী সংসারে বীতরাগ হইতে লাগিল। তাহার এখন কোন বিষয়ে যত্ন নাই, কোন কাজে আশক্তি বা আগ্রহ নাই। যেন এ সংসারে তাহার ভালবাসিবার কিছুই নাই। দিন যাইতে লাগিল, কিন্তু সুকুমারীর মতি পরিবর্ত্তন হইল না। দীনেশ-বাবুর প্রেরিত লোক এ পর্য্যন্ত কোন কাজই করিতে পারে নাই। তাহারা নূতন গৃহ নির্ম্মাণের যোগাড় করিতেছিল, কিন্তু সুকুমারী তাহাতে বাধা দিল। দীনেশবাবু অনেক পীড়াপীড়ি করায় সুকুমারী বলিল,

'আমার গৃহে প্রয়োজন কি? আমি কাহারে লইয়া ঘরে

বাস করিব? যদি একান্তই তুলিতে হয়, তবে একখানা ছোট চালা তুলিয়া দেও - যথেষ্ট হইবে।'

গিরিবালা ও মুক্তকেশী অনেক পীড়াপীড়ি করায়, সুকুমারী পাগলিনীর ন্যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল,

'তবে তোল ঘর—কিন্তু আমি ও ঘরে প্রবেশ করিব না। যে ঘরে শাশুড়ী ঠাকুরাণী পুড়িয়া মরিলেন, যে ঘরে আমার মাখনলাল পুড়িয়া মরিল, সে ঘর সোণার ঘর হইলেও আমি উহাতে প্রবেশ করিব না।'

সুকুমারীকে সান্ত্বনা করিয়া দীনেশচন্দ্র বলিলেন,

'দেখ সুকুমারি। তুমি আমাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভক্তি কর। আমার কথা শোন—গৃহ প্রস্তুত হউক, তুমি বরং ঐ ঘরে না থাকিলে। দালানটী সম্পূর্ণ করিয়া দেওয়া হউক, তুমি উহাতে বাস করিও।'

সুকুমারী কাঁদিয়া বলিল,

'দাদা! আমার ওসবে প্রয়োজন কি? আমার জন্য তোমরা ভাবিও না। কেন, দালানে বৃথা কতগুলি টাকা ফেল্‌বে?'

দীনেশ। এ আমার টাকা নহে—স্বর্ণকমল পাঁচ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছে, তাহা আমার নিকট আছে—তাহা হইতে খরচ চলিবে। আর সাহেব তোমাকে পাঁচ শত টাকা দিয়াছেন।

সুকুমারী ও গিরিবালা এ কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সুকুমারীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও গৃহ নির্ম্মিত হইল। কিন্তু সুকুমারী ইষ্টকালয়ের কাজ কিছুতেই আরম্ভ করিতে দিল না। কিছু দিন গেল দীনেশচন্দ্র নিজ বাড়ী গমনে অধৈর্য্য হইয়া গিরিবালাকে বলিলেন,

'আমাকে দু এক দিনের মধ্যেই বাড়ী যাইতে হইবে। তুমি ববং এখানে আর দু একদিন থাক। সুকুমারী একটু স্থির হইলে, নৌকা পাঠাইয়া দিব।'

গিরিবালা। বেশ কথা!--আমি একা থাকিয়া কি হইবে?

স্বামীর বিশেষ পীড়াপীড়িতে অগত্যা গিরিবালা স্বীকৃতা হইলেন। সেই দিন অপরাহ্ণে দীনেশচন্দ্র সকলের সাক্ষাতে সুকুমারীকে বলিলেন, 'দেখ সুকুমারি! বৃথা দুশ্চিন্তা করিয়া যাতনা ভোগ করিও না—সকলই ভগবানের হাত। তুমি গর্ভবতী, এখন দিন রাত অনাহারে থাকিয়া কাঁদিলে, উদরস্থ সন্তানের অনিষ্ট হইবে। আমাকে আগামী কল্য একবার বাড়ী যাইতে হইবে—বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর একটি কথা আছে স্বর্ণকমল পাঁচহাজার টাকার জন্য জীবন বীমা করিয়াছিলেন, এই সেই রসিদ-খানা লও। টাকাগুলি আমি যোগাড় করাইয়া আনিয়া দিব। আর সাহেব তোমাকে পাঁচ শত টাকা দিয়াছেন।' বলিয়া দীনেশ বাবু রসিদখানা ও পাঁচ শত টাকা সুকুমারীর নিকট দিলেন। পাগলিনীর চক্ষু দুটী বাষ্পপূর্ণ হইল। সে গদ্গদকণ্ঠে বলিল,

'দাদা! টাকা কড়ি কাগজপত্র লইয়া আমি কি করিব? এ সব তোমার কাছে থাকুক।'

দীনেশ। ছি! অমনতর পাগলামী করো না—তোমার টাকা তুমি লইবে না, ত লইবে কে?

সুকু। আমার যদি হয় তবে আমি ইহা দ্বারা যাহা খুসী তাহা করিব।

দীনেশ। তাহা করিবে বৈ কি?—তোমার যা ইচ্ছা, তাই কর।

'বেশ কথা' বলিয়া রুক্ষকেশা, উগ্রমূর্ত্তি পাগলিনী জীবন-বীমা কার্য্যালয়ের সেই পাঁচ হাজার টাকার রসিদখানা হস্তে লইয়া, নিমেষমধ্যে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং দ্রুতবেগে সে স্থান হইতে উঠিয়া গিয়া সেই ছিন্ন কাগজখণ্ড গুলি কুড়াইয়া আগুনে ফেলিয়া দিল। 'যাউক সব, এক পথে' বলিয়া পাগলিনী চক্ষু মুছিল। সকলে অবাক হইয়া রহিল।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

'খোকা কোথা গেল ?'

গিরিবালা ও মুক্তকেশীর উপর সুকুমারীর যত্ন ও পরিচর্য্যার ভারার্পণ করিয়া দীনেশচন্দ্র চন্দনবাগ পৌঁছিলেন। সুকুমারীর পাগলামী আরও বাড়িয়া উঠিল। রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। সমস্ত প্রকৃতি নিস্তব্ধ। কিন্তু এ গভীর নিশীথেও মন্দভাগিনী সুকুমারীর চক্ষে নিদ্রা নাই। বহুদিনের পর আজ একটু তন্দ্রা হইয়াছিল—সে সময় সুকুমারী স্বপ্ন দেখিল যেন, স্বর্ণ কমল মাখনলালকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্বশ্রূঠাকুরাণী একখানি গরদের ধুতি পরিয়া, নিকটে একখানি কুশাসনে বসিয়া, রুদ্রাক্ষের মালা জপিতেছেন। মাখনলাল হাসিয়া হাসিয়া ঠাকুরমার কোলে ঝাঁপ খাইয়া পড়িতে উদ্যত হইতেছে, কিন্তু স্বর্ণকমল তাহাকে কোল হইতে নামিতে না দিয়া রগড় দেখিতেছেন। স্বপ্ন দেখিয়া পাগলিনী শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। চক্ষু মুছিয়া সম্মুখে কিছু দেখিতে না পাইয়া অস্থির হইয়া কাঁদিতে লাগিল—'কেন গেল, কোথা গেল' বলিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। আজ

সুকুমারীর শোকসাগর আবার উথলিয়া উঠিল। বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে, জলপ্রবাহ যেরূপ প্রবলবেগে ছুটিতে থাকে, সুকুমারীর শোক প্রবাহ আজ তেমনি ছুটিল। গভীর নিশীথে পাগলিনীর মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে সকলে জাগ্রত হইল। তাহার ক্রন্দনে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে দেখিয়া সেই দুঃখের মধ্যেও সুকুমারীর একটু লজ্জা বোধ হইল। অমনি পাগলিনী ক্রন্দন থামাইয়া উপাধানে মস্তক রাখিয়া সুপ্তবৎ পড়িয়া রহিল। সকলে মনে করিল, সুকুমারী একটু স্থির হইয়াছে—কিন্তু তখন যদি কেহ তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিত, তবে সে দেখিত যে, দুঃসহনীয় শোকাগ্নিতে তাহার অর্দ্ধদগ্ধ হৃদয় একবারে ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে। গিরিবালা, মুক্তকেশী পুনঃ পুনঃ গভীর রজনীতে এইরূপ ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সুকুমারী কোন উত্তর দিতে পারিল না। আজ সুকুমারীর মরিতে ইচ্ছা হইল। সারা রাত্রি নানারূপ কল্পনা জল্পনা চলিল। অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া সুকুমারী মুক্তকেশীর নিকট গেল। মেজ-বৌ তখন শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াছে মাত্র। কৃষ্ণকমল, সুশীলা, সরলা তখনও নিদ্রা যাইতেছে। পাগলিনী মেজ-বৌর হাত ধরিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিল,

'মেজ দিদি! আজ আমার একটা কথা রাখিতে হইবে।'

সুকুমারীর দুঃখে এখন মুক্তকেশীর হৃদয় কাঁদে। তাহার দুঃখ দূর করিয়া পূর্ব্ব ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য মুক্তকেশী সর্ব্বদাই ব্যস্ত। তাই সে আগ্রহাতিশয় সহকারে বলিল,

'কি কথা ভাই ?'

সুকুমারী। রাখ্‌বে,—বল ?

মুক্তকেশী। তোমার কথা রাখ্‌ব বৈ কি ?

সুকুমারী। তবে একটু দাঁড়াও।

বলিয়া সুকুমারী অন্যত্র যাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে একটী ক্ষুদ্র টিনের বাক্স হাতে করিয়া আনিয়া বলিল,

'আমার এ গহনাগুলি তুমি লও—সুশীলা, সরলাকে এগুলি দিও। ইহাতে আপত্তি করিও না—আমার দিব্বি।'

'সে কি কথা!—ছিঃ' বলিয়া আজ মেজ-বৌ সরিয়া দাঁড়াইল। যে মেজ-বৌ একদিন আপনার বালিকা কন্যা সুশীলার দ্বারা এই গহনার বাক্স জলে ফেলিয়া দেওয়াইয়াছিল, যে মেজ বৌ যে কোন উপায়ে সুকুমারীকে জব্দ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই, আজ সেই মেজ-বৌর হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, আজ তাহার হৃদয় সদ্ভাবে পূর্ণ হইয়াছে, তাই সে আজ বালা, অনন্ত, চিক ইত্যাদি নানারূপ স্বর্ণ নির্ম্মিত, বহুমূল্য গহনাপূর্ণ বাক্সটী নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর পদার্থ মনে করিয়া তাহা গ্রহণ করিল না। মেজ বৌ বলিল,

'ছি! ছোট-বৌ, পাগলামি ক'রো না। ভগবান বিপদে ফেলিয়াছেন, তিনিই উদ্ধার করিবেন। মা কালীর আশীর্ব্বাদে এবার তোমার একটী ছেলে হলে সকল দুঃখ ঘুচে যাবে।'

পাগলিনী সুকুমারী বিরক্তি সহকারে, এবরূপ বিকট স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল,

'আমার দুঃখ ঘুচ্‌বে ?—এ জনমে নয়।' পাগলিনী নীরব হইল—তাহার অন্তরে বিষাদপূর্ণ চিন্তাস্রোত বহিতে লাগিল।

মুক্তকেশী। মা কালী, মা দুর্গা অবশ্যই সদয় হবেন। এখনো ধর্ম্ম আছে—এখনো দিন রাত হয়—

সুকুমারী। মিছে কথা—ধর্ম্ম নেই, নিশ্চয় নেই। তা যদি থাক্‌বে, তবে আমার এমন দশা হতো না!

বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল। মুক্তকেশী চক্ষু মুছাইয়া দিয়া স্নেহের সহিত বলিল,

'আমি তোমার ভগিনী—আমার কথা রাখ, একটু স্থির হও।'

সুকুমারী। আমার কথা রাখিলে, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব, নতুবা তোমার কথা আমি রাখিব কেন ?

মুক্ত। আচ্ছা, তোমার কথা আমি রাখিব—কিন্তু মনে থাকে যেন, আমার কথাও তোমাকে রাখিতে হইবে।—বল, কি কথা ?

সুকু। এই গহনাগুলি তুমি লও—সুশীলা, সরলা বড় হইলে তাদের দিও। আর—আর—একটী কথা———

মুক্তকেশী হাত পাতিয়া গহনার বাক্স লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল,

'আর কি কথা।'

সুকুমারী বাম হস্ত দ্বারা চক্ষু মুছিয়া ধীরে ধীরে বলিল,

'আর একটা কাজ করিতে হইবে। আজ, তুমি একবার ননীগোপালকে আমার নিকট আনিয়া দিবে। বড়-দিদি যেন টের না পায়, তা হলে ত জানই সর্ব্বনাশ হবে। ছেলেটাকে মেরে খুন করে ফেলবে।'

সুকুমারী মুখাবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মেজ-বৌ পুনরপি তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিল। সেই দিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময় মেজ-বৌ ননীগোপালকে আনিয়া সুকুমারীর নিকট দিল। সুকুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে উহাকে কোলে লইয়া বসিয়া রহিল। ননীগোপাল আজ অনেক দিন পর কাকী-মার কোলে

আসিয়াছে। এখন বালক কথা কহিতে পারে। কাকী-মাকে কাঁদিতে দেখিয়া অবোধ বালক জিজ্ঞাসা করিল,

'তুই কাঁদিস কেন, কাকী মা?'

সুকুমারী চক্ষু মুছিয়া বলিল,

'কৈ, না—কাঁদ্‌ব কেন?'

ননী। তুই কাঁদলে আমি তোর কোলে থাক্‌বো না।

'না, আমি কাঁদিব না' বলিয়া সুকুমারী একটু স্থির হইল। আপন হস্তে একটা কচি শশা ছাড়াইয়া তাহা কাটিয়া ননীকে একটু একটু করিয়া খাওয়াইতে লাগিল, তাহার চক্ষের জল গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার হৃদয়ে আজ ভাবের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। ননীগোপালের মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে, মাখনলালের ক্ষুদ্র মুখখানা মনে পড়িল, আর মন্দভাগিনী ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না। অনেক চিন্তার পর মৃত্যুই তাহার শ্রেয়ঃ বোধ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিয়া সুকুমারী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,

'ননীগোপাল।'

ননীগোপাল ঘাড় ফিরাইয়া রোরুদ্যমানা কাকী-মার দিকে চাহিল। সুকুমারী কাঁদিয়া বলিল, 'দেখ ননীগোপাল!'

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। ননীগোপাল বলিল, 'কি, কাকী-মা?'

'তুই লেখা পড়া করিস্।—দুষ্টুমি করিস্ না।—কারুর মন্দ করিস্ না—' বলিতে বলিতে হতভাগিনী গভীর দুঃখের সহিত কাঁদিতে লাগিল। ননীগোপাল তাহার ক্রন্দন দেখিয়া বলিল,

'তুই কাঁদিস্ কেন ?—তোর পেট ব্যথা কচ্ছে ?—বল, কি হয়েছে ?'

অবোধ শিশু এইরূপ নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর পাইল না। অবশেষে ননীগোপাল অপেক্ষাকৃত ব্যগ্রতাসহকারে জিজ্ঞাসা করিল,

'কাকী-মা ! তোর খোকা কৈ ?'

অশ্রুমুখী সুকুমারীও মস্তকে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল,

'আমার খোকা কোথা গেল ?'

চতুস্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

'চিহ্ন ডুবাইব ?—ছি !'

শোকে, দুঃখে, মর্ম্মযাতনায় ও অতীত স্মৃতির বৃশ্চিক দংশনে অধীরা হইয়া, মন্দভাগিনী পাগলিনী উদ্বন্ধনে বা জলনিমজ্জনে প্রাণত্যাগ করিবে স্থির করিল। মৃত্যুর ভীষণ ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে, সুকুমারী মুক্তকেশীর-নিকট গেল। মেজ-বৌ তাহার সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়বিহ্বলা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাকে এরূপ দেখাচ্ছে কেন, বোন ?' পাগলিনী মেজ-বৌর কথার উত্তর না দিয়া ব্যগ্রতাসহকারে ও দৃঢ়তার সহিত বলিল,

'দিদি ! তোমায় আজ আমার শেষ কথা বলিব।'

'শেষ কথা ! ছি ! এমন কথা মুখে আন্‌তে নাই।'

'তবে তোমার নিকট বলা হইল না' এই কথা বলিয়া পাগলিনী সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিল। মুক্তকেশী পাগলিনীর বাক্যের দৃঢ়তা দেখিয়া ভীতা হইল, পশ্চাৎ হইতে সুকুমারীর

বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া তাহাকে থামাইল; তৎপর কাঁদ কাঁদ স্বরে, ধীরে ধীরে বলিল,

'ছোট-বৌ। অত ব্যস্ত হইও না—আমার কথা শোন। কাল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তোমার গহনার বাক্স লইলে তুমি আমার কথা রাখিবে, আর আমার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিবে। তোমার কথা আমি রাখিয়াছি, এখন আমার কথা তোমাকে রাখিতে হইবে। তুমি কখনও মিথ্যা কথা বল না, তাহা জানি। বল, আমার কথা রাখিবে কি না?'

সুকুমারী দ্রুত বলিল, 'কি কথা?'

মুক্তকেশী সুকুমারীর হাত ধরিয়া বলিল, 'রাখিবে—বল?'

সুকুমারী। রাখিব।

মুক্তকেশী। ঠিক?

সুকুমারী। ঠিক বৈ কি?

মুক্তকেশী। তবে, তোমার মনের কথা আমাকে খুলিয়া বলিতে হইবে।

সুকুমারী। মনের কি কথা?—

মুক্তকেশী। বল, তুমি কেন এমন করিতেছ?

সুকুমারী। কৈ—কি করিতেছি?

মুক্তকেশী। খাও না, দাও না। রাত্রে ঘুমাও না। রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা অনাহারে থেকে, আধপেটা খেয়ে, ভেবে ভেবে সারা হ'লে। একবার চেয়ে দেখ দেখি, কি শরীর কি হয়ে গ্যাছে। সাহেব যে টাকাগুলি দিয়েছিল, সবগুলি বিলিয়ে দিলে, পাঁচ হাজার টাকার দলিলখানা আগুনে পুড়িয়ে ফেল্লে। ছি! এমন কর, কেন বোন?

আমরা একটী কথা বলি নাই। সুকুমারী সাহেব প্রদত্ত সেই পাঁচ শত টাকা সমস্তই গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের অনাথ ও পিতৃ মাতৃ-হীন বালক, বালিকাগণকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিল। সুকুমারী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রুক্ষ স্বরে বলিল,

'সব যাউক—এই শরীর, টাকা পয়সায় আর আমার দরকার কি ? আমার খেলা সাঙ্গ হয়ে গ্যাছে।'

মেজ-বৌ নিজের দুই হস্ত দ্বারা সুকুমারীর দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল,

'তোমার হাত ধরিয়া বলিতেছি, আমার অনুরোধ রাখ—তুমি কেন এমন করিতেছ, আমাকে খুলিয়া বল, আমি ত আর এখন তোমার শত্রু নই।'

পাগলিনী উত্তর প্রদান করিল না। তাহার চক্ষু দুটি ছল ছল করিতে লাগিল। মেজ-বৌ আপন চক্ষু মুছিয়া অতি কাতর স্বরে বলিল, 'আমাকে বিশ্বাস করিয়া কোন কথা বলিবে না, বোধ হয়। বলিবে কেন ?—আমি যে তোমার কত অনিষ্ট করিয়াছি। আমি তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি। কুলোকের মন্ত্রণা শুনিয়া কত গালাগালি করিয়াছি।' বলিয়া মেজ-বৌ কাঁদিতে লাগিল। 'মাকে কত দুর্ব্বাক্য বলিয়াছি। আমরাই ত তোমার সর্ব্বনাশের মূল। আমরা যদি ভাল হইতাম, তবে হয়ত ঠাকুর পো বিদেশে যাইতেন না, এ সর্ব্বনাশও হইত না। এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত করিব, ভাই ?'

মুক্তকেশী ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহার গণ্ড বাহিয়া দর দর করিয়া অশ্রুপ্রবাহ ছুটিতে লাগিল। পূর্ব্ব কথা মনে করিয়া অনুতাপানলে তাহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতে

লাগিল। সুকুমারীও কাঁদিয়া ফেলিল। মুক্তকেশীর মুখ মুছাইয়া দিয়া পাগলিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,

'ছি! কেঁদ না, তোমার দোষ কি দিদি! যেমন অদৃষ্ট লইয়া আসিযাছি, তেমন হইবে বৈ কি?—আব কি বলিলে—'তোমায় বিশ্বাস কবিব না।' তুমি আমাব কত উপকাব কবিযাছ, আমি কি তাহা ভুলিযা গিয়াছি? যে দিন বাড়ী ঘব যথাসর্ব্বস্ব পুড়িয়া গেল, সে দিন তোমবাই ত আমাদেব বাচাইলে। তোমাদেব ঘবেই ত আমাদেব মাথা রাখিবাবস্থান হইয়াছিল। তোমাব ঘবেই ত আমাব সোণার চাঁদ আব মা শেষ শোযা শুযে গেল।'

সুকুমাবী আব কথা বলিতে পাবিল না। উভয়ে কাঁদিতে লাগিল। নিকটে সান্ত্বনা বাক্য বলিবার লোক ছিল না। সুতবাং উভযে অনেকক্ষণ কাঁদিল, তাব পব সুকুমাবী পাগলিনীব ন্যায় কর্কশ স্ববে বলিল,

'তোমাকে বিশ্বাস কবিব না, ত করিব কাহাকে? আমাব মাযের পেটেব বোন্ ছিল না—গৃহদাহেব দিন হইতে আমি ভগিনী পাইযাছি।—তোমাকে বিশ্বাস কবিব না?'

মুক্তকেশীব হৃদয আজ শোক ও অনুতাপপূর্ণ। সুকুমাবীর কথা শুনিয়া তাহা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল! সে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখেব সহিত কাঁদিতে লাগিল, সুকুমাবী আপন চক্ষু মুছিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নস্ববে বলিল,

'আমাব মনেব কথা শুনিতে চাও? তবে শোন, কিন্তু কাহাকেও বলিতে পারিবে না।—গিবিকেও না।'

মুক্তকেশী অশ্রুপূর্ণ নযনে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সুকুমারীর দিকে চাহিল। সুকুমারী গদ্গদ স্ববে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল,

'দিদি ! দিদি ! আমার মনের কথা শুনিবে ?—মনের কথা—মনের কথা কি আর মাথা মুণ্ড, আমি অনেক সহিয়াছি, আর সহিতে পারি না—যাতনায় আমার প্রাণ বের হয়ে যায়—আর পারি না। তাই স্থির করিয়াছি, দিদি ! আমি কাহারো কথা শুনিব না, কাহারো বারণ মানিব না—আমি আজই আত্মহত্যা করিব। নিশ্চয়—আজই, মানুষে আর কত সহিতে পারে, দিদি ?'

সুকুমারী নির্ব্বাক হইল। মেজ-বৌ তাহার কথা শুনিয়া একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। সেও কাঁদিয়া কাঁদিয়া সুকুমারীর দুই হাত ধরিয়া বলিল,

'বোন্—এমন কথা মুখে আনিও না। যিনি বিপদে ফেলিয়াছেন, তিনিই উদ্ধার করিবেন। আর যদি বোন্, তুমি আমার কথা না শোন, তবে জেন, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও নিশ্চয় গলায় দড়ি দিয়া মরিব—ইহা আমার প্রতিজ্ঞা।'

সুকুমারী। ছি ! দিদি, তোমার দুঃখ কিসের ?

মুক্তকেশী। তুমি আমাদের মায়া ত্যাগ করিলে, আমার জীবনে প্রয়োজন নাই, বোন্ ! আমার সুশীলা, সরলা কি তোমার মেয়ে নয় ? দু'জনকে তোমায় দিলাম, তুমি ওদের মা—ওদের ফেলে তুমি কোথায় যাবে ? ওদের জন্য কি তোমার দুঃখ হবে না ?

সুকুমারী। ওদের দেখিলে, আমি পাগলিনী হই—তাই ত মরিতে চাই ; তবু দিদি তুমি ওদের আমার কাছে আস্‌তে দেও, কিন্তু বড-দিদি যদি ননীকে আমায় একটু কোলে লইতে দিত, তবে আমার এত দুঃখ থাকিত না।

এমন সময় সরলা মায়ের কাছে আসিল, মায়ের ক্রন্দন দেখিয়া

সেও কাঁদিতে লাগিল। মুক্তকেশী তাহাকে সুকুমারীর কোলে বসাইয়া দিয়া কাঁদিয়া বলিল,

'আমার সরলাকে তোমায় দিলাম, এখন তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহা কর।'

বলিয়া মুক্তকেশী চক্ষু মুছিয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত হইল। সুকুমারী রোরুদ্যমানা বালিকার মুখ মুছাইয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মুখ চুম্বন করিল, অমনি তাহার হৃদয় স্নেহে আপ্লুত হইল—চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, পূর্ব্ব সঙ্কল্প টল টল করিতে লাগিল। মুক্তকেশী বুদ্ধি স্থির করিয়া বলিল,

'আর, বোন! তুমি যে অন্তঃসত্ত্বা, তাহা কি তোমার মনে নাই? তুমি আত্মহত্যা করিলে নারীবধ ও শিশুবধের পাপ হইবে। তোমার পেটে ঠাকুরপোর শেষ চিহ্ন আছে—তাহা কি তুমি লোপ করিবে?'

বলিয়া মুক্তকেশী আবার কাঁদিতে লাগিল। তাহার শেষ কথায় সুকুমারীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সুকুমারী ভাবিল,

'স্বামীর 'শেষ চিহ্ন' লোপ করিব?—আমার কষ্ট হয় বলিয়া স্বামীর 'চিহ্ন' ডুবাইব?—ছি! আমি কি পাগল হইয়াছি? মরিতে হয়, আর দু'দিন বাদে মরিব—এখন মরা হইল না। প্রসবের পর, স্বামীর সন্তান মুক্তকেশী বা গিরিবালার হাতে সঁপিয়া দিয়া আত্মহত্যা করিব—পূর্ব্বে মরা হইবে না।'

স্বামীর 'শেষ চিহ্ন' দেখিবার জন্য সুকুমারী ব্যাকুলা হইল। আপাততঃ সে মৃত্যু সঙ্কল্প ত্যাগ করিল।

পঞ্চত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

রামকমলের কথা।

আমরা অনেকক্ষণ রামকমল, মহামায়া ও তাহাদের পুত্র কন্যাগণের সংবাদ লইতে পারি নাই। রামকমল দিন দিনই বেশ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিতেছে। এদিকে দেশে রাষ্ট্র হইয়াছে যে, নিষ্ঠুর রামকমল ভ্রাতৃগণকে প্রবঞ্চনা করিয়া, সমস্ত পৈতৃক ধন সম্পত্তি, বিষয়াদি হস্তগত করিয়া, নগদ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। অধমর্ণগণ প্রতি দিনই দলে দলে রামকমলের নিকট টাকা ধার করিতে আসিতে লাগিল। রামকমলও মানুষ বুঝিয়া টাকা দিতে লাগিল। এ সব দেখিয়া মহামায়ার হৃদয়খানা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। রামকমল সকল খতেই চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ লিখাইয়া লইত এবং ছলে, বলে, কৌশলে, যেরূপেই হউক, তাহা আদায় না করিয়া ছাড়িত না। এইরূপে তাহার বেশ দু পয়সা প্রাপ্তি হইতে লাগিল, কিন্তু ধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার শক্রও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রামকমল দরিদ্র কৃষকের নিকট হইতে মাসিক শতকরা পাঁচ টাকা, ছয় টাকা হারে চক্রবৃদ্ধি সুদ আদায় করিত, কখনও কাহাকে একটী পয়সাও মাপ করিত না। কড়ার মত টাকা দিতে না পারিলে, মোকদ্দমা করিয়া ডিক্রী করিত এবং কাহার থালা, ঘটী, বাটী, কাহার গরু বাছুর, কাহার লেপ কাঁথা, কাহার বা ঘর দরজা বিক্রী করিয়া টাকা আদায় করিত। মামুদ বেপারী নামক একজন নিরীহ কৃষক রামকমলের নিকট হইতে পঁচিশ টাকা ধার নিয়াছিল। মামুদ ঐ টাকার

সুদ স্বরূপ রামকমলকে নানা তারিখে সত্তর টাকা প্রদান করিয়াছে, তবুও সে ঋণমুক্ত হইতে পারে নাই। রামকমল প্রাপ্ত টাকা সমস্ত বাদ না দিয়াই মামুদের নামে নালিশ উপস্থিত করিয়া মামুদের বিরুদ্ধে ত্রিপান্ন টাকা ডিক্রী করিল। মামুদ শুনিয়া একবারে অবাক হইয়া বসিয়া পড়িল, তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। কত অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু নির্ম্মম রামকমল কোন কথায়ই কাণ দিল না। গত্যন্তর না দেখিয়া, মামুদ স্ত্রীপুত্রের গহনা বিক্রয় করিয়া ত্রিশ টাকা সংগ্রহ করিল এবং তাহা রামকমলের হস্তে দিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'আজ ত্রিশ টাকা দিলাম, যদি আপনি একান্তই মাপ না করেন, তবে বাকি তেইশ টাকা ক্ষেতের ধান বিক্রী করিয়া দিব। আপনার পায় পড়ি, আমায় এক মাস সময় দিন।' রামকমল টাকা গ্রহণ করিল, কোন কথা বলিল না। প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে মনে করিয়া, মামুদ একটু স্থির হইয়া গৃহে গেল। কিন্তু পর দিন প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিল, তাহার বাড়ীর আঙ্গিনায় আদালতের একজন প্যাদা এবং রামকলের পক্ষের চারি পাঁচ জন লোক বসিয়া রহিয়াছে। মামুদের প্রাণ উড়িয়া গেল। প্যাদা রুক্ষ স্বরে বলিল,

'ত্রিপান্ন টাকা দিতে পার ত দেও, নহিলে তোমার যাহা কিছু আছে, এখনি নীলামে বিক্রী হইবে।'

মামুদ ভীত হইয়া বলিল,

'ত্রিপান্ন টাকা!—বল কি? কাল যে আমি ত্রিশ টাকা দিয়া এক মাসের সময় লইয়া আসিয়াছি। সময় না পাই না পাইব, এই ত্রিশ টাকাও কি উস্থল পাইব না?'

হৃদয়শূন্য রামকমল ইচ্ছা করিয়াই প্যাদা বা তাহার প্রেরিত লোকের নিকট টাকা প্রাপ্তির কথা বলিয়া দেয় নাই। সুতরাং মামুদের কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না; তাহার গরু বাছুর, থাল, ঘটী, বাসন, যাহা কিছু ছিল, সমস্ত প্রকাশ্য নীলামে বিক্রী হইয়া গেল। মামুদ সে দিন সপরিবারে উপবাসী রহিল।

রামকমল এইরূপে অসংখ্য লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। রামকমলের চক্রে পড়িয়া, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অসংখ্য লোক তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। সকলেই প্রতিহিংসার জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিল।

মহামায়া পতির ধনবৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু এখনও বাড়ীখানা ষোল আনা দখল রাখিতে পারিল না, সুকুমারীকে তাড়াইতে পারিল না বলিয়া তাহার শান্তিসুখে কিছু বিঘ্ন হইতে লাগিল। সুকুমারীর জন্য স্বর্ণকমল পাঁচ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছে, শুনিতে পাইয়া, মহামায়া একবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া স্বামীর নিকট গিয়া বলিল,

'আপদ যে শেষ হয়েও হয় না! শুন্‌তে পাচ্ছ—ছোট-বৌর জন্য নাকি পাঁচ হাজার টাকা রেখে গ্যাছে। ওর যদি খাবার সংস্থান থাকে, তবে যে ওর দেমাকে এ বাড়ীতে থাকা দায় হবে। এর যা হয়, একটা কিছু কর।'

'চিন্তা কি?—সব হবে।'

বলিয়া রামকমল মহামায়াকে আশ্বস্থ করিল এবং সুকুমারীর প্রতি তাহার শেষ কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিল।

রামকমলের জ্যেষ্ঠপুত্র নন্দগোপাল এখন পাঠশালায় যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শৈশবের মাতৃদত্ত কুশিক্ষাক্রমে তাহার চৌর্য্যবৃত্তি দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নন্দগোপাল

প্রতিদিন পাঠশালা হইতে সমপাঠিগণের কাগজ, কলম, পেনশিল, ছুরী, জলখাবার পয়সা ইত্যাদি চুরি করিয়া আনিয়া মাযের কাছে দেয়। মহামাযা এজন্য একদিনও পুত্রকে তিরস্কার বা প্রহার করে নাই, বরং পুত্রের দ্বারা কিছু কিছু লভ হইতেছে দেখিযা তাহাকে উৎসাহ দিয়া আসিতেছে। ক্রমে নন্দগোপালের সাহস বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ক্রমেই সে মাত্রা বাডাইতে লাগিল। নন্দগোপাল চুরির এরূপ কৌশল শিক্ষা করিযাছিল যে, অনেক দিন পর্য্যন্ত গুরুমহাশয বা ছাত্রগণ কে চুরি করিতেছে, চেষ্টা করিযাও তাহা স্থির বুঝিতে পারে নাই। শিক্ষক মহাশয অনু-মানে দুই তিনটী দরিদ্র বালককে বিনা দোষে প্রহারও করিযাছেন, নন্দগোপাল সম্পন্নলোকের পুত্র বলিযা কেহই তাহাকে সন্দেহ করে নাই। ক্রমে কিন্তু নন্দগোপালের উপরই সকলের সন্দেহ পড়িল। তাহার নিকট পাঠশালার কোন ছাত্র বসিতে চাহে না। পাঠশালা ছুটীর পর সকল ছাত্র সমস্বরে 'চোর গোপাল' 'চোর গোপাল' বলিযা নন্দগোপালকে ক্ষেপাইতে আরম্ভ করিল, গুরুমহা-শয দুই তিন দিন নন্দগোপালকে তিরস্কার ও প্রহার করিলেন, কিন্তু সেই চোরবালক কিছুতেই অপরাধ স্বীকার করিল না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢতার সহিত চুরি অস্বীকার করিয়া পরের স্কন্ধে দোষ চাপাইতে লাগিল। ক্রমে রামকমল ও মহামাযার কর্ণে এ সব কথা পৌছিল। রামকমল পুত্রের প্রকৃতি অবগত ছিল, কিন্তু সম্মানের খাতিরে সে একদিন গুরুমহাশযকে বলিল,

'মহাশয়। নন্দগোপালকে আর অমন করে কেউ চোর টোর বল্‌বেন না—আজ সাবধান করে দিলুম, ভদ্রলোকের ছেলেকে চোর বলা, বড় সহজ অপরাধ নহে।'

গুরুমহাশয ভীত হইয়া ছাত্রগণকে সাবধান করিয়া দিলেন, সে অবধি নিজেও আব নন্দগোপালকে কোন কথাটী কহিতেন না। রামকমল পুত্রকে কিন্তু একটী কথাও বলিলেন না। মহামায়া নন্দগোপালকে বলিল,

'তোকে যখন ছোটলোক ব্যাটাবা চোব চোব বলে, তুই ওদের না পাস্, বেশ কবে চুবি কবে এনে আক্কেল দিস।'

নন্দগোপাল গৃহে উৎসাহ পাইল, পাঠশালাযও তাহাকে ভযে কেহ কোন কথা বলে না। সুতবাং তাহাব বেশ সুযোগ ঘটিল—সাহসও বৃদ্ধি হইল। একদিন পাঠশালা ছুটীব পব বাড়ী আসিযা সে পাড়ায় খেলা কবিতে গেল, নিকটবর্ত্তী ঘোষদেব বাড়ীব একটী শিশুবহস্তে স্বর্ণবলয় দেখিযা তাহাব লোভ হইল। সে শিশুকে একটী পেয়াবা দিযা ভুলাইয়া, তাহাব হাতেব বাল খুলিয়া তাহা লইযা ছুটিযা গৃহে গেল এবং নবলক্ষীব নিকট ব্যস্ততা সহকাবে বলিল,

'দেখ্ দিদি। কি এনেছি!'

কাপড়েব অভ্যন্তব হইতে স্বর্ণবলয় দুগাছি বাহিব কবিযা উহা নবলক্ষীব হস্তে দিযা সে বলিল,

'এ সোণাব তৈযাবী। বিক্রী কবে ঢের পযসা হবে, জানিস্! সে পযসা দিয়ে তোতে আব আমাতে সন্দেশ কিনে খাব, খেল্না কিন্‌ব, বাঁশী কিন্‌ব। তোর কাছে এখন বেখে দে। দেখিস্, মাকে যেন বলিস্ না—বল্লে সে নিয়ে যাবে—আমাদেব সন্দেশ খাওয়া হবে না, জান্‌লি?'

নবলক্ষী প্রীতপ্রফুল্ল মুখে বলিল, 'তা, বল্‌ব কেন?'

একটি মৃণ্ময হাড়িব মধ্যে স্বর্ণবলয় দুটি লুকাইয়া বাখিয়া, নবলক্ষী হাসিতে হাসিতে বাহিবে গেল।

ষট্‌ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

ধরা পড়িল।

সুকুমারীর বিপদের উপর বিপদ দেখিয়া, নির্দ্দয়, নির্ম্মম রামকমলের কঠিন হৃদয়েও একটু দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য মাত্র। যে মুহূর্ত্তে সে শুনিতে পাইল যে, স্বর্ণকমল স্ত্রীর জন্য পাঁচ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে রামকমল পুনরায় পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিল। রামকমল যে জাল উইল প্রস্তুত করিয়া নিজে পৈতৃক ভূসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াছে, পাঠক পাঠিকাগণের বোধ হয় তাহা স্মরণ আছে। সেই উইলখানা বলবৎ করিবার জন্য এখন তাহার প্রবল ইচ্ছা হইল। স্বর্ণকমল মরিয়া গিয়াছে, তাহার একমাত্র পুত্রও ইতিপূর্ব্বেই মরিয়া গিয়াছে। সুকুমারী ত পাগলিনী। কৃষ্ণকমল এখন পূর্ব্ববৎ রামকমলের আজ্ঞাবহ না থাকিলেও তাহাকে বাধ্য করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে না। রামকমল এইরূপ চিন্তায় উৎসাহিত হইল। সুকুমারী যে গর্ভবতী, তাহা সে জানিতে পারিয়াছে। তাহার গর্ভে একটি পুত্র হইলে, হয়ত গ্রামের লোক তাহার পক্ষাবলম্বন করিবে। সে সময় উইলের মোকদ্দমায় কৃতকার্য্য হওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইবে। এজন্য আর বিলম্ব না করিয়া, উইলখানার একটা কূলকিনারা করা সে কর্ত্তব্য মনে করিল। উকীল, মোক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া রামকমল একজন প্রজার নামে বাকি খাজানা আদায়ের জন্য নালিস করিল, প্রজা দেনা স্বীকার করিল বটে, কিন্তু বলিল যে, খাজানার টাকা একাকী রামকমল পাইবেন না—তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণকমল এবং সর্ব্ব-

কনিষ্ঠ স্বর্ণকমলের বিধবা পত্নীও ইহার অংশ পাইবেন। রামকমল বলিল যে, '১২৭০ সনের ৯ই ভাদ্র তারিখের পিতৃকৃত উইলের মর্ম্মানুসারে তিনি পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তির একমাত্র মালিক।' তাহার কথার পোষকতার জন্য, রামকমল 'মা দুর্গার' নামে মহিষ মানস করিয়া, সেই কৃত্রিম উইলখানা আদালতে দাখিল করিয়া দিল। দেশে কৃত্রিম উইলের বিবরণ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে এ কথা দীনেশবাবুর কাণে গেল। দীনেশবাবু তখন নিজ জমিদারীর কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন; কিন্তু বন্ধুপত্নীর স্বার্থলোপ ভয়ে এবং দুষ্টবুদ্ধি রামকমলকে শিক্ষা দিবার জন্য, কালবিলম্ব না করিয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন এবং উইলের কৃত্রিমতা প্রমাণ করিবার জন্য তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যস্ত হইলেন। রামকমল ভীত হইল।

এদিকে রামকমল নিজ দুর্ব্ব্যবহার দ্বারা গ্রামের সকল লোককে শত্রু করিয়াছে। কেহ তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। বিশেষতঃ তাহার অত্যাচারে পীড়িত হইয়া যে স্বর্ণকমল বিদেশী হইয়া, বিদেশে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার পাপচক্রান্তেই যে মাখনলাল ও বৃদ্ধাজননী পুড়িয়া মরিয়াছে, এ কথা জানিতে কাহারও বাকী ছিল না। ইহার পর, অত্যাচারী রামকমল আবার কৃত্রিম উইল প্রস্তুত করিয়া কৃষ্ণকমলকে এবং স্বর্ণকমলের অনাথা ভার্য্যাকে প্রবঞ্চনা করিবার যোগাড় করিতেছে, শুনিয়া সকলেই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। হাটে, ঘাটে, মাঠে, পথে, নিমন্ত্রণ বাড়ীতে—সর্ব্বত্র রামকমলের কথা উঠিতে লাগিল—সকলেই, প্রায় প্রকাশ্যভাবে, রামকমলকে প্রবঞ্চক, স্বার্থপর, নিষ্ঠুরহৃদয়, অবিবেচক, ভ্রাতৃ-হন্তা, মাতৃ-ঘাতক, ভ্রাতষ্পুত্রহন্তা, জালিয়াৎ ইত্যাদি বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। কেহ কেহ অভিসম্পাত

করিতেও ছাড়িল না। এতদিন তাহার কুব্যবহার ও অত্যাচারে যাহারা মুখব্যাদন করে নাই, আজ তাহারা তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যের সমালোচনা করিতে লাগিল, প্রত্যেক কার্য্যে তাহার জঘন্যতা ও দোষ বাহির করিতে লাগিল, সমস্ত পল্লী আজ তীব্র সমালোচক ও স্পষ্টবাদী হইয়া উঠিল। কেহ কেহ বলিল,

'দীনেশবাবু যখন রামকমলের পাছে লাগিয়াছেন, তখন এবার নিশ্চয়ই তাহার শিক্ষা হইবে। দীনেশবাবু বড় জমীদার, তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করা রামকমলের কাজ নহে।'

রামকমলের পক্ষে উইল প্রমাণ করিবার জন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী উপস্থিত হইল না, উইলখানা জাল সাব্যস্ত হইল। পাঠক পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ৺ কালীকান্ত রায় উদ্ধবচন্দ্র পাল নামক একজন মহাজনের গণেশপুরের গদীতে কার্য্য করিতেন। মহাজন একজন দায়ীকের বিরুদ্ধে তিন হাজার টাকা দাবিতে একটি মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। ১২৭০ সনের ৯ই ভাদ্র তারিখে ৺ কালীকান্ত রায় ঐ মোকদ্দমায় জেলায় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। জেলা গঙ্গাতীর হইতে দেড় দিনের পথ। উদ্ধবচন্দ্র পাল এইরূপ সাক্ষ্য দিলেন। ৯ই ভাদ্র তারিখে গঙ্গাতীর হইতে উইল লিখিয়া জেলায় যাইয়া সাক্ষ্য দেওয়া অসম্ভব—জেলায় সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গঙ্গাতীরে গিয়া উইল লিখাও তেমনি অসম্ভব। সুতরাং হয় উইল কৃত্রিম, নতুবা উদ্ধবচন্দ্র পালের সাক্ষ্য মিথ্যা। বিচারক উক্ত মোকদ্দমার নথি তলপ দিয়া আনিয়া দেখিলেন যে, ৺ কালীকান্ত সত্য সত্যই ১২৭০ সনের ৯ই ভাদ্র তারিখে জেলায় সাক্ষ্য দিয়াছে। তাহার জবানবন্দী এখনও নথিতে আছে। বিচা-

রক রামকমলের উপর অতিশয় চটিয়া গেলেন, রামকমল একা খাজনা পাইবার অধিকারী নহে বলিয়া তাহার দাবি ডিস্‌মিস্ করিলেন এবং জাল উইল প্রস্তুত করিয়াছে বলিয়া এক দীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়া রামকমলকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিলেন।

সপ্তত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

রামকমল কারাবাসে।

রামকমল ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হইয়াছে শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইল। সে অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, অনেকের ভিটায় ঘুঘু চরাইয়াছে, অনেক দরিদ্র ব্যক্তিকে পাঁচ টাকা ধার দিয়া পঞ্চাশ টাকা সুদ আদায় করিয়াও মূল টাকার জন্য তাহার বাড়ী ঘর নীলাম করাইয়াছে, অনেকের নামে মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া জ্বালাতন করিয়াছে। তাই আজ তাহার বিপদে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। প্রতিহিংসার জন্য কত লোকের প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। মামুদ বেপারী প্রথম সুযোগেই রামকমল ও তাহার স্ত্রীকে, যেমন করিয়া হউক, এক দিন সাধ মিটাইয়া প্রহার করিবে, স্থির করিয়াছিল। আজ এ সংবাদ শুনিয়া সে একটু আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু স্বহস্তে প্রহার করিবার সঙ্কল্প একবারে ত্যাগ করিতে পারিল না। গঙ্গাতীর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের এক ব্যক্তিও রামকমলের এ বিপদে সমানুভূতি প্রকাশ করিল না, বরং সকলেই তাহার অমঙ্গল কামনা করিতে লাগিল, কেহ বলিল, 'পাপ কত কাল গোপন থাকে?—ভগবান আর কত সহিবেন?' কেহ বলিল, 'ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। দেখ

দেখি—পিতার নাম জাল করিল, মোহর জাল করিল, লেখা অবিকল জাল করিল। সব ঠিক—কোনরূপ একটু কিছু খুঁত নাই, কিন্তু কেবল ঐ এক তারিখের গোলমালে ধরা পড়িয়া গেল।—ভগবানের লীলা বুঝা ভার!' কেহ বলিল, 'ধর্ম্ম কি নেই? এবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। সে দিন আমি মহকুমায় গিয়েছিলুম, সেখানকার একজন বড়লোক আমায় বল্লে যে, এবার রামকমলের পঁচিশ বছর জেল হবে।—যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল। নরহন্তা, মাতৃ-ঘাতক, আপনার গর্ভধারিণী-মাকে দগ্ধে মেরেছে!! সেই বৃদ্ধার অভিসম্পাতের ফল এত দিনে ফলিতে আরম্ভ করিল। এরূপ সর্ব্বনেশে লোকের শাস্তি না হলে যে দেশ রসাতলে যাবে!'

মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটীবাবু রামকমলকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিলেন। সুকুমারী যখন শুনিতে পাইল যে, এবার রামকমলের কারাবাস হইবে, তখন সে একটু চিন্তিত হইল। রামকমলের প্রতি তাহার ভক্তি বা শ্রদ্ধা না থাকিলেও ননীগোপাল ও মহামায়ার দুঃখে সে দুঃখিত হইল। সুকুমারী দুঃখের যাতনা ভুগিয়াছে, তাই অতি বড় শত্রুর দুঃখ দেখিলেও তাহার সরল-হৃদয় দয়ায় অভিভূত হয়। তাই সুকুমারী ব্যস্ত হইল এবং ইহার প্রতিকার চেষ্টা করিবে স্থির করিল। কিন্তু দীনেশবাবু সুকুমারীর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন,

'এ সব নরঘাতক, নরপিশাচের শাস্তি না হইলে যে দেশ অশান্তিময় হইবে।—এবার আমি যেমন করিয়া পারি, উহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে চেষ্টা করিব। তুমি এ সবকিছু বুঝিতে পার না, সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন অনুরোধ করিও না।'

দীনেশবাবুর দৃঢ়তা দেখিয়া সুকুমারী টলিল না। রামকমলকে রক্ষা করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে বলিল,

'দাদা! আমার এই অনুরোধ তোমায় রাখিতেই হইবে। তিনি যাহাতে এ যাত্রা রক্ষা পান, সে চেষ্টা তোমাকে করিতেই হইবে। তাঁহার জেল হইলে, ননীগোপাল, নন্দগোপালের কি দশা হইবে বল দেখি! একজন দোষীর সঙ্গে সঙ্গে যে তিন চারি জন নির্দ্দোষী মারা পড়িবে।'

সুকুমারীর বিশেষ অনুরোধে দীনেশবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও মোকদ্দমাটি আপোষে নিষ্পত্তি করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহকুমার ডেপুটীবাবু রামকমলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। কাজেই মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। সুকুমারী এ সংবাদ শ্রবণে মর্ম্মাহত হইল।

রামকমল অনেক লোককে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছে, কিন্তু নিজে কখনও তেমন বিপদ্‌গ্রস্ত হয় নাই। সুতরাং বিপদে পড়িলে মানুষের যে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা সে ইতিপূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই। ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হওয়া অবধি সে তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিল। এখন আর তাহার পক্ষে কেহ একটী কথা বলে না, কেহ তাহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় না, এমন কি যাহারা পূর্ব্বে রামকমলের সাক্ষাতে মধুর কথা বলিয়া তাহার প্রশংসা করিয়াছে, বরাবর তাহার পক্ষে থাকিবে বলিয়া আশা দিয়াছে, তাহারাও এখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে লাগিল। রামকমলের চক্ষুস্থির হইল, ইতিকর্ত্তব্যতা লোপ হইয়া আসিতে লাগিল, সে আজ চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কারাবাস যন্ত্রণা ভুগিবার আশঙ্কায় তাহার প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। মহামায়ার

মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, গর্ব্ব কমিয়া আসিল, প্রখর বাক্যবাণের ধার কমিয়া আসিল। সে এক দিন কাঁদিয়া স্বামীকে বলিল, 'যত টাকা লাগে লাগুক, তুমি এবার যাহাতে রক্ষা পাইতে পার, তাহা কর।' রামকমল উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অজস্র টাকা ব্যয় করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার হস্তে অধিক টাকা ছিল না। চুরি, জুয়াচুরি, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা দ্বারা সে যাহা সংগ্রহ করিয়াছিল, সুদের আশায় তাহা পরের হস্তে অর্পণ করিয়াছে। নিজ প্রয়োজনের সময় সে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও টাকা আদায় করিতে পারিল না। সুতরাং অর্থাভাবেও তাহার কিছু কষ্ট হইতে লাগিল। রামকমল ধনবান বলিয়া খ্যাত, সুতরাং পরের নিকট সহসা টাকা ধার চাহিতেও তাহার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। রামকমলের দীর্ঘকাল কারাবাস ভোগ করিতে হইবে আশঙ্কায়, কেহ তাহাকে টাকা দিতেও স্বীকৃত হইল না। এদিকে রামকমল অবস্থাপন্ন লোক বুঝিতে পারিয়া, উকীল, মোক্তার, তদ্বিরকারক, সাক্ষী প্রভৃতি সকলেই রামকমলকে শোষণ করিয়া টাকা আদায় করিতে লাগিল। অনন্যোপায় হইয়া রামকমল অনেক পীড়াপীড়ি করায়, মহামায়া অতি অনিচ্ছাসত্ত্বে তাহার গহনাগুলি কাঁদিতে কাঁদিতে রামকমলের হস্তে দিল। তাহা বিক্রয় করিয়া কয়েকদিন খরচ চলিল মাত্র। অগত্যা রামকমল কূলবিচার না দেখিয়া, নিজ খানাবাড়ী, ইষ্টকালয় ও সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া আরও তিন হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিল।

জেলার জজ উড্ সাহেবের এজলাসে রামকমলের মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। রামকমল বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কৃত্রিম উই-

লের সাক্ষীগণকে বাধ্য করিয়া জেলায় লইয়া গেল। প্রধান প্রধান তিন জন উকীল নিযুক্ত করিল। বিপক্ষে গবর্ণমেণ্টের উকীল ছিলেন, দীনেশবাবু সুকুমারীর অজ্ঞাতে নিজ ব্যয়ে আরও তিন জন উকীল নিযুক্ত করিলেন। 'দুষ্টের দমন'—নীতি অবলম্বন করিয়া দীনেশচন্দ্র এই মোকদ্দমাটী অতি যত্ন-সহকারে চালাইতে আরম্ভ করিলেন। রামকমলের পক্ষে মোক-দ্দমা ভাল চলিল না। তাহার প্রধান সাক্ষী তাহার শ্যালক রাইমোহন। রাইমোহন উইলের সত্যতা প্রমাণ করিল, দস্ত-খত, মোহর, উইল লেখাপড়া ইত্যাদি সমস্ত তাহার সাক্ষাতে হইয়াছিল বলিল, উকীলের জেরায়ও বড় ঠকিল না, কিন্তু তবুও উড্ সাহেব তাহার কথায় বড় বিশ্বাস করিলেন না। তাহার দ্বিতীয় সাক্ষী, পৈতৃকসম্পত্তির তহশিলদার সেই মথুরা-নাথ পাল। রামকমল মথুরানাথকে নগদ পাঁচ শত টাকা দিয়াছে, তাহার তহশিলী দেনা টাকা লইবে না বলিয়া প্রতি-শ্রুত হইয়াছে এবং মোকদ্দমায় জয়লাভ হইলে তাহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। কিন্তু মথুরা-নাথ উকীলের কূট প্রশ্নে আত্মগোপন করিতে পারিল না। জজসাহেব তাহাকেও বিশ্বাস করিলেন না। একে একে রামকমলের সকল সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইল। সাহেব রামকমলকে মনে মনে দোষী স্থির করিয়াছিলেন, সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াও তাঁহার সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইল না। রামকমলের বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী ছিলেন, উদ্ধবচন্দ্র পাল ও আমাদের দীনেশবাবু। ইঁহাদের জবানবন্দীতে রামকমলের প্রকৃত চরিত্র বাহির হইয়া পড়িল। প্রতারণা, প্রবঞ্চনাই যে

তাহার কার্য্য, পরের সর্ব্বনাশ সাধনেই যে তাহার আনন্দ, দ্বেষ হিংসা ও স্বার্থ সাধনেরই যে সে চিরদাস, কোনরূপ সৎপ্রবৃত্তি যে তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না, বিচক্ষণ বিচারক উড্ সাহেব তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। জুরীরা একবাক্যে আসামীকে 'দোষী' স্থির করিলেন। জজসাহেব রামকমলের প্রতি 'কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসর কারাবাস' দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন। পুলীশ প্রহরীরা রামকমলের হস্তপদে লৌহ শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়া, তাহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে কারাগারে লইয়া গেল। আর রাইমোহন ও মথুরানাথ পাল এই মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে বলিয়া তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। অন্যান্য সাক্ষীরা মূর্খ ও নীচশ্রেণীর লোক বলিয়া বিচারক তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও রামকমল মুক্তি লাভ করিতে পারিল না। নগদ যাহা কিছু ছিল তাহা গিয়াছে, স্ত্রীর গহনা পত্র বিক্রয় করিতে হইয়াছে—তদুপরি তিন হাজার টাকা ঋণ করিতে হইয়াছে। রামকমলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে—মুক্তি লাভ করিয়া সকল দায়ীকের নামে

নালিস করিয়া টাকা আদায় করিয়া অবিলম্বে ঋণমুক্ত হইতে পারিবে। কিন্তু যখন সাহেব তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন, প্রহরীরা তাহার হস্তপদে লৌহবলয় পরাইতে লাগিল, তখন সে প্রায় চৈতন্য হারাইল। তাহার বোধ হইতে লাগিল যেন সে শূন্যের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহার পর পুলীশ প্রহরীরা যে তাহাকে গলাধাক্কা দিতে দিতে জেলের দিকে লইয়া যাইতেছিল, অব্যবস্থিতচিত্ত নষ্টবুদ্ধি রামকমল প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড পর্য্যন্ত তাহা টের পায় নাই! যখন সে তাহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিল তখন তাহার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতে লাগিল—তাহার মনে হইতে লাগিল যেন রাজপথের সমস্ত লোকেই তাহাকে চিনিতে পারিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, তাহার প্রতি ঘৃণার অঙ্গুলী প্রদর্শন করিতেছে এবং তাহার অবস্থা দেখিয়া হাসিতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহাকে কারাগৃহের প্রকাণ্ড লৌহফটকের নিকট লইয়া গেল। সেই ফটক ও ভীষণমূর্ত্তি বন্দুকধারী প্রহরীগণকে দেখিয়া রামকমলের হঠাৎ বোধ হইল যেন ইহা যমপুরীর দরজা। ভয়ে তাহার হৃদয় কণ্টকিত হইল। সেই ভয় বাড়াইবার জন্যই যেন যমকিঙ্করবৎ রক্তচক্ষু প্রহরীগণ তাহাকে প্রতি পাদবিক্ষেপে দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিল। অবিলম্বে রামকমলের বেশ পরিবর্ত্তন হইল। থানধুতি, চিনাকোট, ঢাকাই উড়ানী ও দেবাতুনের জুতা ছাড়িয়া তাহাকে একটা জাঙ্গিয়া ও একটা হাত-কাটা পিরিহান গায় দিতে হইল। নূতন বেশে রামকমল কারাগৃহে প্রবেশ করিল। সেই দিন হইতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

সারারাত্রি রামকমল চক্ষু বুজিতে পারিল না। গভীর রজ-

নীতে যখন সকলে নিদ্রায় অভিভূত, তখন রামকমল কম্বলশয্যা ও ইষ্টকনির্ম্মিত উপাধান ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হইল। অন্ধকারে তোকাইয়া তাকাইয়া সে দরজার নিকট আসিল, কিন্তু দরজা বাহিরের দিকে তালাবন্ধ ছিল, সুতরাং তাহার বাহিরে যাওয়া ঘটিল না। রামকমল তখন সেই অন্ধকারে বসিয়া মস্তকে হাত দিয়া চিন্তাস্রোতে গা ভাসাইয়া দিল। বাড়ীর কথা তাহার মনে পড়িল, আর অমনি সে অতি দুঃখে কাঁদিতে লাগিল। 'স্ত্রী, পুত্র, কন্যাগণের দশা কি হইবে?—কে তাহাদের রক্ষা করিবে?—কে তাহাদের ভরণপোষণ করিবে?—উপায় কি? এই সাত বৎসর কেমন করিয়া চলিবে? এক দিন, দু'দিন নয়। এক বৎসর, দু'বৎসর নয়।—সাত সাত বৎসর।। কেমন করিয়া চলিবে?—কি উপায় হবে?' ভাবিতে ভাবিতে রামকমল অতি দুঃখে কাঁদিতে লাগিল। মহামায়ার হস্তে একটী পয়সাও ছিল না, তাহা সে জানিত। তাহার প্রাপ্য টাকাও যে কেহ আর দিবে না, এই সাত বৎসরে সমস্ত তামাদি হইয়া যাইবে, তাহাও রামকমলের মনে উদয় হইল। হঠাৎ আর একটী চিন্তা উপস্থিত হইয়া রামকমলকে পাগল করিয়া তুলিল। মোকদ্দমার খরচ সংকুলনার্থ সে যে বাড়ী ঘর, ইষ্টকালয় আবদ্ধ রাখিয়া তিন হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়াছে, তাহা পরিশোধেরই বা উপায় কি? যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ না হইলে, মহাজন তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী করিয়া তাহার স্ত্রীপুত্রকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া সমস্ত দখল করিয়া বসিবে। রামকমল এই চিন্তায় অস্থির হইয়া গেল। 'হায়! হায়! তবে কি আমার স্ত্রীপুত্র নিজবাড়ী

হইতে বিতাড়িত হইয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে?' বলিতে বলিতে রামকমল পাগলের ন্যায় আপনার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম হস্ত মর্দ্দন করিতে লাগিল। হঠাৎ স্বর্ণকমলের কথা আজ তাহার মনে পড়িল—রামকমল শিহরিয়া উঠিল! সেই কারাগৃহের সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে রামকমলের চক্ষের নিকট যেন একটী মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইল—তাহা তাহার বৃদ্ধা জননীর অর্দ্ধদগ্ধ মূর্ত্তি! রামকমল মনঃকল্পিত মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে হতজ্ঞান হইয়া কারাগৃহের ইষ্টকনির্ম্মিত মেজের উপর পড়িয়া গেল। সেই পতনে তাহার মস্তকের এক স্থানে একটী ক্ষত হইল, উহা হইতে রক্তপ্রবাহ ছুটিয়া রামকমলের জাঙ্গিয়া, কম্বল রক্তাক্ত করিয়া ফেলিল। রামকমল তাহা জানিতেও পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় উঠিয়া বসিল। তখন সে আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল। প্রবল অনুতাপানলে তাহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতে লাগিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল,

'কেন আমি অর্থলোভে আপনার গলায় আপনি ছুরি বসাইলাম? আমি যদি ন্যায়পথে থাকিতাম তবে ত আজ আমার এমন দশা হইত না! অর্থের জন্য আমি কি না করিয়াছি?—বৃদ্ধ পিতাকে মনঃকষ্ট দিয়াছি, স্নেহের ভাই স্বর্ণকমলকে নিঃসম্বল করিয়া বিদেশে পাঠাইয়া তাহাকে প্রাণে বধ করিয়াছি। বৃদ্ধা জননীকে প্রহার করিতে গিয়াছি!—অবশেষে নিজের মাকে আগুনে পোড়াইয়া মারিয়াছি। আমার দশা কি হইবে?—মধুসূদন! আমাকে রক্ষা কর! আমি মাতৃবধ করিয়াছি, ভ্রাতৃবধ করিয়াছি, ভাইপো বধ করিয়াছি।—আমার এ পাপের

কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?—কিন্তু হায়! যে ধনের জন্য এত কাঁদিলাম, সে ধন এখন কোথায়?—এখন যে আমি ঋণ-গ্রস্ত! এই ঋণের জন্য মহাজন আমার স্ত্রীপুত্রকে নিজের গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিবে। আমার স্ত্রীপুত্র এখন পেটের দায়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে? আহা! আজ যদি স্বর্ণকমল থাকিত, তবে ত আমার এত দুঃখ হইত না। আমিই ত তাহাকে বিনাদোষে দেশত্যাগী করাইলাম, আমিই ত তাহার মৃত্যুর কারণ। আমার লোভেই সর্ব্বনাশ হইল।'

কাঁদিতে কাঁদিতে রামকমল অস্থির হইয়া সেই ইষ্টকোপাধানে মস্তক রক্ষা করিল। তাহার অশ্রুজল থামিল না। ইহারই মধ্যে তাহার একটু তন্দ্রা হইল—রামকমল ভীষণ স্বপ্ন দেখিল। দেখিল যেন—তাহার অর্দ্ধদগ্ধা জননী প্রজ্জলিত হুতাশনের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে লাল, নীল, সবুজ, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি নানারঙ্গের চিত্র বিচিত্র শত সহস্র বিষধর সর্প প্রকাণ্ড ফণা বিস্তার করিয়া রামকমলের দিকে চাহিয়া ক্রোধে শোঁ শোঁ শব্দ করিয়া মেদিনী কাঁপাইতেছে। আর জননীর বামপার্শ্বে মস্তকশূন্য কৃষ্ণবর্ণ ও অতি স্থূলকায় কতকগুলি মানুষ প্রজ্জলিত মশাল হাতে লইয়া তাহাকে প্রহার করিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার অর্দ্ধদগ্ধা জননী সেই প্রজ্জলিত অগ্নির মধ্যে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ক্রমে রামকমলকে দেখাইয়া দিল, আর অমনি শত সহস্র সর্প অতি ক্রোধের সহিত অগ্রসর হইয়া তাহাকে 'সপাং' 'সপাং' করিয়া দংশন করিতে লাগিল এবং মস্তক-বিহীন মনুষ্যগুলি প্রজ্জলিত মশাল দ্বারা রামকমলকে প্রহার করিতে লাগিল! রাম

কমল ভয়ে সত্য সত্যই চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া কারাগারের প্রহরীগণ তাহার প্রকোষ্ঠের নিকট আলো লইয়া আসিয়া তালা খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং রামকমলের নিকট চীৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রামকমলের হৃদ্‌পিণ্ডটা তখন দপ্ করিয়া কাঁপিতেছিল, সে কোন কথার উত্তর দিতে পারিল না। প্রহরীরা আলোর সাহায্যে সমস্ত গৃহটা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে লাগিল। অবশেষে রামকমলের পৃষ্ঠদেশে, কম্বলে ও জাঙ্গিয়ায় রক্ত দেখিতে পাইল। তখনও রামকমলের মস্তক হইতে রক্তপ্রবাহ ছুটিতেছিল। প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল,

'এ রক্ত কোথা হইতে আসিল ?'

রামকমল নিজ মস্তকে, পৃষ্ঠে ও কম্বলে রক্ত দেখিয়া অবাক হইল, সে যে হতজ্ঞান হইয়া মেজেতে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই। সে ভাবিতে লাগিল, 'এ রক্ত কোথা হইতে আসিল ? তবে কি সত্য সত্যই আমাকে সাপে দংশন করিয়াছে ?' প্রহরীগণের কথার রামকমল কোন উত্তর দিতে পারিল না। প্রহরীরা তাহাকে [illegible] গালি দিতে লাগিল, রামকমল তাহা সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। পর দিন প্রাতঃকালে প্রহরীরা রামকমলকে জেলারের নিকট লইয়া গিয়া তাহার মস্তকের ক্ষত স্থান, রক্তাক্ত দেহ ও কম্বল দেখাইয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় কতগুলি কথা বলিল। জেইলার বাবু রামকমলের দিকে চাহিয়া সক্রোধে বলিলেন,

'দেয়ালের গায় মাথা ঠুকাইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিতেছিলে। এ্যাঃ পাজি—হারামজাদ্, বসো, মজা দেখ্বে।'

আত্মহত্যার চেষ্টা করা অভিযোগে রামকমল পুনরায় অভি-যুক্ত হইল, আদালতে যথারীতি বিচার হইল। বিচারক রাম-কমলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

'তুমি আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করেছিলে?'

'না'

'তোমার মাথায় ক্ষতচিহ্ন হইল কি রূপে?'

'আমি তাহার কিছুই জানি না।'

রামকমলের এই সত্য কথাও আজ কেহ বিশ্বাস করিল না—সময়ের এমনই গতি। তাহার বিরুদ্ধে অপরাধ সাব্যস্ত হইল। সাহেব তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ডাজ্ঞা করিলেন। ছিল সাত বৎসর, হইল নয় বৎসর। রামকমল ইতিপূর্ব্বে অনেক গুরু-তর অপরাধ করিয়াও অব্যাহতি পাইয়াছে, আজ তাহার বিনা দোষে শাস্তি হইল! এখন হইতে সে কারাগৃহের মধ্যে এক জন চিহ্নিত মানুষ হইল। প্রহরীরা তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিত—অতি পরিশ্রমের কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত করা হইত। তিরস্কার ও বেত্রাঘাত তাহার নিত্য সহচর হইল। প্রতি রজনীতে শয্যাগৃহে যাইয়া রামকমল গভীর শোকে অভিভূত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। স্ত্রীপুত্র কন্যার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে রামকমল, স্বর্ণকমল, জননী, ছোট-বৌ, মাখনলাল ইত্যাদির ভাবনাও না ভাবিয়া পারিত না। পূর্ব্বকৃত পাপের স্মৃতি হতভাগা রামকমলকে পাগল করিয়া তুলিতে লাগিল। রামকমলের কারাবাস বিবরণী বিস্তৃতরূপে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আভাসে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রামকমল যেরূপ গুরু পাপ করিয়াছিল, তেমনই গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

ঊনচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

বিপদের উপর বিপদ।

'কুকথা বাতাসের আগে ধায়' এই প্রবাদ বাক্যটী মিথ্যা নহে। মোকদ্দমার কথা জানিতে মহামায়ার অধিক বিলম্ব হইল না। মহামায়া ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মহামায়া ইতিপূর্ব্বে অনেক দিন মায়া ক্রন্দন কাঁদিয়াছে, স্বামীর শয্যাপার্শ্বে সখের কান্না কাঁদিয়া অনেক দিন পারিবারিক কলহোৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অদ্যকার ন্যায় দুঃখের কান্না সে আর কাঁদে নাই। গভীর যাতনায় অধীরা হইয়া মহামায়া আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দনে পাড়ার সমস্ত বালক বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা একত্রিত হইল। স্বামীর জন্য সে তত দুঃখিত হইল না, যত হইল নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া। 'আমার কি দশা হবে?—আমি কোথা যাব।' ইহাই তাহার ক্রন্দনের মূলভিত্তি হইল। এত দিন মহামায়া ধরা খানাকে সরা খানা জ্ঞান করিয়াছে, ধন সম্বলকে পৃথিবীর একমাত্র সার বস্তু মনে করিয়া গৌরবভরে হেলিয়া দুলিয়া মাটিতে পা দেয় নাই, ধনগর্ব্বে মত্ত হইয়া পাড়া প্রতিবেশিনী বা অন্য কাহার প্রতি কখনও সদ্ব্যবহার করে নাই, দুর্ব্বাক্য ও মর্ম্মপীড়াদায়ক উক্তি ব্যতীত কাহাকে ভুলিয়াও এক দিন একটা মিষ্ট কথা বলে নাই। পরের সুখ, দুঃখ, সুবিধা, অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, স্বামীর ন্যায় মহামায়াও সকলের প্রতি ঘৃণামিশ্রিত তাচ্ছল্য ও যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু আজ একটী ঘটনায় তাহার সমস্ত পূর্ব্ব ভাব যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া

গেল। মহামায়া এই সমস্ত পৃথিবীটা তাহার স্বামীর করতলগত মনে করিয়াছে—তাহার স্বামীর যে এমন দশা ঘটিতে পারে, ইহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। যখন মহামায়া প্রথম শুনিল যে তাহার স্বামীর 'মেয়াদ' হইয়াছে, তখন তাহার সে কথাটা মিথ্যা মনে হইল। সে ভাবিল, হিংসুক মানুষগুলি তাহাকে মনঃকষ্ট দিবার জন্য এই মিথ্যা জনরব রটিতেছে, কিন্তু যখন সে দেখিল যে রামকমল, রাইমোহন ও তুফানী মোল্লা ব্যতীত উভয় পক্ষের আর সকল সাক্ষীগণ বাড়ী আসিল, তখন তাহার একটু আশঙ্কা হইল। অনতিবিলম্বে প্রকৃত সংবাদ জানিতে পারিয়া, মহামায়া তাহার জীবনে প্রথম দুঃখের কান্না কাঁদিল। আজ সে পৃথিবীটা শূন্য দেখিতে লাগিল। কিছুকাল পরে মহামায়া একটু স্থির হইল। মনে করিল, এই কয়টা বৎসর সে পিত্রালয়ে যাইয়া কাটাইয়া আসিবে। তাহার জ্যেষ্ঠ রাইমোহন মহকুমায় মোক্তারী করিত, তাহা পাঠক পাঠিকগণের স্মরণ আছে। রাইমোহনের ভরসায় মহামায়া একটু স্থির হইল। কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে যখন তাহার বড়দাদা রাইমোহনের প্রতিও কারাদণ্ড ভোগের আদেশ হইল, তখন মহামায়া সজোরে কপালে করাঘাত করিয়া পাগলিনীর ন্যায় ভূমিতে গড়াগড়ি করিতে লাগিল। তাহার পর মহামায়া জজ সাহেবকে শত সহস্র গালাগালি করিতে লাগিল—দীনেশবাবুকে তাহার নানা অংশ প্রদান করিতেও ভুলিল না। কিন্তু আজ মহামায়া কাঁদিয়া, গালিবর্ষণ করিয়া এবং অভিসম্পাত করিয়াও শান্তিলাভ করিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার চক্ষু ফুলিয়া গেল, ভূমিতে লুটাইতে লুটাইতে তাহার

শরীর ও বস্ত্র ধূলিধূসরিত হইল, গালিবর্ষণ ও অভিশাপ করিতে করিতে তাহার গলা ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু তবুও মহামায়া আজ কোন পন্থা খুঁজিয়া পাইল না।—চতুর্দ্দিক তাহার নিকট আজ শূন্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার ক্রন্দন শুনিয়া নবলক্ষ্মী, নন্দগোপাল 'বাবা গো' 'মামা গো' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মহামায়ার ব্যবহারে কেহই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না, কিন্তু তবুও তাহার এই বিপদে সকলেই তাহার জন্য অল্পাধিক দুঃখিত হইল—সকলেই দুই একটা প্রবোধবাক্য বলিয়া চলিয়া গেল। কেহ কেহ দুই এক বিন্দু অশ্রু ত্যাগও করিল। কিন্তু তাহার এই বিপদে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখিতা হইল—আমাদের সুকুমারী। সুকুমারী এই অল্প বয়সেই অনেক যাতনা সহ্য করিয়াছে, অনেক বিপদ মস্তক পাতিয়া লইয়াছে, অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, বিপদে পতিত হইয়া যৎপরোনাস্তি মর্ম্মপীড়া সহ্য করিয়া অনেক প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছে, সুতরাং পরের বিপদে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে সে অত্যন্ত পটু—পরের দুঃখ, লাঞ্ছনা দেখিলে স্বভাবতঃই তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হয়। মহামায়ার এই উপস্থিত বিপদে, সুকুমারী তাহার পূর্ব্ব চরিত্র একবারে বিস্মৃত হইল—ননীগোপালকে কোলে লইয়া সে মহামায়ার কাছে বসিয়া প্রবোধ বাক্য বলিতে লাগিল। 'দিদি। আর কেঁদ না, বড়-দিদি! তোমার চিন্তা কি? আমাদের যেমন করে চলে, তোমার তেমন করেই চলবে। তুমি কি আমাদের পর?' আজ সুকুমারী মনের সাধে ননী গোপালকে কোলে লইল। মহামায়ার তাহাতে আজ দুঃখ বা হিংসা হইল না—বরং সে মনে মনে একটু প্রীতা হইল।

কিন্তু ইহাই সব নহে। মানুষের যখন বৃহস্পতি সহায় থাকেন, তখন সে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহাতেই কৃতকার্য্য হয়, প্রত্যেক কার্য্যেই সুফল প্রসব হয়, নানারূপ অসম্ভাবিত সুখ সম্পদে সময় কাটিতে থাকে। ফল কথা, তখন কোনরূপ ক্লেশ, লাঞ্ছনা বা বিপদে তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু যখন সেই সুসময়টুকু চলিয়া যায় রাহুর দশা উপস্থিত হয়, তখন সেই মানুষেরই ভাল কার্য্যে মন্দফল ফলে, নানা প্রকার বিপদে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরে এবং কোথা হইতে বিপদের উপর বিপদ আসিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। রামকমল, মহামায়ার সেই সুসময়টুকু চলিয়া গিয়াছে—রাহুর দশা উপস্থিত হইয়াছে। রামকমলের প্রতি সাত বৎসর কারাবাসের আদেশ হইল, আবার দুদিন না যাইতেই আরও দুই বৎসর বাড়িয়া গেল। আবার রামকমলের সঙ্গে সঙ্গে মহামায়ার ভাই রাইমোহনেরও হাতে কড়ি পড়িল। কিন্তু ইহাও সব নহে। এই সব দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই একদিন প্রাতঃকালে রামকমলের অন্দরবাটীর আঙ্গিনা দারোগা, হেড্‌কনেষ্টবল, পুলীশ ও অন্যান্য লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। রামকমলের জ্যেষ্ঠপুত্র নন্দগোপাল যে একদিন পাঠশালা ছুটীর পর বাড়ী আসিয়া পাড়ার একটী শিশুর হস্ত হইতে স্বর্ণবলয় চুরি করিয়া নবলক্ষ্মীর নিকট দিয়াছিল, পাঠক পাঠিকাগণের বোধ হয়, তাহা স্মরণ আছে। সেই বালকের পিতা সোণার বলয় চুরি গিয়াছে বলিয়া পরদিনই থানায় এজাহার দিয়াছিল। পুলীশ অনুসন্ধানে আসিয়া পাঠশালার ও গ্রামের বালক, বালিকাগণের নিকট নন্দগোপালের স্বভাব সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাইয়াছে। তাহাতে তাহাদের সন্দেহ হয়। সেজন্য,

রামকমলের খানাতল্লাস করিবার জন্য আজ তাহার বাড়ী লাল-পাগড়ীওয়ালায় পূর্ণ হইয়া গেল। পুলিশের লোক পরের সুখ দুঃখ, সময় অসময় বিবেচনা করে না, সুতরাং মহামায়ার এই বিপদে তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক কর্কশ ব্যবহার ও উগ্রমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিল না। যথারীতি রামকমলের খানাতল্লাস করিতে লাগিল। ভয়ে নবলক্ষ্মী ও নন্দগোপাল ছাদের উপর যাইয়া পলাইয়া রহিল। মহামায়া এ চুরির সংবাদ অবগত ছিল না। সুতরাং তাহার এই দুঃসময়ে বিনা দোষে তাহাদিগকে এইরূপ অপমানিত করিতেছে মনে করিয়া, সে সুকুমারীর নিকট যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। পুলীশ কর্ম্মচারীরা তাহার ঘরের দ্রব্য সামগ্রীগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং উহা নানাস্থানে নিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিতে লাগিল। মধুর হাঁড়িগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সেই উগ্ররূপিণী মহামায়া আজ কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই সকল অত্যাচার ও অপমান সহ্য করিতে লাগিল। কৃষ্ণকমল হতবুদ্ধির ন্যায় এক স্থানে বসিয়া রহিল। কিন্তু সুকুমারী এ দণ্ড সহ্য করিতে পারিল না—তাহার শ্বশুরের পরিবারে চুরির অপবাদ—কালীকান্ত রায়ের বাড়ী খানাতল্লাস, ইহাতে তাহার মর্ম্মে শেলবিদ্ধ হইতে লাগিল। সুকুমারী জানিত না যে, অপহৃত স্বর্ণবলয় রামকমলের গৃহেই লুক্কায়িত আছে। তাই সুকুমারী তাহার ভৃত্য ভজহরিকে ডাকিয়া বলিল,

'দেখ, ঐ বাবুদের বল যে, এ চোরের বাড়ী নয়—এখানে এত অত্যাচার করা তাঁহাদের ভাল হইতেছে না।'

ভৃত্য ভজহরির কথায় কেহ বড় কর্ণপাত করিল না। সুকুমারী অতি দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,

'আজ আমার শ্বশুর নাই, স্বামী নাই, দীনেশদাদাও এখানে নাই, এ দীন দুঃখীর কথা বাবুরা গ্রাহ্য করিবেন কেন ?'

কিয়ৎকাল অনুসন্ধানের পর, একটা অর্দ্ধভগ্ন হাঁড়ির মধ্যে চারি পাঁচটী মৃণ্ময় ক্রীড়া পুত্তলী ও সেই অপহৃত স্বর্ণবলয় দু'গাছি পাওয়া গেল। যাহাদের বলয় চুরি হইয়াছিল, তাহারা বলিল, 'ইহাই আমাদের বলয়'। সকলে অবাক হইল। মহামায়া নন্দগোপালের চরিত্র বিলক্ষণ অবগত ছিল, সুতরাং প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে তাহার কালবিলম্ব ঘটিল না। দারোগা ও কনষ্টেবলগুলি নানারূপ অশ্রাব্য গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। অবশেষে সুকুমারীকে লক্ষ্য করিয়া একটা পুলীশ কর্ম্মচারী বলিল,

'কৈ, সেই ঠাকুরুণ কৈ ? এটা নাকি চোরের বাড়ী নয় ?—চুরিই যাদের ব্যবসা, তাদের আবার অত বড় কথা কেন ?'

সুকুমারী সেই মধুরবাক্যে ম্রিয়মাণা হইল। যাহাদের বাড়ী চুরি হইয়াছিল, তাহারা সুকুমারীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া পুলীশের হস্তে কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া বলিল,

"ইহা চুরি নহে—নন্দগোপাল ছেলে মানুষ, ইহা তাহারই কাজ। সে বুঝিতে না পারিয়া এরূপ করিয়াছে। আমরা চুরির দাবি রাখি না—আপনারা দয়া করিয়া গোলমাল মিটাইয়া দিন।'

গ্রামের সমস্ত লোকেই এইরূপ বলিল। মহামায়ার শত্রুগণও আজ তাহার বিপদ দেখিয়া তাহার পক্ষে দুই একটা কথা বলিল। কিন্তু পুলীশ কাহারও কথা শুনিল না। কৃষ্ণকমল ও নন্দগোপালকে সঙ্গে লইয়া তাহারা থানায় চলিয়া গেল। বাড়ীতে আবার ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল।

চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

ইহার উপর নূতন বিপদ।

গ্রামে একজন টর্ণী-মোক্তার ছিল। পরদিন সে পরম সুহৃদের ন্যায় আসিয়া বলিল, 'কিছু অর্থ ব্যয় করিলে এখনও অব্যাহতি হইতে পারে।' কিন্তু মহামায়াব হস্তে পয়সা নাই। মুক্তকেশীও রিক্তহস্তা। উপাযান্তব না দেখিয়া, শোকাকুলা মহামায়া পুত্রকে উদ্ধার করিবার জন্য মান মর্য্যাদা, অহঙ্কাব পবিত্যাগ করিয়া, লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, পূর্ব্বে সে সুকুমাবীব প্রতি কিরূপ জঘন্য ও নৃশংস ব্যবহার কবিয়াছে তাহা একবাব মনে না কবিয়া, আজ সুকুমাবীর নিকট উপস্থিত হইয়া কৃপা-ভিক্ষা চাহিল! মহামায়া অস্থির হইয়া কাঁদিযা বলিল,

'ছোট-বৌ—আব বল্‌ব কি?—আজ তুমি দয়া করে উদ্ধাব না কবিলে আমি পুত্রহীন হই।'

এই কথা বলিবা মহামায়া সত্য সত্যই সুকুমাবীর পদপ্রান্তে মাটিতে পডিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুকুমাবী তাহাকে হাতে ধরিয়া উঠাইযা বলিল,

'ছি দিদি! কর কি? তুমি কি আমাদের পব?—তোমাব নন্দগোপাল, ননীগোপাল কি আমাব নয়?'

বলিতে বলিতে সুকুমাবীও অশ্রুমুখী হইল।

সুকুমাবী আর সময ক্ষেপণ না কবিয়া গিরিবালার নিকট হইতে একশত দশ টাকা লইল। গিরিবালা তখনও সুকুমাবীর সঙ্গে ছিল। সে একটু বাঁকাইয়া বলিল,

'একটু সবুর কর, টাকাগুলি শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর দিয়ে ফেলো না। আগে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক।'

স্নেহশীলা সুকুমারীর হৃদয় কৃষ্ণকমল ও নন্দগোপালের জন্য কাঁদিতেছিল। সে গিরিবালার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিল না। টর্ণীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কত টাকা লাগিবে।'

টর্ণী উত্তর করিল, 'এক শত টাকা হ'লে হ'তে পাবে।'

সুকুমারী। কাজ হবে ত?

টর্ণী। তা হবে বৈ কি?

সুকুমারী। তবে এই লও—একশত টাকাই দিলাম। যেমন করিয়া পার বাবুকে আর নন্দগোপালকে আনিয়া দিবে। আরও কিছু টাকা লাগিলে, তাহাও দিব।

টর্ণী-মোক্তার চলিয়া গেল। মহামায়া ও মুক্তকেশী একটু আশ্বস্ত হইল। কৃষ্ণকমল নির্দ্দোষী, রামকমলের সহিত পৃথকান্ন, তাহার গৃহে মাল পাওয়া যায় নাই, সুতরাং দারোগা নিজেই তাহাকে ছাড়িয়া দিবে ভাবিতেছিল, এমন সময় টর্ণী-মোক্তার থানায় গিয়া দারোগা বাবুর হস্তে পাঁচটী টাকা দিল। দারোগা বাবু কৃষ্ণকমলকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু নন্দগোপালকে ছাড়িল না। মেজ-কাকাকে সঙ্গে দেখিয়া এতক্ষণ নন্দগোপালের একটু সাহস ছিল। কৃষ্ণকমল চলিয়া গেলে, সেই অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত লোকের মধ্যে একাকী পড়িয়া নন্দগোপাল ভীষণ কান্না জুড়িয়া দিল।

যথাসময়ে এই চুরির মোকদ্দমার বিচার হইল। নন্দগোপাল ভদ্রলোকের সন্তান। এই কিশোর বয়সে চুরি করিতে শিখিয়াছে দেখিয়া বিচারক দুঃখিত হইলেন এবং যথারীতি প্রমাণ গ্রহণ

করিয়া হতভাগা নন্দগোপালকে পাঁচ বৎসর চরিত্র-সংশোধনী কারাগারে থাকিতে আদেশ করিলেন। নন্দগোপাল আলীপুর চরিত্র-সংশোধনী কারাগারে প্রেরিত হইল। বালক কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল হইযা জাহাজ ও রেলপথে আলীপুরে গিযা পৌঁছিল। মহামায়া ও সুকুমারীর বক্ষে শেল বিদ্ধ হইল।

একচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

'যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল।'

উপর্য্যুপরি বিপদ্‌গ্রস্ত হওয়ায় মহামায়ার হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িযা গেল। সুখশান্তি তাহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিল। প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে সঙ্গে মহামায়ার শিক্ষাও আরম্ভ হইল। পাপ করিলে যে প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হয়, পরের সর্ব্বনাশ করিতে গেলে যে ভগবান তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন—এক কথায়, মস্তকের উপর যে সর্ব্বদর্শক, সর্ব্বনিয়ন্তা, অনন্তশক্তি-সম্পন্ন ভগবান রাজদণ্ড ধারণ করিযা পৃথিবী শাসন করিতেছেন, মহামায়ার এত দিন সে কথা একটীবারও মনে হয় নাই;—এজন্য স্বামীর ন্যায় পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে সে কখনও দ্বিধা বোধ করে নাই। বিপদে পড়িয়া এখন তাহার নানা কথা মনে হইতে লাগিল। নিদ্রা তাহার চক্ষু পরিত্যাগ করিযা চলিয়া গেল, শোকাশ্রু সে স্থান অধিকার করিয়া বসিল। মহামায়া দিনান্তে এক মুষ্টি আহার করে, আর শয্যা পার্শ্বে বসিযা কাঁদে, আর কি চিন্তা করে! পরম পূজনীয়, স্নেহশীল, পিতৃতুল্য শ্বশুরের প্রতি সে যে কত অশিষ্ট ও জঘন্য ব্যবহার করিয়াছে, ঐশ্বর্য্য শ্বশ্রূর প্রতি কত সময় কত

দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, মিথ্যা কথা বলিয়া স্বামীকে উত্তেজিত করিয়া তাহার দ্বারা কত সময় বিনা প্রয়োজনে শ্বশুর শাশুড়ীর হৃদয়ে দারুণ শেল বিদ্ধ করিয়াছে, কত সময় স্থিরপ্রকৃতি বালিকা সুকুমারীকে অনর্থক যাতনা প্রদান করিয়াছে, অবশেষে স্বামী দ্বারা সুকুমারীর গৃহে অগ্নি প্রদান করাইয়া কিরূপে শাশুড়ীকে ও মাখনলালকে পুড়িয়া মারিয়াছে, একে একে এ সকল কথাই তাহার মনে উপস্থিত হইতে লাগিল। অনেক দুশ্চিন্তার পর, মহামায়া চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে অস্ফুট স্বরে আপনা আপনি বলিল,

'আমার এ দশা হইবে বৈ কি?—আমি পরের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, আমার সর্ব্বনাশ হইবে না কেন? আমি পরকে স্বামী-সুখে বঞ্চিতা করিয়াছি, একজনের বুকের ছেলে আগুনে পোড়াইয়া মারিয়াছি, আমার এমন দশা হইবে না কেন? তাই বিনা আগুনেও আমার ঘর পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল, তাই পতি পুত্র কারাগারে গেল, একমাত্র ভাইও তাদের সঙ্গের সঙ্গী হইল। শ্বশুর, শাশুড়ী ও সুকুমারীর অভিসম্পাতে আজ আমার এই দশা—আজ আমি অনাথিনী, পরপ্রত্যাশিনী, অন্নের কাঙ্গালিনী। আর বাছা নন্দগোপাল ত আজ আমার দোষেই কারাগারে কষ্ট পাইয়া মরিতেছে। আমি যদি তাহাকে শিশুকালে ছোট-বৌর শশা, বেগুন চুরি করিতে না শিখাইতাম, তবে ত বাছার আমার এ অভ্যাস হইতে পারিত না, তবে ত বাছা আজ আমার কাছেই থাকিত। আমি যেমন কর্ম্ম করিয়াছি, তেমনই তাহার ফল পাইতেছি।'

এইরূপ মনঃকষ্টে তাহার দিন যাইতে লাগিল। রামকমল

জেলায় যাইবার সময় যে চাউল ডাইল ক্রয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা দ্বারা কোন প্রকারে দুই মাস চলিল। ইহার পর মহামায়াকে উদরান্নের জন্যও পরপ্রত্যাশিনী হইতে হইল। রামকমল যাহাদের নিকট টাকা পাইত, তাহারা সুযোগ বুঝিয়া দেনা অস্বীকার করিতে লাগিল। মহামায়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। মহামায়ার উপর আর এক বিপদ চাপিল। তুফানী মোল্লার পুত্র মামুদমোল্লা একদিন আসিয়া মহামায়াকে বলিল, 'আমার বাপ আপনাদের পক্ষে সাক্ষী দিতে গিয়া আর বাড়ী ফিরে নাই, আমাদের ঘরে একমুটা চাউল নাই। আমরা কি না খাইয়া মরিব? বাবা না আসা পর্য্যন্ত আমাদের খরচ আপনাকে চালাইতে হইবে।' মামুদের কথামত সাহায্য প্রদান না করিলে যে তাহারা পেটের দায়ে মহামায়ার প্রতি অত্যাচার করিতেও বাধ্য হইবে, ইঙ্গিতে সে কথা বলিতেও ছাড়িল না। মহামায়া ভয়ে কাঁদিতে লাগিল।

গৃহের সঞ্চিত চাউল নিঃশেষিত হইল, হাতে যে কয়টী পয়সা ছিল তাহাও গেল, তারপর ধার আরম্ভ হইল। সুকুমারী তাহার মহাজন হইল। কোন দিন এক সের চাউল, কোন দিন দু গণ্ডার পয়সা, কোন দিন একটু লবণ, কোন দিন একটু তৈল—এইরূপে কয়েক দিন চলিল। তারপর গৃহস্থিত তৈজসাদি বিক্রয় আরম্ভ হইল। তাহাতে কিছু কাল চলিল। এইরূপে কোন দিন একাহার, কোন দিন অনাহারে, কদাচিৎ পূর্ণাহারে সময় কাটিতে লাগিল। তৈজসপত্র ফুরাইল, ধার বন্ধ হইল। সুকুমারী সর্ব্বদাই প্রাণপণে তাহার সাহায্য করিত এবং অনেক সময় মহামায়ার প্রয়োজন বুঝিয়া অযাচিত হইয়াও নবনীর নিকট দ্রব্যাদি পাঠাইয়া

দিত। কিন্তু মহামায়ার বড় লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। সে এ পর্য্যন্ত সুকুমারীর নিকট হইতে যত ধার নিয়াছে, তাহার একটীও শোধ করিতে পারে নাই। সুতরাং আর হাত পাতিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। এমন সময় মহামায়ার বৃদ্ধা জননী মহামায়া প্রভৃতিকে নিজবাটীতে নিবার জন্য একখানি ডিঙ্গি নৌকা পাঠাইয়া দিল। মহামায়া সন্তানগণকে লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। কিন্তু এবার মহামায়াকে নিরলঙ্কারা হইয়া, মাত্র দু গাছি শাঁখার বালা পরিয়া, পিতৃগৃহে যাইতে হইল। মহামায়ার জননী তাহা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল। মহামায়ার পিত্রালয়ের অবস্থা বড় স্বচ্ছল ছিল না; তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহকুমায় মোক্তারী করিয়া পঁচিশ, ত্রিশ টাকা উপার্জ্জন করিত, তদ্দ্বারা কোন প্রকার গ্রাসাচ্ছাদন চলিত মাত্র। এখন সে উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ থাকায় রাইমোহনের স্ত্রী পুত্র জননীর উদরান্নেরও উপায় রহিল না। এমতাবস্থায় মহামায়া তাহার পুত্র কন্যা লইয়া পিতৃগৃহে যাওয়ায় তাহাদের সকলেরই কষ্টের একশেষ হইতে লাগিল—এমন কি, সকল দিন সকলের দু মুটা অন্নও জুটিত না। তদুপরি প্রায় প্রতিদিনই ভ্রাতৃবধূর সহিত মহামায়ার কলহ হইতে লাগিল, অতি কষ্টে মহামায়ার দিন যাপন হইতে লাগিল।

দ্বিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

সুধীরচন্দ্র ও ইন্দুভূষণ।

পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, যথাসময়ে সুকুমারীর দ্বিতীয় পুত্র জন্মিয়াছে। পুত্রটীর

বয়স এখন কিঞ্চিদধিক পাঁচ বৎসর হইয়াছে। দীনেশবাবু বালকের নাম রাখিয়াছেন, 'সুধীবচন্দ্র'। এই সুধীর নামেই সকলে তাহাকে ডাকিত। গিরিবালা নাম রাখিলেন, 'সুবোধচন্দ্র'। দীনেশবাবু আদর করিয়া কখন ইহাকে 'সুধীব বাবু' কখন বা 'সুবোধ বাবু' বলিয়া ডাকিতেন। সুকুমাবী নাম রাখিল 'দুঃখীরাম'। কিন্তু এই নামে কেহই ডাকিত না। মধ্যে মধ্যে সুকুমারী 'দুঃখু বাবু' বলিয়া ডাকিত মাত্র। আমরা ইহাকে সুধীরচন্দ্র বলিযাই উল্লেখ কবিব। সুধীবচন্দ্র অতি সুন্দব, সুলক্ষণাক্রান্ত এবং বয়সেব তুলনায বেশ সুবুদ্ধিসম্পন্ন। সুধীবের জন্ম হইলে, সুকুমাবী অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে স্বামীব 'শেষ চিহ্ন' অবলোকন করিল, আব মনে মনে ভাবিল, 'আজ যদি তিনি থাকিতেন!' সুধীবকে দেখিয়া সুকুমাবী স্বামীশোক একটু ভুলিতে পারিল—সেই দিন হইতে তাহার সংসাবে একটা নূতন আশক্তি হইল। সুকুমারী মৃত্যুকামনা পবিত্যাগ কবিল। কিন্তু তাহাব অশ্রুজল শুষ্ক হইল না। সুধীব মায়ের মুখপানে চাহিয়া, চাঁদমুখে মধুব হাসি হাসিত—অমনি সুকুমাবীর নয়ন কোণে অশ্রু দেখা যাইত। সুধীর মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে হামাগুড়ি দিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তবে যাইত, আবাব ফিরিয়া আসিয়া মাযেব অঞ্চল ধবিযা দাঁড়াইতে চেষ্টা কবিত, তখনই সুকুমাবী বস্ত্রাঞ্চল দ্বাবা চক্ষু মুছিয়া পুত্রকে কোলে লইত। সুধীব একটু একটু কথা বলিতে শিখিল—অস্ফুট স্বরে বলিত, 'মা', সুকুমারী পুত্রের মুখপানে চাহিত। অবোধ শিশু বলিত, 'বাব্‌বা', সুকুমাবী সেই কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিত। সুধীর অন্য বালকের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলী বা বাঁশী দেখিলে, মায়ের নিকট

তাহা চাহিত—সুকুমারী তাহাতে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিত না। সুধীর কাহার পরিধানে লালবস্ত্র দেখিলে দৌড়িয়া মায়ের কাছে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিত, 'মা! আমায় আঙ্গা কাপল্', সুকুমারী তাহাকে কোলে লইয়া, তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া, মুখ চুম্বন করিত এবং নিজের চক্ষু মুছিত। এইরূপে সুধীরচন্দ্র বাড়িতে লাগিল, কিন্তু সুকুমারীর অশ্রুজল শুকাইল না।

সুধীরচন্দ্রের জন্মগ্রহণের কয়েক মাস পরে দীনেশবাবুর একটী পুত্র জন্মিল। তাহার নাম হইল ইন্দুভূষণ। দীনেশবাবু ও গিরিবালা পুত্রমুখ দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। দীনেশ-বাবু ইতিমধ্যে তাঁহার জমীদারীর সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। এখন স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া কিছু দিন কলিকাতা থাকিবেন মনস্থ করিলেন। গিরিবালা সে প্রস্তাবে আহ্লাদ সহকারে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কলিকাতা মোক্তারের নিকট বাসা ভাড়া করিবার জন্য হুকুমচিঠী গেল। বহুবাজারে, পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায়, একটী নাতিক্ষুদ্র, বায়ুপূর্ণ, দ্বিতলবাটী স্থির হইল। কলিকাতা রওনা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে দীনেশবাবু সস্ত্রীক গঙ্গাতীরে আসিলেন, তথায় চারি দিন অবস্থিতি করিলেন। তখন নন্দগোপাল ও রামকমল কারাবাসে। স্বর্ণকমলের পৈতৃক সম্পত্তির খাজানাদি তহশীল জন্য একজন সচ্চরিত্র লোক নিযুক্ত করিলেন। তারপর, সুকুমারীকে তাঁহার সহিত কিছুকাল কলিকাতা যাইয়া থাকিতে অনুরোধ করিলেন, সুকুমারী স্বীকৃতা হইল না। দীনেশবাবু ও গিরিবালা অনেক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, সুকুমারী বলিল,

'দাদা! তুমি ত জান যে শ্বশুর মহাশয় মরিবার সময় আমায় প্রতিজ্ঞা করিয়ে গিয়াছেন যে সুখে হউক, দুঃখে হউক, আমি এ

বাড়ীতেই থাকিব? এ জন্য, আমি তাঁহার মৃত্যুর পর একদিনও পিত্রালয়ে যাই নাই। তুমি কি আমায় সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে বল?' তোমরা আমার জন্য যাহা করিতেছ, মায়ের পেটের ভাই তেমন করে না। আমি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি, নহিলে কি তোমার কথায় আপত্তি করি?'

সে কথার প্রত্যুত্তরে দীনেশচন্দ্র বলিলেন,

'তোমাকে জনমের মত এ বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইতে বলিতেছি না। কিছু কালের জন্য যাইবে, আবার সময় সময় আসিবে। বিশেষ কলিকাতা তীর্থস্থান—কালীগঙ্গার স্থান—সেখানে থাকিতে তোমার নিষেধ নাই। আর তোমার শ্বশুরের ভিটায় যাহাতে রোজ প্রদীপ জ্বলে, আমি তাহার যোগাড় করিয়া যাইতেছি। সে জন্য তোমার চিন্তা নাই।'

সুকুমারী। তবে কি যাইতেই বল?

দীনেশ। হাঁ, কিছু কালের জন্য। তুমি যাইবে বলিয়া আমরা কলিকাতায় একটা বড় বাসা ভাড়া করিয়া রাখিয়াছি।

গিরিবালা আনন্দিতা হইয়া বলিল, 'যদি তুমি একান্তই না যাইবে, তবে আমরা সুবোধকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। এ বাড়ীতে এ শিশুকে কখনই রাখা হইবে না—ইহা আমরা স্থির করিয়া আসিয়াছি—তাহা বুঝিয়া, যাহা হয় কর।'

সুকুমারী বাষ্পপূর্ণলোচনে, গদ্গদকণ্ঠে গিরিবালার কাণে কাণে বলিল,

'এখন আর আমার কেহ শত্রু নাই।',

গিরি। তা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থেক না—চল তুমি আমাদের সঙ্গে—আপত্তি কর্‌ো না—ইহা আমার অনুরোধ।

গিরিবালা স্বকুমারীর হস্ত ধরিল, স্বকুমারী স্বীকৃতা হইল। গিরিবালা পিত্রালয়ে যাইয়া পিতামাতার চরণধূলি লইয়া আসিল।

স্বকুমারী কলিকাতা যাইতেছে শুনিয়া মুক্তকেশী, স্বশীলা, সরলা ও কৃষ্ণকমল অত্যন্ত দুঃখিত হইল। এ পর্য্যন্ত স্বকুমারীর দ্বারা মুক্তকেশীর বিশেষ সাহায্য হইতেছিল, সে সাহায্য বন্ধ হইলে, মুক্তকেশীর সংসার চলা দায় হইবে। তাই মুক্তকেশী কাঁদিয়া বলিল,

'ছোট-বৌ! তুমি গেলে যে আমাদের দশা কি হইবে, ভগবান বলিতে পারেন।'

স্বকুমারী তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল,

'কোন চিন্তা করো না, মেজ-দিদি! দীনেশদাদা আর গিরিবালা আমার যে উপকার করিতেছে, তাহা ত চক্ষের উপর দেখিতেছ—বাপ মায় এত করে না। এখন তাদের অনুরোধ রক্ষা না করিলে অন্যায় হয়। আমি কলিকাতা যাইযাই তোমায় পত্র লিখিব। যখন যাহা হয়, আমাকে লিখিয়া জানাইও, তবেই সব হবে। তোমার স্বশীলা, সরলা কি আমার নয়!—তাদের জন্য কি আমার চিন্তা থাক্‌বে না? তুমি ব্যস্ত হযো না, দিদি!'

মুক্তকেশী এ কথায় একটু স্থির হইল। সে জানিত, স্বকুমারী কথা অপেক্ষা কার্য্য অধিক ভালবাসে। ভৃত্য ভজহরি বাড়ীতে প্রহরী স্বরূপ রহিল। মঙ্গলা স্বধীরচন্দ্রের শুশ্রূষার জন্য সঙ্গে চলিল। দীনেশচন্দ্র, গিরিবালা, স্বকুমারী, ইন্দুভূষণ ও স্বধীরচন্দ্র, মঙ্গলা ও অন্যান্য দাস-দাসী সমভিব্যাহারে কলিকাতা গেলেন। কাশীকান্ত রায়ের ত্যক্ত সম্পত্তির তহশিলদারী কার্য্যে যাহাকে নিযুক্ত করা হইযাছিল, দীনেশবাবু তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন,

'রীতিমত তহশিল করিবে—মহালে যেন অনেক টাকা বাকি পড়িতে পারে না। আয়ের এক-তৃতীয়াংশ কৃষ্ণকমল বাবুর হস্তে দিবে, এক-তৃতীয়াংশ রামকমল বাবুর স্ত্রীর নিকট তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবে, আর এক-তৃতীয়াংশ হইতে ভৃত্য ভজহরির বেতন তিন টাকা ও খোরাকী বাবদে চারি টাকা মোট সাত টাকা দিয়া যাহা থাকিবে, তাহা নিয়মিতরূপে সুকুমারীর নামে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবে। ইহাতে যেন অন্যথা হয় না।'

তহশিলদার স্বীকৃত হইয়া গেল। অর্থের অস্বচ্ছলতা কাহাকে কহে, সুকুমারী তাহা জানিতে পারিল না। সুকুমারী দুঃখে অধীরা হইয়া সেই পাঁচ হাজার টাকার জীবনবিমার রসিদখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। দীনেশবাবু কলিকাতায় যাইয়া, নিজে বিশেষ চেষ্টা করিয়া, বীমা-কার্য্যালয় হইতে সুকুমারীর ন্যায্য প্রাপ্য ঐ পাঁচ হাজার টাকা আনিয়া সুকুমারীর নিকট দিলেন। সুকুমারী সেই টাকাগুলি দীনেশবাবুর দ্বারা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিল। দীনেশ-বাবুর সুবন্দোবস্তে সুকুমারীর নিকট প্রতি কিস্তে তাহার অংশে অন্ততঃ এক শত টাকা আসিতে লাগিল। সুকুমারী আবশ্যক মত নিজ খরচের জন্য সামান্য কিছু টাকা হাতে রাখিয়া বক্রী টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিতে আরম্ভ করিল। মুক্তকেশীর অবস্থা বড় স্বচ্ছল নহে, পৈতৃক সম্পত্তির আয় দ্বারা তাহার যে খরচ সংকুলন হইবে না ইহা সে জানিত। সুতরাং তাহাদের কোন প্রকার কষ্ট না হয় এ জন্য, সুকুমারী প্রতি মাসে সংসারের নামে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিত। পূজা নিকটবর্ত্তী হইল, সুকুমারী এবার বাড়ী যাইতে পারিল না। পূজাখরচ নির্ব্বাহের জন্য কিছু টাকা পাঠা-ইয়া দিল। কিন্তু কৃষ্ণকমল সে টাকা দ্বারা নিজ দেনা পরিশোধ

করিতে বাধ্য হইল—সুতরাং এবার হইতে পূজা বন্ধ হইল। সুকুমারী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, 'যতদিন না ভালরূপ পূজা করিতে পারি, তত দিন আর গঙ্গাতীরে যাইব না।' ইহার পর, সুকুমারী দীনেশবাবুর সঙ্গে দুই একবার পিত্রালয়ে গিয়া কয়েক দিন কাটাইয়া আসিয়াছে।

দীনেশবাবু সুধীরচন্দ্রকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং ইন্দুভূষণ ও সুধীরচন্দ্রের জন্য একরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। উভয়ের খাওয়া দাওয়া, বসন ভূষণে কোনরূপ পার্থক্য রহিল না। বাহিরের লোকে সুধীরচন্দ্র ও ইন্দুভূষণকে দেখিয়া প্রথমতঃ উভয় বালককে দীনেশবাবুর পুত্র বলিযাই স্থির করিত। বালকদ্বয় বাল্যকাল হইতে একত্র বাসহেতু, পরস্পর পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ও স্নেহশীল হইয়া উঠিতে লাগিল। কলিকাতায় আসিয়াই দীনেশবাবু বালকদ্বয়ের সুশিক্ষার জন্য একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। দীনেশবাবুর সতত চেষ্টা ও গৃহশিক্ষকের সাহায্যক্রমে সুধীর ও ইন্দু বেশ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ইহার কিছুদিন পরে, উভয় বালককে স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দেওয়া হইল। স্বাভাবিক সুবুদ্ধিবলে, বালকদ্বয় বিদ্যানুশীলনে বেশ কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিল। সুধীর স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান বালক, মায়ের মলিন মুখ দেখিয়া পারিবারিক প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া লইতে তাহার অধিক বিলম্ব হইল না। ইন্দুভূষণ ও তাহার অবস্থায় যে অনেক পার্থক্য, তাহা বুঝিয়া বালকও তদনুসারেই চলিতে আরম্ভ করিল। মায়ের কষ্ট দূর করিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইল। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ সহকারে সে লেখা পড়া করিতে লাগিল।

ত্রিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

গৃহ-বহিষ্কৃতা।

রাইমোহন বৎসরান্তে মুক্তিলাভ করিয়া গৃহে ফিরিল। মহামায়া তখন পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিতেছিল। অর্থের অভাবে রাইমোহনের বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল। রাইমোহন দেখিল, তাহার স্ত্রীপুত্রের অতি হীনাবস্থা হইয়াছে—তাহাদের পরিধানে বস্ত্র নাই, গৃহের চালায় খড় নাই, জালায় তণ্ডুল নাই। স্ত্রী, পুত্র, জননীর মুখ শুষ্ক ও কেশ রুক্ষ। সে বুঝিতে পারিল, গত ছয় মাসের মধ্যে তাহাদের মস্তকে এক বিন্দু তৈলও পড়ে নাই। এমতাবস্থায় আবার সসন্তানা ভগিনীকে দেখিয়া রাই-মোহনের চক্ষু টাটাইতে লাগিল। তদুপরি স্ত্রীর নিকট শুনিল, গত রজনীতে তাহাদের পেটে অন্ন পড়ে নাই। উপসংহারে রাইমোহনের স্ত্রী কাঁদিয়া বলিল,

'ভগবান অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সহ্য করিয়াছি, তাহাতে তত দুঃখ হয় নাই, কিন্তু তোমার গুণের ভগিনীর ব্যবহারে বড় জ্বালাতন হচ্ছি। প্রতিদিন হাড় পুড়িয়ে মেরেছে। অনেক দেখিয়াছি, এমনটী দেখি নাই। ঘরে যা কিছু দ্রব্যসামগ্রী ছিল, তা ত বেচে কিনে খেয়েছে, অবশেষে আমার যে দু-এক খানা গহনা ছিল, তাহাও খেয়েছে। তারপর, ধারকর্জ্জে সংসার ডুবিয়েছে। পাঁচ বৎসরেও যে এই দেনা শোধ ক'রে আগেকার মত হতে পারবে, বোধ হয় না। এর উপর আবার রোজ গালা-গালি, রোজ ঝগড়া বিবাদ। কি আর বল্‌ব, তোমার বোনের গোষ্ঠী এসে ধনেপ্রাণে সর্ব্বপ্রকারে মেরেছে। ওরা যদি এমন

করে বসে বসে না খেত, এমন করে সর্ব্বনাশ না কত্ত, তবে আজ বাড়ীর এমন দশা দেখ্‌তে না।'

রাইমোহন সেদিন কোন কথা বলিল না। ধার করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া গৃহের বন্দোবস্ত করিল। পরদিন প্রাতঃকালে, কোন সূত্রে মহামায়ার সহিত কলহ উৎপাদন করিয়া, সে ভগিনীকে পুত্রকন্যাগণ সহ অবিলম্বে তাহার গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে বলিল। মহামায়া মহাদুঃখে কাঁদিতে লাগিল। তাহার সঙ্গে তাহার বৃদ্ধা জননীও অশ্রুত্যাগ করিল। রাই-মোহন জননীকেও গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে হুকুম করিল। অনন্যগতি হইয়া মহামায়া পুনরায় অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গাতীরে, স্বামীগৃহে, গেল। সুকুমারী কলিকাতা রহিয়াছে শুনিয়া মহামায়ার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং কিরূপে উদরান্নের সংস্থান হইবে ভাবিতে ভাবিতে মহামায়া ব্যাকুলা হইল। এদিকে নবলক্ষ্মী বিবাহের উপযুক্তা হইয়াছে—তাহার বিবাহেরই বা কি উপায় হইবে? কয়েক দিন ধারে চলিল। মুদী তৈল, লবণ, চাউল, দাইলের মূল্যের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল—দুর্ব্বাক্য বলিতেও ছাড়িল না। অনন্যোপায় হইয়া মহা-মায়া সুকুমারীর নিকট পত্র লিখিল। সুকুমারী দশটী টাকা পাঠা-ইয়া দিল। এইরূপ কায়ক্লেশে কোনরূপ দিনপাত হইতে লাগিল।

মুক্তকেশীর সঙ্গেও এখন আর মহামায়ার সদ্ভাব রহিল না। মহামায়ার দৃঢ় ধারণা যে কৃষ্ণকমলের দোষেই তাহাদের এইরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। কৃষ্ণকমল যদি জেলায় যাইয়া তাহার স্বামীর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিত, তাহা হইলে তাহার স্বামীর এমন দশা ঘটিত না। তাহাদেরও এরূপ দুরবস্থা হইত না। মহামায়া

প্রকাশ্যরূপে এসব কথা বলিতে লাগিল। সুতরাং মুক্তকেশীর সঙ্গে প্রতিদিনই বাক্য পরিবর্তন হইতে লাগিল। মুক্তকেশী কুশিক্ষাপ্রাপ্ত স্বামীর হস্তে পড়িয়া বিকৃতবুদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ একবারে অপ্রশস্ত ছিল না। কিন্তু ঝগড়া করিতে সে মহামায়ার ন্যায় সুপটু নহে, এজন্য তাহাকেই প্রায় হটিতে হইত। কৃষ্ণকমল এই কলহ ব্যাপারে মধ্যে মধ্যে যোগ দিতে বাধ্য হইত। যেদিন দেখিত মহামায়া তাহার প্রতি অযথা গালি বর্ষণ করিতেছে, সে দিন সে মহামায়াকে মর্ম্মপীড়াদায়ক বাক্য শুনাইয়া দিত, মহামায়া কাঁদিয়া পাড়ার লোক একত্র করিত, কিন্তু স্বভাবদোষ ছাড়িতে পারিত না—আবার পরদিনই ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হইত। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, কিন্তু মহামায়ার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হইল না—আর্থিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতে লাগিল। সুকুমারীর সাহায্য ব্যতীত আয়ের আর কোনরূপ পথ রহিল না।

রামকমল মোকদ্দমা খরচ চালাইবার জন্য হরিদাস বণিক্য নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে বাড়ী ঘর আবদ্ধ রাখিয়া তিন হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। হরিদাস চারি পাঁচ দিন মহামায়ার নিকট সুদের টাকা চাহিল। মহামায়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজের অবস্থা জানাইল, কিন্তু তাহার কাতরোক্তিতে সুদখোড় মহাজনের মন আর্দ্র হইল না। কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া সে প্রাপ্য টাকার নালিশ উপস্থিত করিল। মোকদ্দমা মায খরচ ডিক্রী হইল। সে রামকমলের ইষ্টকালয়, এবং বাড়ী ও পৈতৃক সম্পত্তির তাহার এক-তৃতীয়াংশ ক্রোক করিয়া প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করাইয়া, নিজে তাহা ক্রয় করিয়া লই- ... রিয়া

হরিদাস নিজে তৎসমস্ত দখল করিল। রামকমলের বাড়ী গেল, ঘর গেল, ইষ্টকালয় গেল, যথাসর্ব্বস্ব গেল। মহামায়াকে হরিদাসের লোক আসিয়া ইষ্টকালয় হইতে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। মহামায়া পিতৃগৃহ হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীগৃহে আসিয়াছিল, আজ আবার অনন্যোপায় হইয়া স্বামী-গৃহ হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতৃগৃহে চলিল। আজ মহামায়ার বড় মর্ম্মান্তিক যাতনা বোধ হইতে লাগিল। আজ তাহার অনেক কথা মনে পড়িতে লাগিল—সুকুমারীর কথা, মুক্তকেশীর কথা, শাশুড়ীর কথা, স্বর্ণকমলের কথা, মাখনলালের কথা, জুয়াচুরি-প্রতারণা-প্রবঞ্চনার কথা, দ্বেষহিংসার কথা, গৃহে অগ্নিপ্রদানের কথা। এক একটী কথা মনে পড়িয়া তাহারে যাতনা তিনগুণ বৃদ্ধি হইল। মহামায়া অতি দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতে লাগিল, 'এ সব কি তাহারই ফল? হা পরমেশ্বর, আমার কি উপায় হবে?' সর্ব্বশেষে মহামায়া ভাবিল, 'আমি এখন কোথায়, কাহার কাছে যাই? ভাই ত তাড়াইয়া দিয়াছে, এখন উপায়?' মহামায়া উপায় খুজিয়া পাইল না—পথহারা শিশুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

অনুতপ্ত রামকমল।

নন্দগোপাল পাঁচ বৎসর পর জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শুনিতে পাইল, তাহাদের বাড়ী ঘর নীলাম হইয়া গিয়াছে, তাহার পিতা এখনও কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তাহা

মাতা কোথায়, কি অবস্থায় আছে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। সে আর গৃহে গেল না—ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রামকমল কলিকাতা জেলখানায় প্রেরিত হইয়াছিল। সেখানে সে কয়েদীগণের সরদার হইল। দীনেশবাবুর সঙ্গে জেলরক্ষকের সৌহৃদ্য ছিল। একদিন অপরাহ্নে দীনেশবাবু সুধীরচন্দ্র ও ইন্দুভূষণকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা গড়ের মাঠে বেড়াইতেছিলেন। এমন সময় জেলরক্ষকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। জেলরক্ষক তাঁহাকে জেলখানা দেখিতে অনুরোধ করিলেন। দীনেশবাবু আহ্লাদ সহকারে জেলখানা দেখিতে গেলেন। কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে রামকমল যেখানে কাজ করিতেছিল, সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রামকমল দীনেশবাবুকে চিনিতে পারিয়া মুখ ফিরাইল, কিন্তু রামকমলের চেহারা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ তাহার নূতনবেশে দীনেশবাবু তাহাকে পূর্ব্বে দেখেন নাই। এ জন্য তিনি রামকমলকে চিনিতে পারিলেন না। রামকমলের মলিন মুখ দেখিয়া দীনেশবাবুর হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রামকমলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কি?' রামকমলের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল—মুখ হইতে উত্তর বাহির হইল না। কিন্তু দীনেশবাবুর কথায় উত্তর না দেওয়ায়, জেলরক্ষক 'সপাং' করিয়া তাহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিয়া বলিলেন, 'নাম বলিস্ না কেন রে!' রামকমল বামহস্তে চক্ষু মুছিয়া মুখ ফিরাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'আমার নাম রামকমল রায়'।

দীনেশবাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিনিতে পারিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। আর তিলার্দ্ধ তথায় বিলম্ব না করিয়া

স্থানান্তরে চলিয়া গিয়া রুমাল দ্বারা চক্ষু মুছিলেন। জেল-রক্ষকের কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া দুই চারিটী কথা বলিয়া, ইন্দুভূষণ ও সুধীরকে লইয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। সেই দিন হইতে রামকমলের শারীরিক ক্লেশ কমিয়া গেল। দীনেশবাবু বাসায় আসিয়া গিরিবালা ও সুকুমারীকে সকল কথা বলিলেন। সুকুমারী রামকমলের অবস্থা, বিশেষতঃ বেত্রাঘাতের কথা, শুনিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। ইহার দুই তিন দিন পর, দীনেশবাবু কতগুলি সুখাদ্য দ্রব্য লইয়া পুনরায় বালকদ্বয় সমভিব্যাহারে জেলখানায় গেলেন, জেলরক্ষকের সাহায্যে রামকমলকে একটী শূন্য প্রকোষ্ঠে আনাইলেন এবং তাহার সম্মুখে খাদ্য দ্রব্যগুলি রাখিলেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও, রামকমল তাহা মুখে না দিয়া কাঁদিতে লাগিল। বাড়ীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে রামকমলের সাহস হইল না—হতভাগ্য আকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ বালক দুটী কে?' দীনেশবাবু উহাদের পরিচয় প্রদান করিলে, রামকমল সুধীরচন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং সুধীরকে কোলে লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল। কিন্তু সাত বৎসরের বালক সুধীর কয়েদীর কোলে যাইতে ভয় পাইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। দীনেশবাবু সুধীরকে অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন, 'ভয় কি, সুধীর। যাও ওঁর কাছে।' সুধীরচন্দ্র রামকমলের নিকট গেল। রামকমল তাহাকে আপনার কোলে বসাইল এবং বালকের মুখপানে নির্নিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিল। স্বর্ণকমলের সহিত সুধীরচন্দ্রের মুখের সাদৃশ্য দেখিয়া রামকমল উচ্চৈঃস্বরে 'ভাই স্বর্ণকমল রে।' বলিয়া পাগলের

ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দন শুনিয়া অনেক লোক তথায় দৌড়িয়া আসিল, জেলরক্ষকবাবু তাহাদিগকে গালাগালি দিয়া দূর করিয়া দিলেন। দীনেশবাবু ও জেলরক্ষক-বাবু চক্ষু মুছিলেন। বালক ইন্দু ও সুধীর অবাক হইয়া একবার দীনেশবাবুর প্রতি এবং একবার রামকমলের প্রতি তাকাইতে লাগিল। ক্রমে রামকমল একটু স্থির হইল এবং খাদ্য সামগ্রীগুলি সুধীরচন্দ্র ও ইন্দুভূষণকে খাওয়াইতে লাগিল। ইহাতে আজ তাহার যত সুখ হইল এই জীবনে সে কখনও আর তত সুখ ভোগ করে নাই। দীনেশবাবু ও জেলরক্ষক অনেক পীড়াপীড়ি করাতে রামকমলও দুই একটী সন্দেশ উদরস্থ করিল।

সাত বৎসরের যাতনায় রামকমলের অনেক শিক্ষা হইয়াছে। সাত বৎসর অবিশ্রান্ত স্বীয় জঘন্যতার ফলভোগ করিতে করিতে রামকমলের পাপ অনেক ক্ষয় হইয়াছে, হৃদয় উদার ও প্রশস্ত হইয়াছে, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। আজ সে স্বর্ণকমলের জন্য কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিল, মাখনলাল ও বৃদ্ধা জননীর মৃত্যু স্মরণ করিয়া সে দেয়ালের গায় মস্তকাঘাত করিয়া উন্মাদের ন্যায় শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। আজ সুধীরচন্দ্রকে তাহার কোল হইতে ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না—ঘন ঘন তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিল। রামকমল অতিশয় আগ্রহের সহিত সুকুমারীর মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল, গিরিবালার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল, কৃষ্ণকমল, মুক্তকেশী ভৃত্য ভজহরি, পরিচারিকা মঙ্গলা ও গ্রামের সকলের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু মহামায়া, নবলক্ষ্মী বা নন্দগোপালের সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিল না। দীনেশবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিবার সময় বলিয়া আসিলেন,

'সকলে শারীরিক ভাল আছে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' রামকমল মুখ বিকৃত করিল। ফলতঃ নিজ পরিজনবর্গের প্রতি তাহার কেমন একরূপ বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়া গেল—তাহাদের মুখ দর্শন করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

বিশেষ অনুরোধে বাধ্য হইয়া দীনেশবাবু বালকদ্বয়কে লইয়া এইরূপ মধ্যে মধ্যে জেলখানায় যাইয়া রামকমলের সহিত দেখা করিয়া আসিতেন। ক্রমে ক্রমে রামকমল সকল অবস্থা অবগত হইল। কিন্তু সেই জেলরক্ষকবাবু হঠাৎ স্থানান্তরে বদলী হইয়া যাওয়ায় দীনেশবাবুর সহিত রামকমলের দেখা সাক্ষাৎ একবারে বন্ধ হইয়া গেল।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

মহামায়া, নবলক্ষ্মী ও ননীগোপাল।

মহামায়া, ননীগোপাল ও নবলক্ষ্মীকে লইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে পিতৃগৃহে গেল। কিন্তু রাইমোহন তাহাদিগকে তীব্র গালাগালি দিয়া গৃহবহিষ্কৃতা করিয়া দিল। আহার করিতেও বলিল না! ননীগোপাল ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিতে লাগিল—মহামায়া সংসার শূন্য দেখিতে লাগিল। বুদ্ধিহারা মহামায়া তাহাকে আহারের পরিবর্ত্তে মনোদুঃখে প্রচুর প্রহার প্রদান করিল। তখন বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। পেটের জ্বালায় ও মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া মহামায়া, তাহার জননী, ননীগোপাল ও নবলক্ষ্মী একত্রিত হইয়া বহির্ব্বাটীতে বসিয়া 'বাবা গো' 'মা গো' 'কোথা যাব রে' 'কি হবে রে' ইত্যাদি বলিয়া ভীষণ কান্না জুড়িয়া দিল। পাড়ার বালিকা,

বৃদ্ধা ও যুবতীর দল, রামকমলের কোন অমঙ্গল সংবাদ আসিয়াছে মনে করিয়া, বেশ ঔৎসুক্যের সহিত দ্রুতবেগে দৌড়িয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু যখন তাহারা অবগত হইল যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ আসে নাই, তখন তাহারা অপেক্ষাকৃত হতাশ হইয়া গৃহে ফিরিল। কিন্তু কেহই মহামায়া ও তাহার ক্ষুধার্ত্ত পুত্র কন্যার আহারের কোনরূপ যোগাড় করিল না। পাড়ার একটি চিরকুমারী, কুলীন কামিনীর হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তাহার নাম উত্তমা সুন্দরী, বয়স ত্রিশ বৎসর, রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। উত্তমা সুন্দরী সময়ে সুন্দরী ছিল বটে, কিন্তু কুলের ঘরে বর জুটিল না বলিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে বিবাহ দেন নাই। উত্তমা মাতৃ-হীনা, কিন্তু তাহার আটজন বিমাতা আছে। তাহাদের মধ্যে ছয়জন বয়সে উত্তমার ছোট। উত্তমা শুধু সুন্দরী নহে, সচ্চরিত্রা, গুণবতী ও সহৃদয়াও বটে। নিজে চিরদুঃখিনী বলিয়া, সে পরের দুঃখ বুঝিতে পারে। এই দিবা তৃতীয় প্রহরেও ইহাদের পেটে অন্ন পড়ে নাই দেখিয়া, উত্তমা সুন্দরী দুঃখিতা হইল এবং মহামায়ার মাতার হস্ত ধরিয়া বলিল, 'চল মাসি! আমাদের বাড়ীতে।' বৃদ্ধা কন্যার মুখপানে চাহিল। উত্তমা তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মহামায়ার হস্ত ধরিয়া ব্যগ্রতা সহকারে বলিল, 'চল বোন্! আমাদের বাড়ী যাবে, তাতে লজ্জা কি? আমরা ত পর না।'

মহামায়ার মাতা উত্তমার মাতার সহিত 'সই' পাতাইয়াছিল; সেই সম্পর্কের বলে উত্তমা বলিল, 'আমরা ত পর না।' আজ উত্তমার মাতার কথা মনে পড়িল—সে বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিল। মহামায়া ও তাহার মাতা উত্তমার সঙ্গে যাইবার জন্য ব্যগ্র

হইতেছিল, কিন্তু মুখে তাহারা উভয়েই প্রথমতঃ নানা কথা বলিয়া অসম্মতি জানাইল। তারপর, উত্তমার মৃত' জননীর গুণের কথা ও ভালবাসার কথা বলিয়া অশ্রুজল ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উপসংহার করিল। অবশেষে উত্তমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া মহামায়া তাহার জননী ও সন্তানগণ সহ তাহার বাড়ীতে গেল। রাইমোহন যাইবার সময় একবার খবরও করিল না। উত্তমা স্বহস্তে তাড়াতাড়ি ভাতেভাত রাঁধিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে অতিথি সৎকার করিল। আহারান্তে মহামায়া উত্তমার দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া বলিল,

'আমাদের উপায় কি হবে, দিদি?'

পাড়ায় নবীনচন্দ্র ঘোষাল নামক এক ব্যক্তি রেঙ্গুনে চাকরী করেন। বেতন তাঁহার পঞ্চাশ টাকা—অন্ততঃ দেশে এইরূপই প্রকাশ। তিনি সপরিবারে কার্য্যস্থলে থাকেন। তিনি পাঁচ বৎসর পর এবার দেশে আসিয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র, দুই কন্যা। কন্যা দুটী নাবালিকা, এদিকে পাচক ব্রাহ্মণ রাখিতেও অনেক ব্যয় পড়ে। সুতরাং গিন্নি ঠাকুরাণীকেই প্রতিদিন দুই বেলা রাঁধিতে হইত। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। তাই রন্ধনকার্য্যের জন্য নবীনবাবু একজন অসহায়া ব্রাহ্মণ-রমণী খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার সঙ্গে সুদূর রেঙ্গুন যাইতে স্বীকৃতা হয় নাই। উত্তমা এ সংবাদ অবগত ছিল। উত্তমার মুখে এ বিবরণ শুনিয়া মহামায়া যেন হাতে আকাশ পাইয়া বলিল,

'দিদি! আমায় যদি দয়া করে কেহ নেয়, আমি যেতে প্রস্তুত আছি, স্বামী বেঁচে আছে, না কি হয়েছে, জানি না। মায়ের

পেটের ভাই, সেত দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে। এখন আর দিদি, মানেব ভাবনা ভেবে কি হবে? উপস করে ক'দিন থাকা যায়?—আমার জন্য আমি ভাবি না। ননীগোপাল, নবলক্ষ্মী না খেয়ে মর্‌বে, একি দিদি! সহ্য কত্তে পারা যায়? বাছা নন্দগোপাল আমার কোথায়, কি অবস্থায় আছে, ভগবান জানেন। আজ যদি সে আমার কাছে থাকিত, তবে আমার কি ভাবনা ছিল?' বলিতে বলিতে মহামায়া ফুকরিয়া কাঁদিতে লাগিল। মহামায়ার রেঙ্গুনে যাওয়ার প্রস্তাবে তাহার মাতা বড় সম্মতি প্রদান করিল না। কিন্তু মহামায়া নবীনবাবুর সঙ্গে রেঙ্গুন যাইবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইল। অগত্যা উত্তমা তাহাকে নবীনবাবুর নিকট লইয়া গেল। মহামায়া লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, নবীনবাবুর নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজের দুঃখকাহিনী বিবৃত করিল। নবীনবাবু শিকার জুটিয়াছে দেখিয়া, আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া স্ত্রীর নিকট গমন করিয়া বলিল,

'দেখ—এই স্ত্রীলোকটী রাখিবে কি না—সে যাইতে স্বীকৃত আছে।'

নবীনবাবুর স্ত্রী অবাক্‌ হইয়া বলিল,

'সে কি কথা? এঁদের অবস্থা এরূপ হল কিরূপে? ওঁদের নাকি ঢের টাকা ছিল।—ওঁকে নিলে লোকে নিন্দে কর্‌বে যে?'

'লোকের কথায় আমাদের কি হবে?—আমরা ত আর সাত আট বৎসরের মধ্যে দেশে আসিতেছি না?'

'তা হলে কি হয়, উঁহা'র স্বামী বাড়ী ফিরে এলে তিনি-ই বা কি ভাব্‌বেন?'

স্ত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও নবীনবাবু মহামায়াকে সঙ্গে নেওয়া

উচিত বোধ করিলেন। কিন্তু নবলক্ষ্মী ও ননীগোপাল সঙ্গে যায়—ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। কারণ তাহাতে ব্যয় অধিক পড়িবে। নবীনবাবু মিষ্টবাক্যে মহামায়া ও তাহার জননীকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, নবলক্ষ্মী ও ননীগোপাল জননীর সঙ্গে যায়, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। সুতরাং তাহাদিগকে দেশে রাখিয়া যাইতে হইবে। অনেক কাদাকাটা করিয়া মহামায়া ননী-গোপালকে সঙ্গে লইবার অনুমতি পাইল। নবলক্ষ্মীর ভার তাহার দিদির স্কন্ধে পড়িল। সপুত্রা মহামায়া কাঁদিতে কাঁদিতে রেঙ্গুন চলিয়া গেল। তথায় পৌঁছিয়া প্রতিদিন দুই বেলা, সুস্থ কি রুগ্ন শরীরে, রাঁধিতে ত হইতই, তদুপরি আরও অনেক কাজ করিতে হইত। নবীনবাবু কিন্তু কিছুতেই মহামায়ার প্রতি সন্তুষ্ট হইত না। রেঙ্গুনে আসিয়া অবধি তিনি ভুলিয়াও একদিন মহামায়া বা ননীগোপালকে একটী মিষ্টবাক্য বা এক-খানি নববস্ত্র দান করেন নাই। তাঁহার স্ত্রীপুত্রের পরিত্যক্ত, শতগ্রন্থিযুক্ত জীর্ণ বস্ত্র দ্বারাই মহামায়া ও ননীগোপালের লজ্জা নিবারণ করিতে হইত। মর্ম্মযাতনায়-অধীরা হইয়া মহামায়া কখন একটু অশ্রুজল ফেলিলে অমনি বাবু বাঙ্গস্বরে বলিতেন,

'সখের কান্না কাঁদিতে হয়, দেশে গিয়ে কেঁদ—আমার বাড়ী রোজ রোজ এসব উৎপাত কেন?'

সুদূর রেঙ্গুন হইতে মহামায়ার একাকিনী দেশে যাওয়া অসম্ভব—বিশেষতঃ তাহার হাতে একটী পয়সাও ছিল না। নবীন-বাবু তাহা জানিতেন। মহামায়া আপনার অদৃষ্টকে শত সহস্র ধিক্কার দিয়া মনে মনে ভাবিত, 'কেন আমি এখানে এসেছিলুম? দেশে থেকে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে খাওয়াও আমার ছিল

ভাল।' হতভাগিনীর সকল দিন পেট পুরিয়া ভাত খাওয়াও ঘটিত না। গৃহিণী স্বহস্তে প্রতিদিন চাউল মাপিয়া দিতেন। তাহাদের সকলের খাওয়া দাওয়া হইয়া ভাত থাকিলে, ননীগোপাল ও মহামায়ার আহার হইত, নতুবা উপবাসে থাকিতে হইত। এই রূপ আধ পেট খাইয়া, দু'বেলা রাঁধিতে রাঁধিতে, হতভাগিনী মহামায়া রোগগ্রস্তা হইয়া পড়িল। ননীগোপাল তাহার পরিবর্ত্তে রন্ধনকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। বাবুর স্ত্রী একটি দিনও তাহার সাহায্য করিতে আসিল না। ইহার উপর রান্না একটু খারাপ হইলে, নবীনবাবু ননীকে গালাগালি দিতে লাগিলেন। সুকুমারীর আদরের ননীগোপালের আজ এই অবস্থা! সুকুমারী কিন্তু এ বৃত্তান্ত জানিতেও পারিল না। তাহার মনে বিশ্বাস যে, ননীগোপাল মাতুলালয়ে বাস করিতেছে। এদিকে নবলক্ষ্মীও যুবতী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহার বিবাহ হয় নাই। কে বিবাহ দেয়? বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বিবাহ দিতে হইলে অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন। অবশেষে তাহার দিদি আর উপায়ান্তর না দেখিয়া এবং পেট চালাইতে একবারে অসমর্থ হইয়া—একটী, অশিক্ষিত, অসামাজিক, সুরাপায়ী, ঋণগ্রস্ত, কুকর্ম্মরত ব্যক্তির নিকট হইতে কুলমর্য্যাদা ব্যপদেশে পাঁচশত টাকা গ্রহণ করিয়া, নবলক্ষ্মীকে তাহার করে সমর্পণ করিলেন। এরূপ স্বামীর হস্তে পড়িয়া নবলক্ষ্মী যে কিরূপ সুখে কাল কাটাইতে লাগিল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

সুখের দিন নিকটবর্ত্তী।

সুকুমারীকে এখন আব চিনিতে পাবা যায় না। চন্দনচর্চ্চিতা, গরদবস্ত্র পরিহিতা, মৃগচর্ম্মে উপবিষ্টা সুকুমাবী—স্বামীপদ চিন্তা, স্বামীব স্বর্গকামনা এবং স্বামীব 'শেষ চিহ্ন' সুধীবচন্দ্রেব মঙ্গল প্রার্থনা—জীবনেব ব্রত কবিযাছেন। সুকুমাবী এখনও বৃদ্ধা কিম্বা প্রৌঢ়া হন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সেই ভক্তিপূর্ণ, সুন্দব মুখশ্রী সন্দর্শন করিলে, তাঁহাকে স্বর্গচ্যুতা মূর্ত্তিমতী দেবী বলিয়াই ভ্রম হয়। কলিকাতা আসা অবধি সুকুমারী একবাব মাত্র সুধীরচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীবে গিয়াছিলেন, তাহাও দুই সপ্তাহেব জন্য মাত্র। কিন্তু সুকুমাবী কলিকাতা বসিয়াও কৃষ্ণকমল, মুক্তকেশী ও সুশীলা, সরলাব সংবাদ লইতেন। কৃষ্ণকমল বহু চেষ্টা করিয়া পুনবায় একটী পাঠশালা খুলিয়াছে। সবলা, সুশীলা বিবাহের বয়স অতিক্রম কবিল, কিন্তু কৃষ্ণকমল অর্থাভাবে তাহাদের বিবাহ দিতে পাবিল না। সুকুমারী স্বয়ং চেষ্টা ও অর্থব্যয় কবিয়া তাহাদেব বিবাহ দেওয়াইয়া দিলেন। সেই বিবাহোপলক্ষেই সুকুমারী ও সুধীবচন্দ্র গঙ্গাতীবে গিয়াছিলেন। তখন সুধীবচন্দ্র অজাতশ্মশ্রু বালক। জন্মস্থান ও পৈতৃক ভদ্রাসন দেখিয়া সুধীব প্রীত হইল, কিন্তু বাড়ীব হীনাবস্থা দেখিয়া তাহাব বড দুঃখ বোধ হইল; কালীকান্ত বাযেবও জনক জননীব প্রশংসাবাদ শুনিতে শুনিতে সুধীবচন্দ্র অশ্রু সম্বরণ কবিতে পাবে নাই। সেই বিবাহোপলক্ষে বাযবাড়ী যত স্ত্রী পুরুষ আসিয়াছিলেন, তাহাদেব প্রত্যেকেই সুধীবকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল।

কিন্তু সেই আনন্দ প্রকাশ ও আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকলেই রামকমলের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল।

সুকুমারী ও সুধীরচন্দ্রের অমায়িকতা ও সুব্যবহারে গ্রামের সকলেই তাহাদের প্রতি বড় প্রীত হইল। তাহারা দেশে আসিয়াছে শুনিয়া দলে দলে লোক আসিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া যাইতে লাগিল। গ্রামে রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, সুকুমারীর হাতে অনেক টাকা জমিয়াছে, সকলেই সুকুমারী ও সুধীরচন্দ্রকে পুনরায় গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। সুধীর এই দুই সপ্তাহের মধ্যে গ্রামের সকলের সহিত আলাপ পরিচয় করিল। তাহার স্বদেশভক্তি জন্মিল। ভগবান দিন দিলে, সে পৈতৃক ভদ্রাসনের শ্রী পরিবর্ত্তিত করিবে, মনে মনে স্থির করিল। সুকুমারীও তাহাই ভাবিলেন।

রামকমল যথাসময়ে মুক্তি লাভ করিলে, দীনেশবাবু তাহাকে বহুবাজারের নিজ বাসাবাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। রামকমল সুকুমারীকে দেখিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিল,

'মা গো! আমিই তোমার সকল দুঃখের মূল।—আমায় মন খুলিয়া ক্ষমা করিবে, ত কর, নতুবা আমি আত্মহত্যা করিয়া সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমি আর পাপের যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না।' রামকমলের কঙ্কাল মূর্ত্তি দেখিয়া সুকুমারী মর্ম্মাহত হইলেন। কাঁদিয়া সুধীরচন্দ্রকে বলিলেন,

'তোমার জেঠা মশাইকে দুঃখ ত্যাগ করিতে বল। তাঁহার প্রতি আমার কোনই রাগ নাই।'

রামকমল একটু স্থির হইল এবং দীনেশবাবু, সুধীরচন্দ্র ও তাহার জননীর বিশেষ অনুরোধে সেদিন সেখানেই আহার করিল।

সুকুমারী তাহাকে কাল বিলম্ব না করিয়া গৃহে যাইতে বলিলেন। গৃহেব অবস্থা রামকমল সমস্তই জানিতে পারিয়াছিল। সে অশ্রু ত্যাগ কবিযা ক্ষিপ্তের ন্যায় বলিল,

'আব নহে।'

পবদিন প্রাতঃকালে তাহাকে আর কেহ বাসায় দেখিতে পাইল না—সে কোথায চলিযা গিয়াছে! অনেক অনুসন্ধান কবিযাও তাহাব কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। এদিকে নবলক্ষ্মী ঋণগ্রস্ত, মদ্যপায়ী, দুশ্চবিত্র স্বামীব হস্তে পড়িয়া নানাপ্রকাব কষ্ট পাইতে লাগিল। চরিত্রহীন স্বামীব কুদৃষ্টান্ত দেখিয়া হতভাগিনী নবলক্ষ্মীও চবিত্রহীনা হইয়া পড়িল। কুশিক্ষাপ্রাপ্ত নন্দগোপাল মুক্তি লাভ কবিয়া নানা স্থান ঘুবিয়া বেড়াইযা নানারূপ অসদুপায়ে, অতি কষ্টে, উদব পোষণ করিতে আবম্ভ কবিয়াছে। মদ্য, গাঁজা, গুলি, চণ্ডু ইত্যাদি নবগুণ তাহাতে আশ্রয় লইল। তাহাকে দেখিলে আব ভদ্রবংশোদ্ভব বলিযা বোধ হয না।

এদিকে দীনেশবাবুব যত্ন, চেষ্টা ও অর্থব্যয ফলবতী হইল। সুধীরচন্দ্র ও ইন্দুভূষণ একই বৎসব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। সুকুমাবী সুধীবচন্দ্রেব পাঠের ক্রমোন্নতি দেখিযা প্রীত হইতেছিলেন, আজ তাঁহার আনন্দেব সীমা রহিল না। স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে সুধীবচন্দ্র জননীব মনোগত ভাব বুঝিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। তাহাব পিতা মাতা, কত লাঞ্ছনা সহ্য কবিয়াছেন, তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর মাখনলাল কিরূপে শৈশবে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে, তাহাব স্নেহময়ী ঠাকুর-মা কিরূপে অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ইত্যাদি সকল কথাই সুধীবচন্দ্র অবগত হইয়াছে। মায়ের মুখ

প্রাত প্রফুল্ল দেখিবার জন্য অনেক দিন ধরিয়া সুধীর বড় ব্যস্ত হইতেছিল। পাঠত্যাগ করিয়াই সে চাকরীর অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইল। ইন্দুভূষণ আইন পাঠ করিতে লাগিল।

সপ্তচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

'মানবী না দেবী ?'

সুধীরচন্দ্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সুন্দরী, সচ্চরিত্রা, প্রিয়বাদিনী ও বুদ্ধিমতী ভার্য্যা পাইয়া সুধীরচন্দ্র সুখে কাল কর্ত্তন করিতেছে। তাহার জননী ও গুণবতী, নত-স্বভাবা পুত্রবধূ পাইয়া সুখী হইয়াছেন। সুধীরবাবু সপরিবারে পরম-সুখে জন্মভূমিতে বাস করিতে লাগিল। গঙ্গাতীরের পৈতৃক ভদ্রাসন এখন আর চামচিকা, ইঁদুর ইত্যাদির আবাসস্থল নহে। হরিদাস বণিক্য প্রাপ্য টাকার জন্য রামকমলের ইষ্টকালয় ও ভদ্রাসনের অংশ দখল করিয়া মহামায়া প্রভৃতিকে গৃহবহিষ্কৃতা করিয়া দিয়াছিল, পাঠকগণ তাহা বিস্মৃত হন নাই। সুধীরচন্দ্র পূর্ব্ব-সঞ্চিত অর্থ দ্বারা হরিদাস বণিক্যের নিকট হইতে এই সমস্ত সম্পত্তি সাড়ে তিন হাজার টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া লইল। সেই অবধি রামকমলের সকল সম্পত্তি সুধীরচন্দ্রের হইল। অনতিবিলম্বে কালীকান্ত রায়ের অদ্ধনির্ম্মিত ইষ্টকালয় সম্পূর্ণ হইল। তদুপরি দ্বিতল গৃহ নির্ম্মিত হইল। পুষ্করিণী ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাটে সুশোভিত হইল। বাড়ী ঘর, বাগান প্রান্তর, রাস্তা ঘাট সুপরিষ্কৃত হইল। লক্ষ্মীর আগমনে বাড়ীর সেই লক্ষ্মীছাড়া, মূর্ত্তি দূর হইল। গ্রামবাসিগণ স্বর্ণকমলের 'শেষ চিহ্ন' সুধীরচন্দ্র ও তাহার রূপগুণসম্পন্না সহধর্ম্মিণীকে সন্দর্শন করিয়া প্রীতি

প্রকাশ করিতে লাগিল। বৃদ্ধেরা শ্রীসম্পন্ন নবদম্পতীকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। প্রৌঢ়ারা দলে দলে আসিয়া সুকুমারীকে বেষ্টন করিয়া তাহাকে রত্নগর্ভা বলিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সুকুমারী গরদবস্ত্র পরিয়া, নামাবলী দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, সর্ব্বদা মৃগচর্ম্মে উপবেশন করিয়া একমনে স্বর্গ কামনা ও হরিপদ চিন্তা করিতেন। পূর্ব্বপরিচিতা প্রতিবেশিনী-গণ আসিলে তাহাদের সহিত আলাপ করিতেন এবং তাহাদের প্রত্যেককে সস্ত্রীক সুধীরচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে অনুরোধ করিতেন। সকলেই তাহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া বলিলেন,

'এমন রতন ছেলে—এমন সোণার বৌ—এদের আশীর্ব্বাদ করিব না, ত করিব কাকে ?'

সুকুমারীর দিন ফিরিয়াছে বটে, কিন্তু তিনি পূর্ব্বকথা বিস্মৃতা হন নাই। এ সুখের সময় তাঁহার সেই দুঃখের কথা মনে পড়িত, সেই প্রেমময়, স্নেহশীল স্বামীর সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি মনে পড়িত, আর অমনি তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইত। সকলে তাহাকে সৌভাগ্য-শালিনী, রত্নগর্ভা ইত্যাদি বলিয়া তাহার অদৃষ্টের প্রশংসা করিত, তিনি তখন সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতেন। এইরূপে তাহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

সুকুমারীর দেশে আগমনে কৃষ্ণকমল ও মুক্তকেশীর যথেষ্ট উপকার হইতে লাগিল। সুধীরবাবু তাহাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিত, ইহাতে তাহাদের আনন্দের সীমা থাকিত না। কৃষ্ণকমলের ইষ্টকালয়ের কড়ি ও বরগাগুলি অতি জীর্ণ ও কীটদষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং মেরামত অভাবে প্রকোষ্ঠ গুলির মূর্ত্তি অতি কদর্য্য হইয়াছিল। অর্থাভাবে কৃষ্ণ-

কমল ইহার সেবামত করিতে পারে নাই। সুধীরচন্দ্র বাড়ী আসিয়া নিজ ইষ্টকালয় প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়ের ইষ্টকালয় দুটীর জীর্ণ সংস্কার করিয়া দিল। লোকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। মঙ্গলা ও ভজহরি সুধীরবাবুর প্রশংসা শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

সুধীরবাবু যে উচ্চ বিদ্যালয় হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, সে কালেজের প্রধান অধ্যক্ষ নেল সাহেব তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। সুধীরবাবুর পাঠত্যাগের পরও সাহেব মধ্যে মধ্যে তাহার নিকট পত্র লিখিতেন। সুধীরচন্দ্র গঙ্গাতীরে পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে, এমন সময় এক দিন নেল সাহেবের পত্র আসিল। পত্রে সাহেব তাহাকে অতি শীঘ্র এক দিন কলিকাতা যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সুধীরবাবু কালবিলম্ব না করিয়া কলিকাতা যাইয়া প্রাতে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিল। সাহেব হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিলেন,

'তোমাকে দেখিয়া বড় সুখী হইলাম। ভাল ত ?'

'আজ্ঞে, হাঁ মহাশয়। আপনি যে আমায় দয়া করিয়া পত্র লিখেন, ইহাতে আমার সুখের সীমা থাকে না।'

এইরূপ কিয়ৎকাল আলাপের পর সাহেব বলিলেন

'তুমি কি চাকরী করিতে চাও ?'

'তাহা ব্যতীত আর উপায় কি ?'

'আমি আজ ছোটলাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত আছি। আমার সঙ্গে চল, তোমাকে তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিব।'

সুধীর সাহেবের সঙ্গে চলিল। গাড়ী যথাসময়ে 'আলিপুর রাজ-প্রাসাদের প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সোপানশ্রেণীর তল-দেশে থামিল। সাহেবের সঙ্গে সুধীরচন্দ্রও দ্বিতলোপরি উঠিয়া লাট সাহেবকে অভিবাদন করিয়া বসিল। অন্যান্য দুই চারিটী কথার পর, নেল সাহেব সুধীরচন্দ্রকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,

'ইনি আমার প্রিয় ছাত্র। নাম সুধীরচন্দ্র রায়। গত বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।'

ছোটলাট সস্মিত বদনে সুধীরবাবুর হস্ত ধরিয়া বলিলেন, 'তোমার সহিত পরিচিত হইয়া সুখী হইলাম।' সুধীরবাবু ছোট লাটের মিষ্টবাক্যে তুষ্ট হইল। অতঃপর সাহেবদ্বয় ফিস্ ফিস্ করিয়া দুই চারিটী কথা বলিলেন, সুধীরবাবু তাহা বুঝিতে পারিল না। যথাসময়ে নেল সাহেবের সহিত সে লাটভবন হইতে বহির্গত হইল। নেল সাহেব বাড়ী পৌঁছিয়া সুধীরবাবুকে বলিলেন,

'তুমি বোধ হয় শীঘ্রই বাড়ী যাইতেছ?—তা, সম্প্রতি যাও। আমি তোমার চাকরীর জন্য চেষ্টা করিব।'

সুধীরচন্দ্র সাহেবকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। কলিকাতা হইতে সুধীরবাবুর গঙ্গাতীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার এক পক্ষ অতীত হইতে না হইতেই দেশে রাষ্ট্র হইল যে, সুধীরবাবু হাজার টাকা বেতনে ডেপুটীগিরি পাইয়াছেন। সুধীর-বাবু অবশ্যই কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সেই দিন অপ-রাহ্নে তাহার নিকট একখানি সরকারী লেপাফা আসিল। ব্যস্ততা সহকারে সুধীরবাবু তাহা খুলিয়া পাঠ করিল। সত্য সত্যই সেখানা ছোটলাটের নিয়োগ পত্র! সুধীরবাবু আড়াই শত টাকা বেতনে নলকাটী নামক স্থানে ডেপুটী মাজিষ্টর নিযুক্ত

হইলেন। গঙ্গাতীর গ্রামের রায়-পরিবারে আজ আনন্দস্রোতঃ বহিল। সুকুমারী আজ এই সুখসংবাদ শ্রবণ করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

দোল দুর্গোৎসব ও পৈতৃক ক্রিয়াকলাপ এত দিন বন্ধ ছিল, আবার তাহা আরম্ভ হইল। এই সুখের সময় উচ্চহৃদয়া সুকুমারী ননীগোপাল, নন্দগোপাল, নবলক্ষ্মী ও তাহাদের জনক জননীকে ভুলিতে পারিলেন না। তাঁহার সাধ হইল, একবার সকলে মিলিয়া সুখ শান্তিতে বাস করেন। মাতৃ-বৎসল সুধীরচন্দ্র তাহাদের অনুসন্ধানে লোক নিযুক্ত করিল। অনুসন্ধানে জানা গেল, নবলক্ষ্মী মাতুলালয়ে বাস করিতেছে, বড়-বৌ ও ননীগোপাল রেঙ্গুনে আছে। নন্দগোপাল কিম্বা তাহার পিতার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। নবলক্ষ্মীকে গঙ্গাতীরে আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। হতাদরা নবলক্ষ্মী অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছিল, আজ হাসিতে হাসিতে পিতৃগৃহে আসিল। সুকুমারী ননীগোপালকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহা হ্রাস হয় নাই। জননীর তুষ্টি সম্পাদনার্থ সুধীরচন্দ্র কাল বিলম্ব না করিয়া রেঙ্গুনে লোক পাঠাইল। মঙ্গলা সঙ্গে গেল। গিয়া দেখিল, কন্যা মহামায়া তখনও নবীনবাবুর পাচিকা স্বরূপ কাজ করিতেছে; আর ননীগোপাল সেই রেঙ্গুনেই আর এক বাবুর বাসায় পাচক নিযুক্ত হইয়াছে। নবীনবাবু অতি অনিচ্ছার সহিত মহামায়াকে যাইতে অনুমতি দিলেন। মহামায়া হাতে আকাশ পাইল। ননীগোপাল অর্থাভাবে এতদিন দেশে যাইতে পারে নাই, আজ তাহারও আনন্দের সীমা রহিল না। উভয়ে আজ কারামুক্ত বন্দীর ন্যায় গঙ্গাতীরাভিমুখে

ছুটিল। নবীনবাবুর স্ত্রী রন্ধনকার্য্য প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল, আবার তাহাকে তাহা শিখিতে হইল! বড়-বৌ চোরের মত বাড়ীতে প্রবেশ করিল এবং পুত্র কন্যার সহিত মিলিত হইয়া একটু সুখী হইল। মহামায়া ও ননীগোপালের মূর্ত্তি এত শুষ্ক, ক্ষীণ ও রুগ্ন হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগকে দেখিয়া হঠাৎ চিনিতে পারা যায় না! তাহার আজ স্বামীর কথা ও নন্দগোপালের কথা মনে পড়িল। চক্ষু জলপূর্ণ হইল। সুকুমারীর সুমধুর চরিত্র ভাবিয়া সে আজ মনে মনে বড় লজ্জিতা হইল। সে ভাবিল,

'ইহার প্রতি আমরা কত অসদাচরণ করিয়াছি, কত প্রকারে ইহাকে লাঞ্ছনা দিয়াছি—পতি পুত্রে বঞ্চিতা করিয়াছি, কিন্তু তবুও ছোট-বৌর কত দয়া। ছোট বৌ নিজ টাকায় আমাদের বাড়ী ঘর সমস্ত ক্রয় করিয়া লইয়াছে, আজ আবার তাহা আমাদিগকে দান করিল! এমন ক'জনে করিতে পারে। আমাদিগকে সে ঠিক আপনার মত দেখিতেছে। আহা! ছোট-বৌ কি দেবী না মানুষী? আজ যে ঠাকুর-পো নাই, মাখনলাল নাই, সে ত আমাদেরই জন্য। ভগবান। আমাদের উপায় কি হবে?'

ভাবিতে ভাবিতে মহামায়া কাঁদিতে লাগিল। সুকুমারী তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিলেন,

'বড়-দিদি! তুমি কেঁদ না। আমি প্রাণপণ করিয়া নন্দগোপাল ও তাহার পিতার সন্ধান করিব। তুমি কেঁদ না, দিদি!'

মহামায়া আরও কাঁদিয়া বলিল,

'আমি তাহাদের জন্য কাঁদিতেছি না।'

'তবে কেন কাঁদ দিদি?'

মহামায়া সে কথার উত্তর দিতে পারিল না, কেবল অবিশ্রান্ত

কাঁদিতে লাগিল। সুকুমারী তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,

'কেঁদ না, দিদি! সে তোমার দোষ কি? ভগবান অদৃষ্টে যা লিখিয়াছিলেন, তা হয়েছে। এখন সে জন্য কিসের দুঃখ, দিদি?'

সুকুমারী অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিলেন। বড়-বৌ এখন আর সেই বাঘিনী রহিল না। মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় সে একবারে স্তব্ধ হইয়া দিনপাত করিতে লাগিল। সুকুমারীকে এখন দেখিলে তাহার ভয় হয়, তাঁহার সহিত অধিক কথা বলিতে লজ্জা বোধ হয়। ননীগোপাল রেঙ্গুনে কেবল রন্ধনকার্য্য শিক্ষা করিয়াছিল, কাগজ কলমের সহিত তাহার বড় একটা সম্বন্ধ ছিল না। সুধীরবাবু প্রকারান্তরে জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতার সামান্যরূপ লেখা পড়া শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিল।

অষ্টচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

নলকাটীর ফৌজদারী আদালত আজ লোকে লোকারণ্য। ডেপুটীবাবু একটী অল্প বয়স্কা, সুন্দরী বারবিলাসিনীর জবানবন্দী গ্রহণ করিতেছিলেন, তাই আদালতে লোকের এত ভিঁড়। ডেপুটীবাবুর সম্মুখে, দক্ষিণ পার্শ্বে, বাদিনী বারবিলাসিনী জবানবন্দী দিতেছিল, তাঁহার বাম দিকে আসামীর বাক্সে একটী রুক্ষকেশ, মলিনবদন, রক্তচক্ষু যুবক ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আসামীর বয়স ত্রিশ কিম্বা বত্রিশ বৎসরের অধিক নহে, কিন্তু চেহারা দেখিয়া ইহা অপেক্ষা অধিক অনুমান হইয়া থাকে। মোক্তার বাদিনীকে জিজ্ঞাসা করিল

'তোমার নাম কি ?'

'হরিমতি।'

'বয়স কত ?'

'সতের বছর'

'থাক কোথা ?'

'এই বন্দরে'

'তোমার কি নালিস ?'

হরিমতি আসামীর দিকে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া কহিল, 'ঐ বামন ঠাকুর—উহার নাম রাধারমণ—আমার বাড়ীতে থাকিত। আষাঢ় মাসের সংক্রান্তি দিন সে আমার গহনার বাক্স ও টাকা পয়সা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মাবতার! ঠাকুর দাগী চোর, আর একবার চুরি করিয়া জেল খাটিয়াছে।'

হরিমতির পক্ষ সমর্থন জন্য অনেক মোক্তার নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা অনেকেই তাহার অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করিতে লাগিল। কিন্তু আসামী অর্থহীন, অজ্ঞাত-কুলশীল, কেহই তাহার পক্ষ গ্রহণ করে নাই। কি কারণে বলিতে পারি না, বিধুভূষণ নামক একজন মোক্তার হরিমতির প্রতি একটু বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসামীর পক্ষে হরিমতিকে জেরা করিতে লাগিল।

বিধু। তুমি বলিলে, 'আসামী তোমার বাড়ী থাকিত।'—তোমার বাড়ী থাকিত কেন ?

হরিমতি। উহার বাড়ী ঘর নাই বলিয়া—

বিধু। যাদের বাড়ী ঘর নাই, তারা সকলেই কি তোমার বাড়ীতে থাকে ?

হরিমতি। তা কেন?—তবে—তবে—

বিধু। তবে কি?—বল, কেন?

হরিমতি আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল, এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না। বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন,

'আচ্ছা, ওর বাড়ী ঘর নাই, কিসে জানিলে?'

হরিমতি। ওর মুখেই শুনিয়াছি।

বিধু। ওর সঙ্গে তোমার কত দিনের চেনা?

হরিমতি। সাত আট বছরের—

বিধু। আচ্ছা, তোমার বাড়ী থাকিয়া আসামী কি করিত?

হরি। হাটবাজার করিত—পান তামাক সাজ্‌ত—

বিধু। খেত কোথা?

হরিমতি। আমার বাড়ী।

বিধু। কে খেতে দিত?

হরি। আমি।

বিধু। শুতো কোথা?

হরি। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমার বাড়ীতেই শুতো—তখন ছিল ভাল। এখন ওর বুদ্ধি বিগড়ে গেছে বলিয়া—

বিধু। চুপ কর—এখন শোয় কোথা?

হরিমতি একটু বিরক্তি সহকারে বলিল,

'তা তুমি ত জান—তবে কেন আমায় জ্বালাতন কচ্ছ তুমিই ত সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছ।'

বিধু। চুপ্ কর—যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহা বল। একটীও বেশী কথা বলিও না।—আচ্ছা, আসামীর স্বভাব কেমন?

হরিমতি। গাঁজাখোড়, মদখোড়ের স্বভাব আবার ভাল কবে?

বিধু। ওর গাঁজা মদের পয়সা জোটে কোথা থেকে ?

হরিমতি। দশজনে দিয়ে থাকে, এই ত সে দিন তোমরা ওকে কত মদ মাংশ খাওয়ালে—

বিধুভূষণ অপ্রতিভ হইয়া বলিল,

'চুপ্ কর—ফের বেশী কথা কহিও না—ওর স্বভাব ভাল না হলে, এতদিন তবে তোমার বাড়ীতে থাকিতে দিলে কেন ?'

অনেক পীড়াপীড়ি সত্বেও হরিমতি এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। ইহার পর তাহার পক্ষের দুই জন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইলে, হরিমতির মোক্তারগণ বক্তৃতা করিলেন,

'ধর্ম্মাবতার ! মোকদ্দমা সম্পূর্ণ সত্য। আসামী একজন বদ্ধ মাতাল ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তি। ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া বারবিলাসিনীর ক্রীতদাস হইয়াছে—ইহাতেই ইহার চরিত্র বুঝিয়া লউন। লোকটা অভাবে পড়িয়া এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে'। ধর্ম্মাবতার। দুষ্টের দমন করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করুন।'

অতঃপর মোক্তার বিধুভূষণ আসামীর পক্ষে বলিলেন,

'ধর্ম্মাবতার। এই মোকদ্দমাটী সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা আপনার ন্যায় বিজ্ঞ হাকিমের বুঝিতে কালবিলম্ব হইবার সম্ভাবনা নাই। হরিমতি আসামীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল, কিন্তু আসামী কিছু দিন যাবৎ অন্য কোন বারবিলাসিনীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া হরিমতির গৃহ ত্যাগ করিয়া যাওয়ায়, উহার হিংসার উদ্রেক হইয়াছে এবং অনেক চেষ্টা করিয়াও আসামীকে পুনরায় বাড়ীতে নিতে না পারিয়া, প্রতিশোধ লইবার দুরাশায়, আসামীর বিরুদ্ধে এই ক্লেশদায়ক মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে'।'

বিধুভূষণের বক্তৃতা শুনিয়া হরিমতির ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার উপক্রম হইল। সে হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল,

'হুজুর! ঐ মোক্তার বিধুবাবু আমার শত্রু—তাহার কথায় বিশ্বাস করিবেন না। সে-ই আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। আমার মোকদ্দমা মিথ্যা নহে।' হাকিম হরিমতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

'তোমার সঙ্গে মোক্তারবাবুর কি শত্রুতা?'

হরিমতি। আজ্ঞে, সে কথা এত লোকের মাঝে বলিতে পারি না।

সমস্ত লোক সে কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু বিধুভূষণ তাহাতে অপ্রতিভ না হইয়া বলিল,

'আমরা মোক্তার—আমাদের কেহ শত্রু মিত্র নাই। যে আমাদিগকে নিযুক্ত করে, আমরা তাহার পক্ষই সমর্থন করি।'

হাকিম আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি মোক্তার দিয়েছ?'

আসামী। আজ্ঞে না, আমি পয়সা কোথা পাব?

ডেপুটীবাবু বিধুভূষণকে চুপ করিতে বলিয়া পুনরায় আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি গহনার বাক্স চুরি করিয়াছ?'

আসামী। আজ্ঞে না—হুজুর বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার সময় গাঁজার জন্য একটী পয়সা নিয়ে ছিলুম মাত্র।

ডেপুটীবাবু মোক্তারের বক্তৃতা বন্ধ করিয়া রায় লিখিলেন,—

'রাধারমণ যে গহনার বাক্স চুরি করিয়াছে, তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। সুতরাং সে অভিযোগ হইতে আমি আসামীকে মুক্তি দিলাম। কিন্তু আসামী নিজেই স্বীকার করিয়াছে যে, সে গাঁজা সেবনের জন্য একটী পয়সা চুরি করিয়াছিল। সে জন্য তাহাকে দশ বেত খাইতে হইবে।'

আসামীকে পুলীশ প্রহরীরা ধরিয়া লইয়া গেল। ডেপুটীবাবুর আজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইল। আসামী বেত্রাঘাত যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু কেহ তাহার দুঃখ দেখিল না, কেহ তাহার জন্য কাঁদিল না।

সেই দিনই মহকুমায় একটা কথা উঠিল, 'আসামী ডেপুটীবাবুর আপন ভ্রাতা। বহু দিবস যাবৎ বাড়ী ঘর ত্যাগ করিয়া কুসংসর্গে মিশিয়া ছদ্মবেশে আছে বলিয়া ডেপুটীবাবু তাহাকে চিনিতে পারেন নাই।' কথাটা ক্রমে ডেপুটীবাবুর কর্ণে গেল। তাঁহার মনে বহুকাল বিস্মৃত স্বপ্নের ন্যায় একটা কথা জাগিয়া উঠিল। তাঁহার এক জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা যে বাল্যকালে চুরি করিয়া চরিত্রসংশোধিনী কারাগারে গিয়াছিল এবং এখন যে সে নিরুদ্দেশ আছে, এ কথা সুধীরবাবু জানিতেন। আজ তাঁহার সন্দেহ হইল। তৎক্ষণাৎ আসামীকে খুঁজিয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। আসামীকে দেখিয়া ডেপুটীবাবুর সন্দেহ আরও বাড়িল। তিনি ব্যগ্রতা সহকারে আসামীকে নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

'সত্য করিয়া বল—তোমার নাম কি, তুমি কাহার পুত্র?' সেই মদ্যপায়ী, গঞ্জিকাসেবক আসামী মাতালের ন্যায় বলিল,

'কেন, আবার বেত মারিতে হুকুম দিবে নাকি? একবার সত্য কথা বলিয়া বেত খাইয়াছি! আবার সত্য কথা?'

ডেপুটীবাবু যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,

'না, আর ভয় নাই। সত্য করিয়া বল—তোমার নাম কি?'

'আমার নাম ত জানই—রাধারমণ।'

'সত্য সত্যই কি তোমার নাম রাধারমণ?'

'অত সত্য মিথ্যায় প্রয়োজন কি? 'বেত মারিতে হয় মার'

বলিয়া সে স্বীয় ছিন্নবস্ত্রের এক কোণ হইতে একটু গাঁজা বাহির করিয়া বামহস্তের তলায় রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা তাহা টিপিতে লাগিল। আসামী বেত্রাঘাত ভোগ করিয়া গিয়াই গাঁজায় খুব দম লাগাইয়াছিল, কিছু মদিরা পানও করিয়াছিল। সেই নেশা না ছুটিতেই সে আবার গাঁজা প্রস্তুত করিতে লাগিল। ক্রমে ডেপুটীবাবুর সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। তিনি বলিলেন,

'আমি তোমার নাম, ধাম ও পরিচয় বলিতে পারি।'

রাধারমণ গাঁজা টিপিতে টিপিতে, চিত্রপুত্তলের ন্যায় ডেপুটী-বাবুর মুখের দিকে চাহিল। ডেপুটীবাবু বলিলেন,

'তোমার নাম নন্দগোপাল, পিতার নাম রামকমল রায়—বাড়ী গঙ্গাতীর গ্রামে। সত্য কি না, বল।'

এত পরিচয় শুনিয়া রাধারমণের ভয় হইল, সে তখন সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার জন্য ব্যগ্র হইল, কিন্তু ডেপুটীবাবু তাহাকে যাইতে দিলেন না। রাধারমণের মুখ শুকাইয়া গেল, সে ভাবিল, তাহাকে আবার কারা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। ডেপুটীবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,

'এ আপনার নিজের বাড়ী—আপনার কোন চিন্তা নাই। রামকমল রায় মহাশয় আমার সাক্ষাৎ জেঠা, আপনি আমার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা—আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।'

লজ্জায় উভয়ে কিয়ৎকাল নীরব হইয়া রহিলেন। নন্দগোপালের সে স্থানে থাকিতে কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। নন্দগোপালের পরিচর্য্যার জন্য, আজ লোক নিযুক্ত হইল। সুধীরবাবুর বিশেষ অনুরোধক্রমে, নন্দগোপালকে আজ সেই অপরাহ্ন সময়ে শীতল জলে স্নান করিয়া ধৌতবস্ত্র পরিধান করিতে

হইল—সন্ধ্যার পর, নন্দগোপাল বেশ পরিতৃপ্তরূপে আহার করিল। গৃহ ত্যাগের পর নন্দগোপাল আর এরূপ পরিতৃপ্ত আহার ও শান্তিপূর্ণ নিদ্রালাভ করিতে পারে নাই।

পর দিন প্রত্যূষে ডেপুটীবাবু নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। নন্দগোপাল একটু অন্তরালে যাইয়া গাঁজা টিপিতে লাগিল। এমন সময় একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুক আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। তাহার পরিধানে অতি ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র, স্কন্ধদেশে ব্রাহ্মণের চিহ্ন যজ্ঞোপবীত। ভিক্ষুক কাতরকণ্ঠে বলিল,

'বাবু মহাশয়। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, অতি দুঃখে পড়িয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি, কাল আহার হয় নাই, দয়া করিয়া আমায় খেতে দিন।'

ডেপুটীবাবু তাহাকে দুই গণ্ডার পয়সা প্রদান করিলেন, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিল।

নন্দগোপাল গাঁজা টিপিতেছে দেখিয়া, সে একটু দাঁড়াইল। নন্দগোপাল তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ইঙ্গিত করিল। উভয়ে কয়েকটি দম্ লাগাইল—বাক্যালাপ চলিতে লাগিল। হঠাৎ উভয়ের মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল—উভয়ে নিমেষশূন্য লোচনে পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া রহিল। সন্দেহের পর কৌতূহল, কৌতূহলের পর পরিচয়, পরিচয়ের পর লজ্জা!! নন্দগোপাল পিতার নিকট ডেপুটীবাবুর পরিচয় প্রদান করিলে, বৃদ্ধ রামকমল সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। ডেপুটীবাবু এ সংবাদ অবগত হইয়া তাহার জন্য লোক পাঠাইলেন। প্রেরিত লোক মিষ্ট বাক্যে বৃদ্ধকে পুনরায় লইয়া আসিল। বৃদ্ধ রামকমল লজ্জায় ও দুঃখে কাহারও সহিত কথা বলিতে

পারিল না। আজ তাহার আবার পূর্ব্বকথা মনে পড়িতে লাগিল। অন্যান্য শত কথার মধ্যে আজ তাহার স্বর্ণকমলের ও সুকুমারীর অমায়িক চরিত্র ও নিজ পত্নী মহামায়ার হিংসাপূর্ণ কুটীল বুদ্ধির কথা মনে পড়িল—আর সে চক্ষের উপর দেখিতে পাইল, আপনার পুত্র নন্দগোপাল, আর স্বর্ণকমলের পুত্র সুধীরচন্দ্র। আজি বৃদ্ধ ভালরূপে বুঝিতে পারিল যে, ভগবান আছেন—পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও হিংসুকের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। বৃদ্ধ রামকমল আবার কাঁদিয়া আকুল হইল কিছুতেই তাহার প্রাণ স্থির হইল না। জেলের মধ্যে সুধীরচন্দ্রকে দেখিয়া তাহার তৃপ্তি হয় নাই, আজ নয়ন ভরিয়া সে ভ্রাতষ্পুত্রকে দেখিতে লাগিল। আজ বহুদিন পরে বৃদ্ধ রামকমলের মস্তকে তৈল জল পড়িল। এতদিন ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া তাহার যত কষ্ট ও অনুতাপ না হইয়াছে, আজ বিমল ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া ও উপাদেয় খাদ্য ভোজন করিয়া তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক কষ্ট ও অনুতাপ হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে ডেপুটীবাবু সাত দিবসের ছুটী লইয়াছিলেন। পরদিন তিনি জ্যেষ্ঠতাত ও জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতাকে লইয়া গঙ্গাতীরে চলিলেন। পিতা ও পুত্রের বেশ পরিবর্ত্তিত হইল—বহুদিবস পর আজ সুবিমল ধৌত বস্ত্রে তাহাদের অঙ্গশোভা বর্দ্ধিত হইল। যথাসময়ে সকলে গঙ্গাতীরে পৌঁছিলেন।

ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

রামকমলের পরিণাম।

সুধীরবাবুর স্ত্রী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সহিত এ পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরেই বাস করিতেছেন। মহামায়া ও নবলক্ষ্মী সুকুমারীর শরণাগত

হইয়া তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে। সুকুমারী পূর্ব্বকথা একবারে বিস্মৃত হইয়া বড়-বৌ ও নবলক্ষ্মীর প্রতি যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহার একটি সাধ এই যে, মহামায়াকে স্বামী ও জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়া আর একবার তাহাদিগকে সুখী করিবেন। মাতৃআজ্ঞানুসারে সুধীরবাবু কলিকাতা, কাশী, গয়া প্রভৃতি অনেক স্থানে রামকমল ও নন্দগোপালের অনুসন্ধান করাইয়াছেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কোন স্থানে তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ভগবানের অনুকম্পায় ও সুকুমারীর পুণ্যফলে, আজ তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। সুধীরচন্দ্র, তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন। গ্রামের অধিকাংশ লোকের নিকটই এখন রামকমল ও নন্দগোপাল অপরিচিত! আজ ত্রিশ বৎসরের অধিক সময় যাবৎ তাহারা গ্রাম ছাড়া। ইতিমধ্যে গ্রামে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহাদের নিকট নিজ জন্মস্থান অপরিচিত গ্রাম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! রামকমল ও নন্দগোপালের আজ পরিচিত ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিতেও লজ্জা বোধ হইতে লাগিল, তাহাদের মনে হইতে লাগিল, যেন সকলেই তাহাদের পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে উপহাস করিতে আসিতেছে। রায়বাড়ী আজ লোকের বড় ভিঁড় হইতে লাগিল। গ্রামের স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব তামাসা দেখিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া রায়বাড়ী যাইতে লাগিল।

বহু দিবস পর আজ রামকমলের পরিবারবর্গের সহিত পরস্পরের সম্মিলন হইল—স্বামী স্ত্রী, পুত্র জননী, ভাই ভগিনী প্রভৃতির পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইল বটে, কিন্তু মিলন বড় সুখের

হইল না—এ মিলনে তাহাদের কেহই যেন বড় শান্তি বোধ করিতে পারিল না। নন্দগোপাল মায়েব পদধূলি লইল, তাবপর মায়ের উপদেশানুসারে সুকুমারীর পদধূলি লইল। সুকুমাবী প্রফুল্ল মুখে মহামায়াকে বলিল,

'বড়-দিদি! আজ আমাব সাধ পূর্ণ হইয়াছে। আজ তোমা-দিগকে একত্র দেখিযা আমি বড় সুখী হইয়াছি—ভগবান করুন, তোমরা সুখী হ'ও।'

তারপব ক্রন্দন। বামকমলেব কাবাগাবে গমনেব পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, এ পর্য্যন্ত সে তাহাব কিছুই জানিতে পারে নাই। আজ সে নিজ পবিবাবেব দুঃখেব অবস্থা ও সুকুমারীর সদ্ব্যবহাবেব কথা অবগত হইল। প্রবল বন্যাব জলের ন্যায় পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সবেগে তাহার মনে আসিযা আঘাত কবিতে লাগিল, রামকমল আব স্থির থাকিতে পারিল না। বালকেব ন্যায় উচ্চৈঃ-স্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিল,

'ভাইরে! স্বর্ণকমল!'

একবার নহে, দুবার নহে, বৃদ্ধ রামকমল গভীর আর্ত্তনাদ সহকারে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল,

'প্রাণের ভাই স্বর্ণকমল! আজ তুমি কোথায়, ভাই?—বাবা মাখনলাল! কোথা রইলে বাবা!—মা গো!' আমাদেব ফেলে তোমার সুপুত্র স্বর্ণকমলকে নিয়ে তুমি কোথায় লুকাইয়া রহিয়াছ মা! আমবা কুপুত্র বলে কি আর দেখা দিবে না?'

রামকমল কাহাব বারণ না শুনিয়া, কাহাব প্রবোধ বাক্য না মানিয়া বক্ষে ও শীরে করাঘাত করিয়া ভাই,—ভাই-পো ও জননীর জন্য কাঁদিতে লাগিল। স্বহস্তে যাহাদের প্রতি মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ

করিয়াছিল, সেই স্বর্ণকমল—সেই ভ্রাতষ্পুত্র মাখনলাল ও সেই বৃদ্ধা জননীর জন্য আজ রামকমল কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল। তাহার ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে মহামায়া, নবলক্ষ্মী, নন্দগোপাল কাঁদিতে লাগিল, মুক্তকেশী কাঁদিতে লাগিল, সুকুমারী সান্ত্বনা বাক্য বলিতে আসিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়া বসিয়া পড়িলেন, সুধীরচন্দ্রও অশ্রু-জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। রায়বাড়ীতে এই সম্মিলনের দিনে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। ক্রমে ক্রমে সকলেই শান্ত হইল, কিন্তু রামকমল শান্ত হইল না। তাহার ভ্রাতৃশোক ও মাতৃশোক যেন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, সারা রাত্রি সে 'ভাইরে!' 'মাগো!' 'স্বর্ণকমলরে!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সত্য সত্যই রামকমল পাগল হইল!

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

পাঠক, পাঠিকাগণের ধৈর্য্যচ্যুতি নিবারণের জন্য, এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিয়া, আমরা বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

দ্রুতগতিতে সুধীরবাবুর পদোন্নতি হইতে লাগিল। এখন তিনি মাসে পাঁচ শত টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। রায়-পরিবারের পৈতৃক সম্পত্তির আয় দ্বারা গঙ্গাতীরে পারিবারিক খরচ নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। সুধীরবাবুর স্বোপার্জ্জিত ধন দ্বারা নূতন সম্পত্তি খরিদ এবং সুরম্য ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হইতে লাগিল। গঙ্গা-তীরের রায়বাড়ী দ্বিতল ইষ্টকালয়ে পরিশোভিত হইতে লাগিল। ৺কালীকান্ত রায়ের সেই অর্দ্ধনির্ম্মিত ইষ্টকালয় ইতিপূর্ব্বেই দ্বিতল অট্টালিকায় পরিণত হইয়াছে, তাহা আমরা পাঠকগণকে বলিয়াছি।

রায়বাড়ী এখন আর খড়ের ঘর রহিল না। বহির্ব্বাটীতে সুধীরবাবু 'স্বর্ণকমল বিদ্যালয়' স্থাপন করিলেন। গ্রামের বালকগণ এখানে বিনা বেতনে বঙ্গভাষা ও সামান্যরূপ ইংরেজী শিক্ষা পাইতে লাগিল। আরও স্থাপন করিলেন একটি 'কৃপাময়ী দাতব্য চিকিৎসালয়।' এখানে দীন দুঃখীগণ বিনামূল্যে ঔষধ পাইয়া সুধীরবাবুকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

সুকুমারী কখন সুধীরবাবুর কার্য্যস্থলে, কখন বা গঙ্গাতীরে বাস করিতে লাগিলেন। সুধীরবাবু প্রতিমাসে জননীর নিজ ব্যয় সম্পাদনার্থ তাঁহার হস্তে একশত টাকা দিতেন। সুকুমারী দেবসেবা, ব্রাহ্মণ ভোজন, যাগ যজ্ঞ, ব্রতোপবাসাদি কার্য্যে তাহার অধিকাংশ ব্যয় করিতেন—অবশিষ্টাংশ অনাথ বালক বালিকা, বিধবা স্ত্রীলোক, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও গৃহদগ্ধ ব্যক্তিগণকে দান করিয়া ফেলিতেন—তাহার এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিতেন না। পরদুঃখকাতরা সুকুমারী পরদুঃখ দূর করিবার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিরন্নকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করিয়া চন্দনচর্চ্চিতা দেবী সুকুমারী পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। দেশে তাঁহার নামে ধন্য ধন্য হইতে লাগিল।

রামকমলের উন্মত্ততা সারিল না, বরং ক্রমে আরও বাড়িতে লাগিল। 'কৈ স্বর্ণকমল?' রবে রামকমল গগন পূর্ণ করিতে লাগিল। তারপর সে লগুড়হস্ত হইল। 'আমার ভাইকে এনে দে, নতুবা আমি সব শালাকে খুন করে ফেলব' বলিয়া সে যাহাকে তাহাকে তাড়া করিয়া যাইত। একদিন এইকথা বলিতে বলিতে সে হতভাগিনী মহামায়াকেই আক্রমণ করিল! মহামায়া ভীতা হইয়া পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

'হারামজাদি! নচ্ছারি! এখনো আমার ভাইকে এনে দিলি না?' বলিয়া সে মহামায়ার মস্তকেই লগুড়াঘাত করিল! আহা! সেই আঘাতেই মন্দভাগিনীর মস্তক ফাটিয়া গেল—দর দর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল! ইহার পর আর মহামায়ার জ্ঞান হইল না। দ্বিতীয় রজনীতে মন্দকপালিনী মহামায়া ভবলীলা শেষ করিয়া চলিয়া গেল! অতঃপর রামকমল লৌহ-শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল। তিন বৎসর লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিয়া সেও অনন্তধামে চলিয়া গেল।

দীনেশবাবু স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া ইতিপূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ইন্দুভূষণ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেশ কৃতিত্বের সহিত হাইকোর্টে ওকালতি করিতে লাগিলেন।

সুকুমারী গুণবান পুত্র ও মনোমত পুত্রবধূ পাইয়া পরম সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। রায়-পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিগণও তাঁহাদের সঙ্গে সুখী হইল। নন্দগোপাল গাঁজা, মদ পরিত্যাগ করিয়া বিষয়কর্ম্মে মনোযোগ প্রদান করিল। সুধীরবাবু তাহার বিবাহের জন্য কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইল না। ননীগোপাল একটু লেখা পড়া শিখিয়াছে। সে সুকুমারীর সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত। দাদা বিবাহ করিল না বলিয়া সেও বিবাহ করিল না।

সম্পূর্ণ।